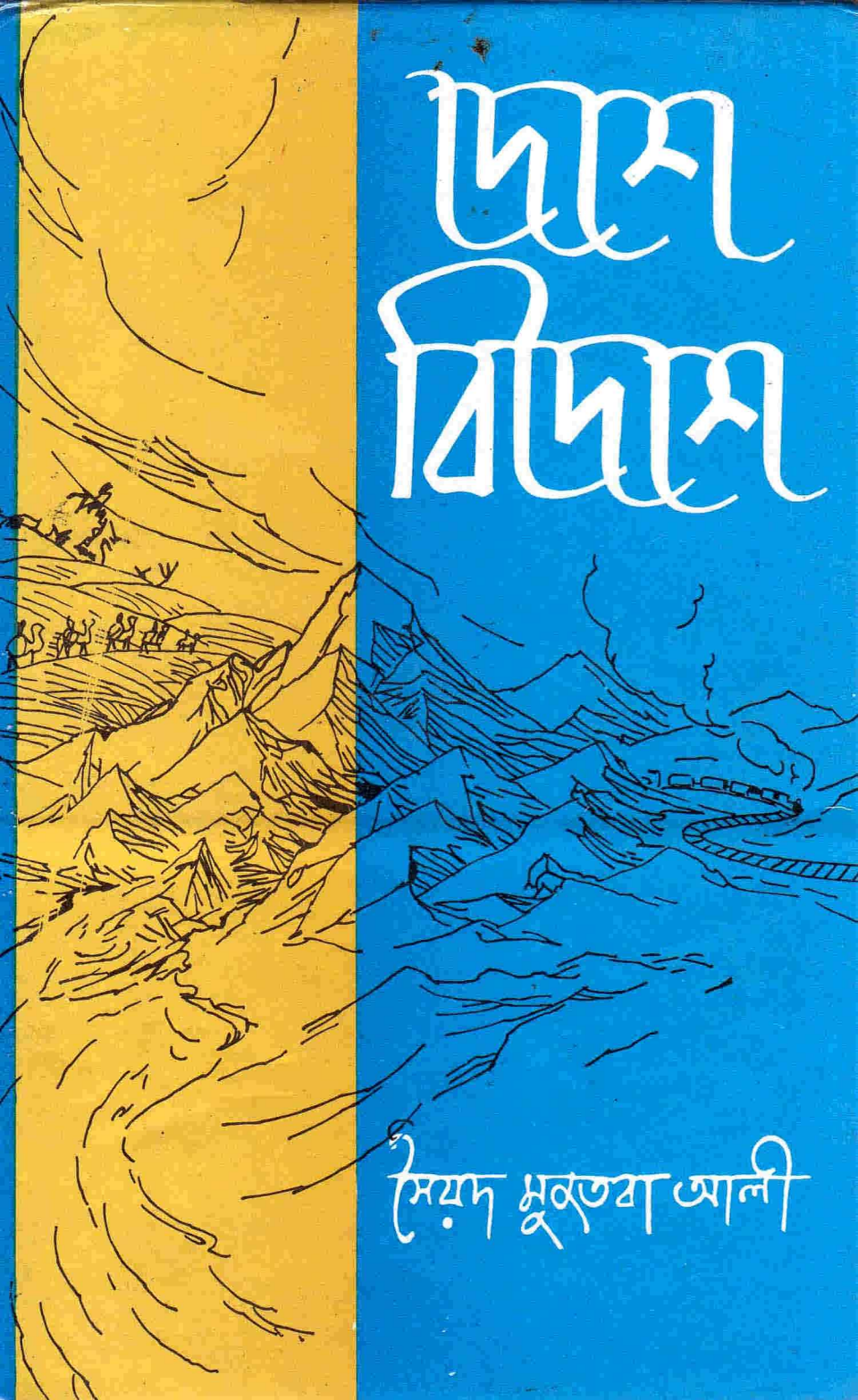


દાસ વિદાસ



સિંધુ મૂલતયા આલી



এক

চাঁদনী থেকে নাসিকে দিয়ে একটা শট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালীর জন্য ইয়োরোপীয়ন থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিক্কাই হেঁকে বললে, 'এটা ইয়োরোপীয়নের জন্য।'

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, 'ইয়োরোপীয়ন তো কেউ নেই, চল তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।'

এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, 'বাঙলা শব্দের অন্তর্দেশে অনুসার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরিজী শব্দের প্রাদেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরিজী হয়।' অর্থাৎ পয়লা সিলেবলে অ্যাকসেন্ট দেওয়া খারাপ রান্নাঘর লব্ধকা তৈসে দেওয়ার মত—সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাঙলায় এরি নাম গাঁক গাঁক করে ইংরিজী বলা। ফিরিক্কাই তালতলার নেটিম, কাজেই আমার ইংরিজী শুনে ভারি খুশী হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল। কুলিকে ধমক দেবার ভার ওরি কাঁখে ছেড়ে দিলুম। ওদের বাপখুড়ো মানীপিসী রেনে কাজ করে—কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুবসে আসছিল। এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলাম, অন্য কিছু ভাববার খরসং পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হল সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনেচিত—মনে হল, আমি একা।

ফিরিক্কাইট লোক ভাল। আমাকে গুম হয়ে গুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'এত মনমরা হলে কেন? গোয়িঙ ফার?'

দেখলুম বিলিতি কায়দা জানে। 'হোয়ার আর উই গোয়িঙ'? বলল না। আমি যেটুকু বিলিতি ভ্রমস্থতা শিখেছি তার চোদ্দ আনা এক পাদরী সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, 'গোয়িঙ ফার?' বললে বাধে না, কারণ উত্তর দেবার ইচ্ছা না থাকলে 'ইয়েস' 'নো' যা খুশী বলতে পার—দুটোর যে কোনো একটাতেই উত্তর দেওয়া হয়ে যায়, আর ইচ্ছে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু 'হোয়ার আর উই গোয়িঙ' যেন ইলিসিয়াম রোর প্রশ্ন—কাঁকি দেবার জো নেই। তাই তাতে বাহিবেল অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারি আরম্ভ হল। তাতে লাভও হল। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার 'কিয়ামে' নাকি উৎকৃষ্ট ভিনার তৈরী করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরোদস্তর পল্টন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে, আমিও কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিম বস্তু, হয়ত বড্ড বেশী ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হল সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আ লা কার্ত ভোজন, যার যা খুশী খাবে।

ঋণ স্বীকার : পুস্তকের শেষের কবিতাটি
উদ্ধৃত করার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতী
কর্তৃপক্ষ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সামের যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল আমার চোখ দুটো সোঁথে সোঁথে জমে যেতে লাগল। সেই শিকবাকর, সেই ঢাকাই পরোটা, মুর্শি-মুসল্লম, আলু-গোস্তা। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে। এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরতে লাগল। এমন কি শিকবাকবের জায়গায় শামীকাবাব নয়, আলু-গোস্তার বদলে কপি-গোস্তা পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, 'ব্রাদার, ফ্রিয়াসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে কেনা।'

একদম হুবহু একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমায়ও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা কবজিলুম তখন যেন এক গাদ্গাদগাদা ফিরিজী ফেমকে হোটেলো পা গাওয়া যায় তাই কিনতে দেখছি। ফিরিজীকে বলতে যাখিলুম তার ফ্রিয়াসের একটা বর্ণনা দিতে কিন্তু খোঁজে গেলুম। কি আর হল বেচারীর সম্ভেদ বাড়িয়ে—তার উপর বেশি বোতল থেকে কড়া গন্ধের কি একটা ঢকঢক করে মাঝে মাঝে গিলছে। বলা তো যায় না, ফিরিজীর বাচ্চা—কখন রঙ বদলায়।

রাত ঘনিয়ে এল। ক্ষিধে ছিল না বলে পেট ভরে খাইনি, তাই ঘুম পাছিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাকজোয়াখন্দা। তবুও পট চোখে পড়ে এ বাঙলা দেশ নয়। সুপারি গাছ নেই, আম জামে বেরা টাউনুনির গ্রাম নেই, আছে শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ি এখানে সেখানে। উঁচু পাড়িওয়ালা ইদারা থেকে তখনো জন তোলা চলছে—পুকুরের সন্ধান নেই। বাঙলা দেশের সোঁদা সোঁদা গছ অনেকক্ষণ হল বন্ধ—দমকা হওয়ায় পেজা ধুলো মাঝে মাঝে বড়াং করে যেন ধাবড়া মেয়ে যায়। এই আধা আলো-অন্ধকারে যদি এদেশে এত করুণ তবে দিনের বেলা এর চেহারা না জানি কি রকম হবে। এই পশ্চিম, এই সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষ? না, তা তো নয়। বম্বিকম যখন সপ্তকোটি কঠোর উল্লেখ করেছেন তখন সুজলা-সুফলা শুধু বাঙলা দেশের জন্যই। ত্রিশ কোটি বলে শুকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামস্করা করা কাষ্ঠরসিকতা। হঠাৎ দেখি পাড়ার হারন ঘোষ দাঁড়িয়ে। এটা? হ্যাঁ! হরেনই তো! কি করে? মানে? আবার গাইছে 'ত্রিশ কোটি, ত্রিশ কোটি, কোটি, কোটি—'

নাঃ, এতো কোর সায়েব। টিকিট চেক করতে এসেছে। 'কোটি কোটি' নয়, 'টিকিট টিকিট' বলে চোঁচালে। খাড়া ক্লাশ—ইয়োরোপীয়ন হলে কি হবে। রাত তেরটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে টিকিট চেক না করলে ও যে নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে। ঝড়মুড় করে জেগে দেখি গাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছে। 'ইয়োরোপীয়ন কম্পটিমেন্ট' গাড়ি বেশ ধারণ করেছে—বায়ু তোরণ প্যাটরা চাঙারি চতুর্দিকে ছড়ানো। ফিরিজী কখন কোথায় নেবে গিয়েছে টের পাইনি। তার খাবারের চাঙারিটা রেখে গিয়েছে—এক টুকরো চিসকট লাগানো, তাতে লেখা 'গুড লাক ফর দি লন্ড জার্নি'।

ফিরিজী হোক, সায়েব হোক, তবু তো কলকাতার লোক—তালতলার লোক। ঐ তালতলাতেই ইরানী হোটেল কতদিন খেয়েছি, হিন্দু বন্ধুদের মেগলাই খানার কায়দাকানুন শিখিয়েছি, স্কোয়ারের পুকুরপাড়ে বসে সাঁতার কাটা দেখেছি, গোরা সেপাই আর ফিরিজীতে মেম সায়েব নিয়ে হাতাহাতিতে হাততালি দিয়েছি।

আর বাড়িয়ে বলব না। ঐই তালতলারই আমার এক দার্শনিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে এমেটন ইন্ডেক্সন নিলে মানুষ নাকি হঠাৎ অত্যন্ত সাংঘর্ষিতে হয়ে যায়, ইরিজীতে যাকে বলে 'মডলিন'—তখন নাকি পাশের বাড়ির বিজল মারা গেলে মানুষ বালিশে মাথা ঝুঁকে ঝুঁপিয়ে ঝুঁপিয়ে রান্দে। বিদেশ যখন আর এমেটন ইন্ডেক্সন নেওয়া প্রায় একই জিনিস। কিন্তু উপস্থিতি সে গবেষণা থাক—ভবিষ্যতে যে তার বিস্তার যোগাযোগ হবে সে বিষয়ে কোনো সম্ভেদ নেই।

ভোর কোথায় হল মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌরচন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরা ছয়ে গাড়িতে গেছে আর বাকী দিল্লী কি রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়। শুনেছি পশ্চিমের গুস্তাদরা নাকি বিলম্বিত একতালে বেশীক্ষণ গান গাওয়া পছন্দ করেন না, দ্রুত তেতালেই তাদের কালোয়াতি দেখানোর শখ। আরো শুনেছি যে আমাদের দেশের রাগরাগিনী নাকি প্রহর আর ঋতুর বাছবিচার করে গাওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মনে আর কোনো সম্ভেদ রইল না যে, পশ্চিমের সকাল বেলাকার রোদ্দুর বিলম্বিত আর বাদবাকী দিন দ্রুত।

গাড়ি যেন কালোয়াৎ। উর্ধ্বাশ্বাসে ছুটেছে, কোনো গড়িকে রোদ্দুরের তবলটাকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠাণ্ডায় জিরোবে। আর রোদ্দুরও চলেছে সঙ্কে সঙ্কে ততধিক উর্ধ্বাশ্বাসে। সে পালায় প্যাসেঞ্জারদের আন খায়। ইন্টিশানে ইন্টিশানে সম। কিন্তু গাড়ি থেকেই দেখতে পাই রোদ্দুর ল্যাটিনের ছাওয়ায় বাইরে আড়নয়নে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে—বাধা তবলটা যে-রকম দুই গায়ের মাঝখানে বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটম-চাটম বোল তোলে আর বাঁকা নয়নে গুস্তাদের পানে তাকায়।

কখন খেয়েছি, কখন ঘুমিয়েছি, কোন কোন ইন্টিশান গেল, কে গেল না, তার হিসেব রাখিনি। সে-গরমে নেশা ছিল, তা না হলে কবিতা লিখব কেন? বিবেচনা করুন—

দেখিলাম পোড়া মাঠ। যতদূর দিগন্তের পানে

দৃষ্টি যায়—দৃষ্ট, মৃধে ব্যাকুলতা। শান্তি নাই প্রাণে

ধরিবীর কোনোখানে। সবিতার ত্রুণ অগ্নিদৃষ্টি

বর্ষিছে নির্মম বেগে। গুমরি উঠিছে সর্বসৃষ্টি

অরণ্য পর্বত জনপদে। যমুনার শুষ্ক বক

এ তীর ও তীর ব্যাপী—শুষ্কিয়েছে কোন জুর যক্ষ

তার শিথিল মাথায়। হাফকার উটে সর্বনাশ

চরাচরে। মনে হয় নাই নাই কোনো আশা

এ মরুরে প্রাণ দিতে সুধা-সিক্ত শ্যামলিম ধারে।

বৃদ্ধের জিহ্বালা অজ্ঞ পূর্ণন্যের সর্বশক্তি কাড়ে

বাসব আসবাবটি। বরষীর শুষ্ক ভ্রমভূতি

প্রেতঘনিম গাড়ি, বৎস হাত-আল ক্লাশ টেনে টেনে।

কী কবিতা! পশ্চিমের মারের চেয়েও নীরস করুণ। গুরুদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ-পদ্য ছাপানো হয়নি। গুরুশ্রী ব্রহ্মশাপ।

দুই

গায়ের পাঠশালায় বুড়ো পণ্ডিতমশাই হাই তুলেই তুড়ি দিয়ে করুণকন্ঠে বলতেন, 'রাখে গো, ব্রজসুন্দরী, পার করো, পার করো।' বড় হয়ে মেলা হিন্দী, উর্দু পড়েছি, নানা দেশের নানা লোকের সন্তো আলাপচারি হয়েছে কিন্তু 'পার করো, পার করো, বলে টাকুরদেবতাকে 'স্বপ্ন' করতে কাউকে শুনিনি।

শতদ্রু, বিপাশা, ইরবতী, চন্দ্রভাগা, বিস্তাভা পার হয়ে এতদিন বাদে তবুটা বুঝতে পারলুম। নামগুলো ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছি, ম্যাপে ভালো করে চিনে নিয়েছি আর কল্পনায়

দেখিছি, তাদের বিরাট তরঙ্গ, খরতর স্রোত। জেবেছি আমাদের গল্পা, পদ্মা, মেঘনা বুড়ীগঙ্গা এনাাদের কাছে ধুলিপরিস্রাণ। গাড়ি থেকে তাকিয়ে দেখে বিশ্বাস হয় না, এরাই ইতিহাস—জুগোলে নামকরা মহাপুরুষের দল। কোথায় তরঙ্গ আর কোথায় তীরের মত স্রোত। এপার-ওপার জুড়ে শুকনো খাঁ-খাঁ বাচুর, জল যে কোথায় তার পাশাই নেই, দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ দুইয়েরই প্রয়োজন। তখন বুঝতে পারলুম, ভবযন্ত্রণা পশ্চিমাদের মনে নদী পার হবার ছবি কেন একে দেয় না। এমন নদীর বেশীর ভাগ পার হবার জন্য ঠাকুরদেবতার ডোর দরকার নেই, মাঝী না হলেও চলে। বর্যাকালে কি অবস্থা হয় জানিনে, কিন্তু ঠাকুরদেবতার ডোর তো কিস্তিরমি করে মৌসুমমারফিক ঢাকা যায় না; তিন দিনের বর্ষা, তার জন্য বায়ো মাস চেঞ্জারিটি করাও খমেরি খাতে বেজায় বাজে বর্ষা।

গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাড়ি লম্বা হয়েছে, টিকি খাটো হয়েছে, নান্দুনুস লালাজীদের মিষ্টি-মিষ্টি, 'আইয়ে বৈঠিয়ে' আর শোনা যায় না। এখন ছফুট লম্বা পাঠানদের 'দাগা, দাগা দিল্লতা, রাওড়া', পাঞ্জাবীদের 'তুসি, অসি', আর শিখ সর্দারজীদের জালবন্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার। পুরুষ যে রকম মেয়েদের বেশ নিয়ে কবিতা লেখে এদেশের মেয়েরা বোধ করি সর্দারজীদের দাড়ি সম্বন্ধে তেমনি গজল গায়; সে দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জরী গানে বার্ষ্যককে বেইজ্ঞব করে। তাতে আশ্চর্য হারাই বা কি? তেয়েফিল গতিয়রের এক উপন্যাসে পড়েছি, ফরাসীদেশে যখন প্রথম দাড়ি কামানো আরম্ভ হয়, তখন এক বিদগ্ধা মহিলা গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'দু'শবের আন্দদ ফরাসী দেশ থেকে লোপ পেল।' শশ্রুযর্থণের ভিতর দিয়ে প্রেমিকের সূরীর পৌরুষের যে আন্দদন আসাদন পেতুম, ফরাসী স্ত্রীজাতি তার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হল। এখন থেকে স্ত্রীবের রাজত্ব। কল্পনা করতোও 'য়েমারা সর্বাঙ্গ রী রী করে ওঠে'!

ভালবুম কোনো সর্দারজীকে এ বিষয়ে রায় জাহির করতে বলি। ফরাসী দাড়ি তার গৌরবের মধ্যাক্ষরপানেও সর্দারজীর দাড়িকে যখন হার মানাতে পারেনি, তখন এদেশের মহিলামহলে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে অনেক প্রশস্তি-তারিফ গাওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারগতিক দেখে সাহস পেজুম না। এদেশের কেন্দ্র-কুণ্ডল যখন যে কার 'সংখ' বৈজ্ঞান্যী হয়ে যায়, আর 'খুনসে' তার 'বদলাই' নিতে হয় তার হদীস তো জানিনে—তুলনাত্মক দাড়িতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে প্রাণটা কুরবানি দেবে নাকি? এরা যখন বেথীর সঙ্গে মাথা দিতে জানে তখন অলংঘ্য দাড়িবিহীন মুণ্ডও দিতে জানে।

সামনের বুড়ো সর্দারজীই প্রথম আরম্ভ করলেন। 'গোয়িড ফার?' নয়, সোজামুজি 'কই জাইয়েগা?' আমি ভবল তসলীম করে সবিনয়ে উত্তর দিলুম—ভঙ্গালো ঠাকুরদার বয়সী আর জ্বরজঙ্গ দাড়ি-গোঁফের ভিতর অতিমিষ্ট মোলায়েম হাসি। চিরকুণ লোকও বটেন, বুঝে নিলেন নীরহ বাঙালী কৃপাণ-বন্দুকের মাঝখানে যুব আশ্রয় বোধ করছে না। জিজ্ঞাসা করলেন পেশাওয়ারে কাউকে চিনি, না, হোটলে উঠব। বললুম, 'বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসেনে, তবে ঠাককে কখনো দেখিনি, তিনি যে আমাকে কি করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ উত্তেজ আছে।'

সর্দারজী হেসে বললেন, 'কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে এক গাড়ি বাঙালী নামে না, আপনি দু'মিনিট সসুর করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।'

আমি সাহস পেয়ে বললুম, 'তা হলে বটেই, তবে কিনা শর্ট পরে এসছি—'

সর্দারজী এবার অটহাস্য করে বললেন, 'শর্টে যে এক ফুট জায়া ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে নাকি?'

১২

mone-prane-bangali.blogspot.com

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'তা নয়, তবে কিনা খুঁটি-পাঞ্জাবী পরলে হয়ত ভালো হত।'

সর্দারজীকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, 'এও তো তাজব্বী বাৎ—'পাঞ্জাবী' পরলে ভালো হত?'

আমি আর এগললুম না। বাঙালী 'পাঞ্জাবী' ও পাঞ্জাবী কৃত্যয় কি তফৎ সে সম্বন্ধে সর্দারজীকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়ত আমাকে আরো বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বললুম, আমি শুনে যাই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'সর্দারজী শিলওয়ার বনাতো ক'ণ্ড কাপড় পরা?'

বললেন, 'দিল্লিতে সাড়ে তিন, জলন্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালমুসায়ে সাড়ে ছয়, রাওলপিণ্ডিতে সাড়ে সাত, তারপর পেশাওয়ারে এক লক্ষ সাড়ে দশ, খাস পঠানমুল্লুর কোছাট খাইবরে পুরো খান।'

'বিশ গজ!'

'হ্যা, তাও আবার খাকী শাটিঙ দিয়ে বানানো।'

আমি বললুম, 'এককম একবস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কি করে? মারপিট, খুনরাজারি ক'ণ্ড বাদ দিন।'

সর্দারজী বললেন, 'আপনি বুদ্ধি কখনো বায়োম্পোপে খান না? আমি এই বুড়ো বয়সেও মাঝে মাঝে যাই। না গেলে ছেল-ছোকরাদের মতিগতি বোকাবার উপায় নেই—আমার আবার একপাল নাতি-নাড়ী। এই সেদিন দেখলুম, দু'শো বছরের পুরোনো গম্পে এক মেম সায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরিয়ে যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন—মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষে চল্লিশ গজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেক্টে থাকতে পারেন, তবে মদা পাঠান বিশ্বগজী শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন?'

আমি খানিকটা ভবে বললুম, 'হক কথা; তবে কিনা বাজে খ্যা।'

সর্দারজী তাতেও খুশী না। বললেন, 'সে হল উনিবিশের কথা। মল্লাজী খুঁটি সাত হাত, জোর আট; অথচ আপনারা দশ হাত পরেন।'

আমি বললুম, 'দশ হাত টেকে বেশী দিন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরা যায়।'

সর্দারজী বললেন, 'শিলওয়ারের বেলাতেও তাই। আপনি বুদ্ধি ভেবেছেন, পাঠান প্রতি ঈদে নুতন শিলওয়ার তৈরী করায়? মোটেই না। হোকরা পাঠান বিয়ের দিন শ্বশুরের গ্রহ থেকে বিশগজী একটা শিলওয়ার পায়। বিস্তর কাপড়ের আয়েনা—এক জায়াখা চাপ পড়ে না বলে বহদিন তাতে জোড়াভালি দিতে হয় না। হিজিতে আরম্ভ করলেই পাঠান সে শিলওয়ার কেনে দেয় না, গোড়ার দিকে দেবে কি করে, পরে তালাজাতে আরম্ভ করে—সে যে-কোনো রঙের কাপড় দিয়েই হোক, পাঠানের তাতে বাছবিচার নেই। বাকী জীবন সে ঐ শিলওয়ার পরেই কাটায়। যম্মার সময় ছেনেকে দিয়ে যায়—ছেলে বিয়ে হলে পর তার শ্বশুরের কাছ থেকে নুতন শিলওয়ার পায়, ততদিন বাপের শিলওয়ার দিয়ে চলায়।'

সর্দারজী আমাকে বোকা পেয়ে মন্তব্য করছেন, না! আপনি বুদ্ধি ভেবেছেন বুঝতে না পেয়ে বললুম, 'আপনি সত্যি সত্যি জানেন, না আপনাকে কেউ বানিয়ে বানিয়ে গম্প বলেছে?'

সর্দারজী বললেন, 'গভীর বনে রাজপুরুষের কবর বাঘের দেখা—বাঘ বললে, 'তোমাকে আমি খাব।' এ হল গম্পা, তাই বলে বাঘ মানুষের যাব সেও কি মিথো কথা?'

অকাট্য মুক্তি। পিছনে রয়েছে আবার সস্তর বৎসরের অভিজ্ঞতা। কাজেই রণে ভক্তগ দিয়ে বললুম, 'আমরা বাঙালী, পাঞ্জাবার মর্ম আমরা জাবাব কি করে? আমাদের হল

নিষ্টিবাদলার দেশ, খালবিল পেরতে হয়। ধুতিলুঙী যে রকম টেনে টেনে তোলা যায়, পাখামাতে তো তা হয়না না।

মনে হয় এতক্ষণে যেন সর্দারজীর মন পেলুম। তিনি বললেন, 'হাঁ, বর্মা মালয়েও তাই। আমি ঐ সব দেশে ত্রিশ বৎসর কাটিয়েছি।'

তারপর তিনি বাড়ি বেঁধে নানা রকম গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য কতটা বানিয়ে বলা সে কথা পরখ করার মত পরখ পাথর আমার কাছে ছিল না, তবে মনে হল ঐ বাছের গল্পের মতই। দুচারজন পাঠন ততক্ষণে সর্দারজীর কাছে এসে তাঁর গল্প শুনতে আরম্ভ করছে—পরে জানলুম, এদের সবাই দুশশ বছর বর্মা মালয়ে কাটিয়ে এসেছে—এদের সামনে সর্দারজী ঠিক তেমনি-ধারা গল্প করে যেতে লাগলেন। তাতেই বুঝলুম, ফাঁকির আশোটা কর্মই হবে।

আজ্ঞা জমে উঠল। দেখলুম, পাঠানের বাইরের দিকটা যতই রসকব্বইনি হোক না কেন, গল্প শোনাতে আর গল্প বলতে তাদের উৎসাহের সীমা নেই। তর্কাতর্কি করে না, গল্প জমাবার জন্য বর্ণনার রঙতুলিও বড় একটা ব্যবহার করে না। সব মেনে উড়কটির ব্যাপার—সাদামাটা কাঠখোটা বটে, কিন্তু ঐ নীরস নিরলংকার বলার ধরনে কেমন যেন একটা গোপন কায়দা রয়েছে যার জোর মানের উপর বেশ জোর দাপ কেটে যায়। বেশীর ভাগই মিলিটারী গল্প, মাঝে মাঝে ঘরোয়া অথবা গোষ্ঠী-সংঘর্ষের ইতিহাস। অনেকগুলো গোষ্ঠীর নামই সেদিন শোনা হয়ে গেল—আফ্রিনী, শিনওয়ানী, বুগিয়ানী আরো কত কি। সর্দারজী দেখলুম এদের হাড়হুদ সবকিছুই জানেন, আমার সুবিধের জন্য মাঝে মাঝে টীকাটিটনী কেটে আমাকে যেন আস্তে আস্তে ওয়াকিফহাল করে তুলেছিলেন। যুবসংমার্কিক আমাকে একবার বললেনও, 'ইংরেজ-ফরাসীর কেছা পড়ে পড়ে তো পরীক্ষা পাশ করেছেন, অন্য কোনো কাজে সেগুলো লাগবে না। তার চেয়ে পাঠানদের নামবুনিদান শিখে নিন, পেশাওয়ার খাইবারপাসে কাজে লাগবে।'

সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।

পাঠানদের গল্প আমার শেষ হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে। ভাঙা ভাঙা পশতু উর্দু পাঞ্জাবী মিশিয়ে গল্প শেষ করে বলবে, 'তখন তো আমার কুছ মালুমই হল না, আমি যেন শরাবীর বেহশীতে মশগুন।' পরে সব যখন সাফসফা, বিলকুল ঠাণ্ডা, তখন দেখি বা হাফের দুটো আঙুল উড়ে গিয়েছে। এই দেখুন।' বলে বাইশগাফী শিলওয়ানের ভাঁজ থেকে বা হাতখানা তুলে ধরল।

আমি দরদ দেখাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাসপাতালে কতদিন ছিলেন?'

সুবে পাঠানিয়ার এক সঙ্গে হেসে উঠল; বাবুজীর অজ্ঞতা দেখে ভারী খুশী।

পাঠান বলল, 'হাসপাতাল আর বিলায়তী ডাগরর কখা বাবুজী? বিবি পটি বেঁধে দিলেন, দাদীমা কতকৃত বলদনী লাগিয়ে দিলেন, মোল্লাজী ফুঁ-ফুঁকার করলেন। অব দেখিয়ে, মালুম হয় যেন আমি তিন আঙুল নিয়েই জন্মেছি।'

পাঠানের ভূমিনীপতিও গাড়িতে ছিল। বলল, 'যে-তিনজননের কথা বললে তাদের ডয়ে অজরঙ্গল (যমদূত) তোমাদের গায়ে ঢেকে না—তোমাকে মারে কে?' সবাই হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর দাদীজ্ঞানের কেছা ওকে বলতে বলুন না। পাখাড়ের উপর থেকে পাথরের পর পাথর গড়িয়ে ফেলে কি রকম করে একটা পুরোদস্তুর গোরা পপ্টনকে তিন ফটা কাবু করে রেখেছিলেন।'

সেদিন গল্পের দ্বাবানে রৌদ্র আর গ্রীষ্ম দুই-ই ভুবে গিয়েছিল। আর কী খানাপিনা। প্রতি

mone-prane-bangali.blogspot.com

স্টেশনে আঙ্কার কেউ না কেউ কিছু না কিছু কিনবেই। চা, শরবৎ, বরফজল, কাফা, ক্রটি, দুকোনা জিনিসই বাদ পড়ল না। কে দাম দেয়, কে খায়, কিছুর বোকবার উপায় নেই। আমি একেবার আমার হিসাব দেবার চেষ্টা করে হার মানলুম। বারোজন তাগড়া পাঠানের তির্যকবাহ ভেদ করে দরজায় পৌঁছাবার বড় পূর্বই কেউ না কেউ পরসা দিয়ে ফেলেছে। আপত্তি জ্ঞানলে শোনে না, বলে, 'বাবুজী এই পরসা দফা পাঠানমুহুরকে যাচ্ছেন, না হয় আমরা একটু মেহমানদারী করলুমই।' আপত্তি পেশাওয়ারে আজ্ঞা গাভুন, আমার সবাই এসে একদিন আঙ্কা করে খানাপিনা করব যাবে।' আমি বললুম, 'আমি পেশাওয়ারে বেশী দিন থাকব না।' কিন্তু কার গোয়াল, কে দেয় ধুয়া। সর্দারজী বললেন, 'কেন বধা চেষ্টা করেন? আমি বুড়ামানুম, আমাকে পর্যন্ত একবার পরসা দিতে দিলে না। যদি পাঠানের আত্মীয়তা-মেহমানদারী বাদ দিয়ে এদেশে ভ্রমণ করতে চান, তবে তার একমাত্র উপায় কোনো পাঠানের সঙ্গে একদম একটী কথাও না বলা। তাতেও সব সময় ফল হয় না।'

পাঠানের দল আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমরা গরীব, পেটের ধান্দায় তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়াই, আমরা মেহমানদারী করব কি দিয়ে?'

সর্দারজী আমার কানে কানে বললেন, 'দেখলেন বুদ্ধির বহর? মেহমানদারী করার ইচ্ছাটা যেন ঢাকা থাকে না—থাকার উপর নির্ভর করে।'

তিন

সর্দারজী যখন চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকতে আরম্ভ করলেন তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পৌঁছতে আর মাত্র ফটাখানেক বাকী। গরমে, ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাকরটিতে আর স্নানভাবে আমার গায়ে তখন আর একরকমি শক্তি নেই যে বিধানা গুটিয়ে ফোলদ বন্ধ করি। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করতে সুখ এই যে আমাদের কাছে যে কাজ কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়। গাড়ির ঝাঁকুনির তাগ সামলে, দাড়িয়ে উত্তরের বাসকের রিছানা বাঁধা আর দেশলাইটি এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে পাঠান কোনো তফাৎ দেখতে পায় না। বাস-তোরঙ্গল নাড়াচাড়া করে যেন আটটি কেস।

ইতিমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেরে গিয়েছি যে পাঠানমুহুরের প্রবাদ, 'দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাতে পাঠানের।' শুনে গর্ব অনুভব করেছি বটে যে বন্দুকখারী পাঠান কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম বোধ করিনি। গাড়ি পেশওয়ার পৌঁছবে রাত নটায়। তখন যে কার রাজত্ব গিয়ে পৌঁছবে তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারই দাঁড়াল। বাইরে ঠা ঠা আলে, নটা বাজল কি করে, আর পেশাওয়ারে পৌঁছলুমই বা কি করে? একটানা মুসাকিরির থাকায় মনে তখন এমন বিকল হয়ে গিয়েছিল যে, শেষের দিকে গাড়ির পানে তাকানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলুম। এখন চেয়ে দেখি সত্যি নটা বেজেছে। তখন অবশ্য এসব ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে হয়রান হবার মূহুরসং ছিল না, পরে বুঝতে পারলুম পেশাওয়ার এলাহাবাদের রক্তিমার্কি চলে বলে কাণ্ডটা খুবই স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক—তখন আবার জুন মাস।

দ্যটিফরমে বেশী ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ্য করলুম যে, ছফুটী পাঠানের ঢেয়েও একমাথা উঁচু এক ভল্লোকে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালীত্ব জাহির করার সঙ্গে সজ্ঞই তিনি এসে

মকমল ডিক্রি, কিস্তি বরাখেলাপের কথাই ওঠে না।

‘তাই বলি, উবুড় হয়ে শুয়ে থাকলেই বা দেখ কি?’ আহমদ আলী বললেন ‘উঁহু, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে না জানলে কখন যে কোন্ আফ্রিদীর নজরে পড়ে যাবেন বলা যায় না। জান বাঁচবার এই হল পয়লা নম্বরের তালিম।’

আমি বললুম, ‘চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে দেখতে পাবেন খুদাতালার আসমান—সে বড় খাবসুখ’। কিন্তু মানুষের বদমায়েশীর উপর নজর রাখবেন কি করে? কি করে জানবেন যে ডেরা ভাঙবার সময় হল, আর সেখানে শুয়ে থাকলে নয়! ফ্যাসাদে বাঁধা পড়ার সম্ভাবনা? মিলিটারী আসবে, তদারক তদন্ত হবে, আপনাকে পাকড়ে নিয়ে যাবে—তার চেয়ে আফ্রিদীর গুলী ভালো!’

আমি বললুম, ‘সে না হয় আমার বেলা হতে পারত। কিন্তু আপনাকে তো রিপোর্ট দিতেই হত।’

আহমদ আলী বললেন, ‘তুওবা, তুওবা। আমি রিপোর্ট করতে যাব কেন? আমার কি দায়? গোয়ার রাইফেল, আফ্রিদীর তার উপর নজর। যে—জিনিস মানুষের জন্য পোতা, তার জন্য মানুষ জান দিতে পারে, নিতেও পারে। আমি সে ফ্যাসাদে কেন ঢুকি? বাঙালী বোমা মারে—কেন মারে খোদায় মালুম, রাইফেলে তো তার শখ নেই—ইংরেজ বোমা খেতে পছন্দ করে না কিন্তু বাঙালীর গোঁ সে খাওয়াবেই। তার জন্য সে জান দিতে কবুল, নিতেও কবুল। আমি কেন ইংরেজকে আপনার হাড়হদের খবর দেব? জান লেনদেনের ব্যাপারে হতীয় পক্ষের দূরে থাকা উচিত।’

আমি বললুম, ‘হুক কথা বলেছেন। রাসেলেরও ঐ মত। ভ্যালুজ নিয়ে নাকি তর্ক হয় না। ইংরেজ পাঠান বিস্তার মিল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাঙালী কেন বোমা মারে সে তো অত্যন্ত সোজা প্রশ্ন। স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতা পেয়ে গেলে সেটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাইফেলের প্রয়োজন হয়। তাই বোধ করি স্বাধীন আফ্রিদীর কাছে রাইফেল এত প্রিয়বস্তু।’

আহমদ আলী অনেকক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন। বললেন, ‘কি জানি, স্বাধীনতা কিসের জেরে টিকে থাকে? রাইফেলের জেরে না বুকুর জেরে। আমি এই পরশু দিনের একটা দাঙ্গার কথা ভাবছিলাম। জানেন বোধ হয়, পেশাওয়ারের প্রায় প্রতি পাড়ায় একজন করে গুণ্ডার সর্দার থাকে। দুই পাড়ার গুণ্ডার দলে সেদিন লাগল লড়াই। গোলাগুলীর ব্যাপার নয়। হাতাহাতি, জোর ছোড়াছুরি। একদল মিনিট দশকে গেরে মার সইতে না পেরে দিল ছুট। কিন্তু তাদের সর্দার রইল দাঁড়িয়ে। সমস্ত দল তখন গিয়ে তাকে ঘাড়ে—মেরে গুঁড়িয়ে ঝেঁলে যখন ভাবল সে মেরে গিয়েছে, তখন তাকে ফেলে সবাই চলে গেল। কাল তাকে হাসপাতালে দেখে এলাম। অন্তত ছ’মাস লাগবে সারতে—মদি ফাড়াটা কাটে। কখনো পাজর ভেঙেছে, আঁতে কটা ফুটো হয়েছে তার হিসেবনিকেশ এখনো শেষ হয়নি।’

‘কিন্তু আশ্চর্য হলুম দেখে যে লোকটা অতি রোগা টিঙটিঙে, সাড়েপাঁচফুট হয় কি না হয়। হোরাও নাকি সে চালাতে জানে না, রাইফেলও সে রাখে না। বাস—এ এক টাঁজ পায়ে, হিম্মৎ। বিস্তার মার খেয়েছে, অনেকবার। মেরেছে অস্প, মারিয়েছে অনেক, আলায়নি ককখনো। আমার হায়ে আদালতে এসেছে বতাবার, কখনো ফরিয়াদী হয়নি। বলে, ‘পাঁচজনের বিপদ আপদের ফৈসালা করে দিই আমি, আর আমি যাব আদালতে আমার বিপদ আপদের কাম্যাকাটি শোনাতে।’

‘আরও আশ্চর্য হলুম দেখে, হাসপাতালে তার ওয়ার্ডে যেন পেশাওয়ারের ফলের বাজার বসে গিয়েছে। কবুলের আফুর, কদাহারের চেবী, মজার—ই-শরীফের আখেরোট—খোবানী সব

মজদ। ছা’জন পালেয়ান দিনরাত তার খাটের চতুর্দিকে মাটিতে বসে—কি জানি তজুরের কখন কি দরকার হয়। তজুর অবিশ্যি উপস্থিত জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সঙ্কটসংকুল খাইবারপাসে।

‘কিন্তু আসল কথা, সে এখনো দলের সর্দার। তার ইজ্জৎ বেড়েছে; তার খুশনামে পেশাওয়ারের গুণ্ডামহল গমগম করছে।’

আমি চুপ করে ভাবছি, এমন সময় দেখি আহমদ আলী মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন, ‘লোকটার হিম্মৎ ছাড়া নাকি আরো একটা গুণ আছে। যাকে বলে হাজির-জবাব। সব কথাই চটপট উত্তর দিতে পারে। শুনলুম চারবার প্রমাণ অভাবে খালস পেয়ে প্যাঁচ বারের বার যখন হাকিম ইজাজ হসেন খানের আদালতে উপস্থিত হল, তখন তিনি নাকি চটে গিয়ে বলেছিলেন, ‘এই নিয়ে তুই পাঁচবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস; তোর লজ্জা—শরম নেই?’

‘সর্দার নাকি মুচকি হেসে বলেছিল, ‘হজুর প্রমোশন না পেলে আমি কি করব?’ সে রাতে শুতে যাবার আগে মটরদাকে চিঠিতে লিখলুম, ‘চিৎ হয়ে শোবে না, উবুড় হয়ে শোবে। পাঠানমুহুরের এই আইন। শিব ঠাকুরের আপন লেগেও এই খবরটি পাঠিয়ে দিয়া।’

চার

যতই বলি, ‘তাই আহমদ আলী খুদা আপনার মণ্ডল করবেন, আখেরে আপনি বেহেশতে যাবেন, আমার যাওয়ার একটা কদবাস্ত করে দিন’, আহমদ আলী ততই বলেন, ‘বরাদরে আজীজের মন’ (হে আমার প্রিয় ভাতা), ফাসীতে প্রবাদ আছে, ‘দের আয়দ দুকস্ত আয়দ’ অর্থাৎ ‘যা কিছু ধীরেধীরে আসে তাহাই মণ্ডলদায়ক’; আরবীতেও আছে, ‘অল অভজুল মিনা শয়তান’ অর্থাৎ কিনা ‘হস্তস্ত হওয়ার মানে শরভানের পন্থায় চলা’; ইংরেজীতেও আছে—

আমি বললুম, ‘সব বুঝছি, কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি এই পাঠানের চালে আমার চলবে না। শুনেছি এখান থেকে লাভিকোটাল যেতে তাদের পরতো দিন লাগে—বত্রিশ মাইল রাস্তা।’ আহমদ আলী গভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে বলেছে?’

আমি বললুম, ‘কেন, কাল রাষ্ট্রের দাওয়াতে, রমজান খান সেই যে বাবরী চুলওয়াল, মিঠি মিঠি মুখ।’

আহমদ আলী বললেন, ‘রমজান খান পাঠানদের কি জানে? তার ঠাকুরমা পাঞ্জাবী, আর সে নিজে লাহরের তিন বাস কাটিয়ে এসেছে। খাস পাঠান কখনো আটক (সিন্দু নদ) পেয়েয় না। তার লাভিকোটাল থেকে পেশাওয়ার পৌছতে অন্তত দু’মাস লাগার কথা। না হলে বুঝতে হবে লোকটা রাস্তার ইয়াব—দোস্তের বাড়ি কাট করে এসেছে। পাঠানমুহুরের রেওয়াজ প্রত্যেক আত্মীয়ের বাড়িতে ভেরান্তির কাটানো, আর, সব পাঠান সব পাঠানের ভাইবোদার। হিসেব করে নিন।’

কাগজ পেশিল ছিল না। বললুম, ‘রফে দিন, আমার যে কট্রিস্ট সই করা হয়ে গিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে।’

আহমদ আলী বললেন, ‘বাস্ না পেলে আমি কি করব?’

‘আপনি চেষ্টা করেছেন?’

আহমদ আলী আমাকে চশমার হতে বলে জানালেন, তিনি পুলিশের ইন্সপেক্টর, নানা

রকমের উকিল-মোক্তার তাঁকে নিতি নিতি জেরা করে, আমি ও-লাইনে কাজ করে সুবিধা করতে পারব না।

তারপর বললেন, 'পেশাওয়ার ভালো করে দেখে নিন। অনেক দেখবার আছে, অনেক শেখবার আছে। যোগ্যতা সমরকন্দ থেকে সদাগরেরা এসেছে পুত্ৰীনি নিয়ে, তাশকদ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে—'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সামোভার কি?'

'রানান গল্প পড়েন নি? সামোভার হচ্ছে ধাতুর পাত্র-টেবিলে রেখে তাতে চায়ের জল গরম করা হয়। আপনারা যে রকম মিষ্ট বংগের ভাস নিয়ে মাতামাতি করেন, পেশাওয়ার কন্দাহার তাশকদ তুল্লা সামোভার নিয়ে সেই রকম লড়ালি করে, কে কত দাম দিতে পারে। সে কথা আরেক দিন হবে। তারপর শুনুন, মজার-ই-শরীফ থেকে কার্পেট এসেছে, বদশশান থেকে 'লাল' রুবি, মেশেদ থেকে তসবী, আজরবাইজান থেকে—'

আমি বললুম, 'ধাক ধাক!'

'আরো কত কি। তারা উঠেছে সব সরাইয়ে। সন্ধ্যাবেলায় গরম ব্যবসা করে, রাত্রিরে জোর খানাপিনা, গানবাজনা। কত হে-তুল্লা, খুনখারাবী, কত রকম-বেরকমের পাপ। শোনেনি বুঝি, পেশাওয়ার হাজার পাপের শহর। মাসখানেক ঘোরাধুরি করুন যে—কোন সরাইয়ে—ডজনখানেক ভায়া বিনা করতে বিনা মেহনেতে শেখা হয়ে যাবে। পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন, টা করে চলে যাবেন ফাসীতে, তারপর জগতাইতুকী, মঙ্গোল, উমানলী, রাশান, কুদী—বাকীগুলো আপনার থেকেই হয়ে যাবে। গান-বাজনার আপনার বৃষ্টি শখ নেই—সে কি কথা? আপনার বাঙালী, টোগার সাহেবের গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার আমি পড়েছি। আছা, কি উমদা বয়েছে, আমি ফাসী তর্জমায় পড়েছি। আপনার তো এসব জিনিসে শখ থাকার কথা। নাই বা থাকল, কিন্তু ইদনজানের গান না শুনে আপনি পেশাওয়ার ছাড়বেন কি করে? পেশাওয়ারী গুলী, ব্যাটাটা ভায়ায় গান গাইতে পারে। তার গাহক দিল্লী থেকে বাগদাদ অবধি। আপনি গেলে লড়কী বহুৎ খুশ হবে—তার রাজত্ব বাগদাদ থেকে বাঙ্গাল অবধি ছড়িয়ে পড়বে।'

আমি আর কি করি। বললুম, 'হবে, হবে। সব হবে। কিন্তু টোগার সাহেবের কোন্ কবিতা আপনার বিশেষ পছন্দ হয়?'

আহমদ আলী একটু ভেবে বললেন, 'আয় মাদর, শাহজাদা ইমরোজ—'

বুবলুম, এ হচ্ছে,

'ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর—'

বললুম, 'সে কি কথা, খান সাহেব? এ কবিতা তো আপনার ভালো লাগার কথা নয়। আপনারা পাঠান, আপনারা প্রেমে জখম হলে তো বাঘের মত রুখে দাঁড়াবেন। মোড়া চড়ে আসবেন বিদ্যুৎগতিতে, প্রিয়াকে একটানে ছুঁলে নিয়ে কোলে বসিয়ে চলে যাবেন দূর-দূরান্তরে। সেখানে পর্বতগুহায় নির্জনে আরম্ভ হবে প্রথম মান-অভিমানের পালা, আপনি মাথা পেতে দেবেন তাঁর পায়ের মখমলের চট্টরি নিচে—'

আমাকেই ধামতে হল, কারণ আহমদ আলী অত্যন্ত শাস্ত প্রকৃতির লোক, কারো কথা মাঝখানে কাটেন না। আমি আটকে গেলে পর বললেন, 'খামলেন কেন, বলুন।'

আমি বললুম, আপনারা কোন দুঃখে হঠাৎ বিনিয়ে কাদাবেন ম্যা ম্যা, মা মা করে।'

আহমদ আলী বললেন, 'ত, এক জরম দার্শনিকও নাকি বলেছেন, স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে সুলো না।'

আমি বললুম, 'তওবা তওবা, অত বাড়ানাড়ির কথা হচ্ছে না।'

আহমদ আলী বললেন, 'না দাদা, প্রেমের ব্যাপারে হয় ইস্পার না হয় উস্পার। প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা, বিস্তার লোকজন। সেখানে 'গোল্ডেন মীন' বা 'সোনালী মাথারি' বলে কোনো উপায় নেই। হয় 'কীপ টু দি রাইট' অর্থাৎ ম্যা ম্যা করে হাদয়বেদন নিবেদন, না হয়, 'লেকট' অর্থাৎ বক্তৃতা দিয়ে—নীটশে যা বলেছেন। কিন্তু ধাকনা এসব কথা।'

বুবলুম প্রেমের ব্যাপারে পাঠান নীরব কর্মী। আমরা বাঙালী, দুপুররাত্রে পাড়ার লোককে না জাগিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমলাপ করতে পারিনে। আমার অবস্থাতা বুঝতে পেরে আমাকে যেন খুলী করার জন্য আহমদ আলী বললেন, 'পেশাওয়ারের বাজারে কিন্তু কোনো গানেওয়ালী নানোওয়ালী ছামাসের বেশী টীকসের পাঠে না। কোনো ছোকরা পান্নিন প্রোমে পড়বেই। তারপর বিয়ে করে আপন গাঁয়ে নিয়ে সন্সার পাতে।'

'সমাজ আপত্তি করে না? মেয়েটা দুর্দিন বাদে শহরের জন্য কাম্বাকাটি করে না?'

'সমাজ আপত্তি করবে কেন? ইসলাম তো কোনো মানা নেই। তবে দুর্দিন বাদে কাম্বাকাটি করে কি না বলা কেন।' পান্নিন গাঁয়ের কাম্বা শহরে এসে পৌছবে এত জের গলা ইদনজানেরও নেই। জানকী বাইয়ের থাকলে আমাকে ঝুঁজে ঝুঁজে হয়রান হতে হত না। হলপ করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার নিজের বিশ্বাস, বেশীর ভাগ মেয়েই বাজারের হট্টপালের চেয়ে গ্রামের শান্তিই পছন্দ করে। তার উপর যদি ভালোবাসা পায়, তাহলে তো আর কথাই নাই।'

আমি বললুম, 'আমাদের এক বিখ্যাত উপন্যাসিকও ঐ ধরনের অভিমত দিয়েছেন, মেয়েদের বাল্যের বহু ঐকজখবর নিয়ে।'

এমন সময় আহমদ আলীর এক বন্ধু মুহম্মদ জান বাইসিকেল ঠেলে ঠেলে এসে হাজির। আহমদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইসিকেল আবার খোঁড়া হল কি করে?'

মুহম্মদ জান পাঞ্জাবী। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কেন যে আপনি এদেশে এসেছেন বুঝতে পারিনে। এই পাঠানরা যে কি রকম পান্নিক নুইসেন তার খবর জানতে পারেননি যদি একদিনও আধ ফঁটার রেং এ শহরে বাইসিকেল চড়তেন। এক মাইল যেতে না যেতে তিনটে পাংকচার। সব ছোট ছোট লোহার।'

ভয়লোক দম নিচ্ছিলেন। আমি দরদ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত লোহা আসে কোথা থেকে?'

মুহম্মদ জান আরো চটে গিয়ে বললেন, 'আমাকে কেন শুধছেন? জিজ্ঞেস করুন আপনার দিলজানের দোস্ত শেখ আহমদ আলী খান পাঠানকে।'

আহমদ আলী বললেন, 'জানেন তো পাঠানরা বহু আছাবাছ। গম্পগুজব না করে সে এক মাইল পথও চলতে পারে না। কাউকে না পেলে সে বসে যাবে রাস্তার পাশে। মুঠীকে বলবে, 'দাও তো হাটা, আমার পয়জারের গোটা কয়েক পেরেক চুকবে।' মুঠী তখন ডিলে লোহাগুলো শিটিয়ে দেয়, গোটা দশেক নুতনও লাগিয়ে দেয়। এই রকম শখ্যাকে লোহা লাগালে জুতার চামড়া আর মাটিতে নাগে না, লোহার উপর দিয়েই রাস্তার পাথরের চোট যায়। হাফসোল লাগানোর খরচাকে পাঠান বহু ভয় করে কিনা। সেই পেরেক আবার হরেক রকম সাইজের হয়। পাঠানের জুতো তাই লোহার মোজারিক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লোহা ঠোকানো না-ঠোকানো অবাস্তর—মুঠীর সঙ্গে আছা দেবার জন্য ঐ তার অভ্যুহা।'

মুহম্মদ জান বললেন, 'আর সেই লোহা ডিলে হয়ে গিয়ে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।'

আমি বললুম, 'এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল আছা মানুষকে অপকর্ম থেকে ঠেকিয়ে

রাখে। এখন দেখতে পাচ্ছি তুল করছি।’

আহমদ আলী কাতরখের বলেনল, ‘আজ্ঞার নিন্দা করবেন না। বাইসিকেল চড়ার নিন্দা করুন। আপনাকে বলিনি, ‘অল অজলু মিনা শয়তান’ অর্থাৎ হস্তদস্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা? তাই তো বাইসিকেলের আরেক নাম শয়তানের গাড়ী।’

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাওয়ার দিনের ১১৪ ডিগ্রী তুলে গিয়ে মোলায়েম বাতাস দিয়ে সর্বাপেক্ষের গ্লানি খেল ঘুরিয়ে দেয়। রাস্তাঘাট বুন ঘুম থেকে জেগে উঠে হাই তুলে ঘোড়ার গাড়ির বাঁকটানি দিয়ে তুড়ি দিতে থাকে। পাঠান বাবুৱা তখন সাজগোজ করে হাওয়া খেতে বেরোন। পায়ে জরীর পয়জার, পরনে পপলিনের শিলওয়ার—তার ভাঁজ ধারালো ছুরির মতো ক্রীজের দুদিক বেয়ে কেতায় কেতায় নেমে এসেছে; মুড়ির ভিতরে লাল সুতোয় গোলাপী আভা। গিয়ে রঙীন সিম্পেকের লম্বা শাট আর মাথায় যে পাগড়ি তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো শিরাতরনের সঙ্গে হয় না। বাঙালীর শিরাতরন দেখে অভ্যাস নেই; টুপি বলুন, হ্যাট বলুন, সবই যেন তার কাছে আবাস্তর ঠেকে, মনে হয় বাইরের থেকে জোর করে চাপানো, কিন্তু মধ্যবিস্ত ও ধনী পাঠানের পাগড়ি দেখে মনে হয় ভগবান মানুষকে মাথাটা দিয়েছেন নিতান্ত এই পাগড়ি জড়বার উপলক্ষ্য হিসাবে।

কামিয়ে-জুমিয়ে গোঁফে আরও মেষে আর সেই ভুবনমোহন পাগড়ি বেঁধে খানসাহেব যখন সীম্বের বোঁকে পেশাওয়ারের সাজা বেরোন, তখন কে বলবে তিনি জাকারিয়া স্ট্রীটের পাঠানের জাতভাই? কোথায় লাগে তাঁর কাছে তখন হলিউডের ঈভনিঙ ড্রেসপারা হী—নমেনদের দল?

ফুরফুরে হাওয়া গাছের মাথায় চিরুনি চালিয়ে, খানসাহেবদের পাগড়ির চূড়া দুলিয়ে, ফুলের দোকানে খোলানো মালাতে কাঁপন লাগিয়ে আর সর্বশেষে আহমদ আলীর দুকান ছোঁয়া গোঁফে হাত দুলিয়ে নামল আমার শ্রান্ত ভালো—তপ্ত গ্রীষ্মের দগ্ধ দিনান্তের সন্ধ্যাকাল। এ যেন বাঙলা দেশের জ্যোত্স্নানের নববর্ণণ—শীতল জলধারার পরিবর্তে এ যেন মাতৃহস্তের স্নিগ্ধমন্দ মলয়বাণল। কখন এক নুশক ফারাওয়ার অত্যাচারের রিবাভাগে দেশের জনমানব প্রাণীপতঙ্গ দলে দলে ভগ্নর্থে আশ্রয় নিয়ে প্রব্রহণ গুণছিল, পশ্চিম-পিরামিডে তার অকসানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বাতাস যেন মোজারের অভয়বাণী দিয়ে গেল—দিকে দিকে নতুন প্রাণের সাজা—ছিন্ন হয়েছে ক্ষণ কবীর।

কিন্তু জেগে উঠেই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন কি আহারের? রুটি আর কাবাবওয়ালার দোকানের সামনে কী অসম্ভব ভিড়। বোরকাপার মেয়ে, সবাই হাতে শিখাচ্ছে ছেলে। হাঁ বাত মরারের দিকে ডান হাত রুটিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে বুড়ে, সবাই ঈপিয়ে পড়ছে আহ্বানের সঙ্গনে। রুটিওয়ালা সেই দ্বুধাতদের দশা করার জন্য কাপড়ের কাটকটে ডাকে ‘ভাই, কাউকে ‘বেরাদর’, কাউকে ‘জানো মন’ (আমার জান), কাউকে ‘আগা জান’—পশতু, পাঞ্জাবী, ফারসী, উর্দু চারটে ভাষায় সে একসঙ্গে অনর্গল কথা বলে যায়। ওদিকে তবুদের গনগনে আগুনের টকটকে লাল আঁ পড়ছে তাদের কাপালে গালে। বড় বড় বাব্বীচুলের জুলফি থেকে থেকে ঢোখমুখ ঢেকে ফেলাছে—দুহাত দিয়ে রুটি তুলছে, সরাবার ফুরসুৎ নেই। বুড়ে রুটিওয়ালার দাড়ি হাওয়ার লুলুছে, কাজের হিড়িক তার বজ্রবিদ্যন পাগড়ি পর্যন্ত টের চা হয়ে একদিকে নেমে এসেছে—ছোকরাদের কখনও শুকী করে ‘জং কুং, জুদ কুং’, ‘জলদি করো! জলদি করো! খন্দেরদের কখনও কাকুতি-মিনতি ‘হে মাস্তুং, হে বদুং, হে আমার প্রাণ, হে আমার দিলজান, সবুর করো, সবুর করো, তাজা গরম রুটি দি বলেই তো এত

হাঙ্গাম-তরুজ? বাসী দিলে কি এতফণ তোমাদের দাঁড় করিয়ে রাখতুম?’

বোরকার আড়াল থেকে কে যেন বলল—বয়স বোঝার জো নেই—‘তোরা তাজা রুটি খায়ে খেয়েই তো পাড়ার তিনপুরুষ মরল। তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে বাসী খাস। তাই নে না।’

বোরকা পরে, ঐ যা। তা না হলে পাঠান মেয়েও স্বাধীন।

রুটির পর ফুল কিংবা আতর। যেন পড়ল মহাপুরুষ মুহম্মদের একটি বচন—সত্যেন দত্তের তর্জমা—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা

খান্দা কিনিয়ে ফুলার লাগি।

জুটে যায় যদি দুইটি পয়সা

ফুল কিনে নিয়ে, হে অনুরাগী।

পাঁচ

পাঠান অত্যন্ত অলস এবং আত্মবাজ, কিন্তু আরামপ্রয়সী নয় এবং যেটুকু সামান্য তার বিলাস, তার খরচাও ভয়ঙ্কর বেশী কিছু নয়। দেশমতশকারী গুণীদের মুখে শোনা যে, যাদের গায়ের জোর যেমন বেশী, তাদের স্বভাবও হয় তেমনি শাস্ত। পাঠানদের বেলায়ও দেখলুম কথাটি খাটি। কাগজে আমরা হামেশাই পাঠানদের লুটতরাজার কথা পড়ি—তার কারণও আছে। অনূর্বর দেশ, ব্যবসাবারিভ্য করতে জানে না, পটনে তো আর তামাম দেশটা ঢুকতে পারে না, কাজেই লুটতরাজ ছাড়া অন্য উপায় কোথায়? কিন্তু পেটের দায়ে যে-অপকর্ষ সে করে, মেজাজ দেখাবার জন্য তা করে না। তার আসল কারণ অবশ্য পাঠানের মেজাজ সহজ গরম হয় না—পাঞ্জাবীদের কথা বস্তু। এবং হলেব সে চট করে কদুকের সন্ধান করে না। তবে সব জিনিসদের দুলো বাতায় আছে—পাঠান তো আর খুদ খুদ খুদালাগে আপন হাতে বালানো ফিরিতা নয়। বেইমান বললে পাঠানের রক্ত খাইবারপাসের টপ্পারেরচার ছাড়িয়ে যায়, আর তাইকে বাঁচাবার জন্য সে অত্যন্ত শাস্ত্রমানে যোগসনে বসে আঙুল গোঁথে, নিন্দেনপক্ষে তাকে কটা খুন করবেও হবে। কিন্তু হিসেবনিকসে সাক্ষ্য বিদ্যোসাগর বলে প্রায়ই তুল হয় আর দুটো-চারটে লোক বেঝোরে প্রাণ দেয়। তাই নিয়ে তব্বীতশ্বা করলে পাঠান সকাতির নিবেদন করে, ‘কিন্তু আমার যে চার-চারটে বুলেটের বাজে খরচা হল তার কি? তাদের গুপ্তি-কুটুম কামাকাটি করছে, কিন্তু একজনও একবারের তরে আমার বাজে খরচার খোসারতির কথা ভাবছে না। ইনসান বড়ই খুদপরস্ত—সংসার বড়ই বার্থপর।’

পরও রাতে দাগায়েত এ রকম নানা গল্প শুনলুম। এসব গল্প বলার অধিকার নিমিত্ত ও ররাহুতদের ছিল। একটা জিনিস বুঝতে পারলুম যে, এদের সকলেই খাটি পাঠান।

সে হল তাদের খাবার কায়দা। কাপেটের উপর চওড়ায় দুহাত, লম্বায় বিশ-ত্রিশহাত —প্রয়োজন মত—একখানা রুটি বসিয়ে দেয়। সেই দস্তরখানের দুদিকে সারি বেঁধে এক সারি অন্য সারির মুখোমুখি হয়ে বসে। তারপর সব খাবার মাঝারি সাইজের প্লেটে করে সেই দস্তরখানে সাজিয়ে দেয়; তিন খালা আনু-গোস্ত, তিন খালা শিক-কাবাব, তিন খালা মুরি-রোষ্ট, তিন খালা সিনা-কলিজা, তিন খালা পোলাও, এই রকম ধারা সব জিনিস একখানা দস্তরখানের মাঝখানে, দুখানা দুই প্রান্তে। বাঙালী আপন আপন খালা নিয়ে বসে; রাস্তাঘারের

সব জিনিসই কিছু না কিছু পায়। পাঠানদের বেলা তা নয়। যার সামনে যা পড়ল, তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট। প্রাণ গেলেও কেউ কখনো বলেন না, আমাদের একটি মূলি এগিয়ে দাও, কিম্বা আমার শিক-কাবাষ খাবার বাসনা হয়েছে। মাঝে মাঝে অবিশ্যি হঠাৎ কেউ দরদ দেখিয়ে চোঁচিয়ে বলে, 'আরে হোথায় দেখো গোলাম মুহাম্মদ চ্যাঙ্গল চিবাচ্ছে, ওকে একটি পোলাও এগিয়ে দাও না'—সবাই তখন হাঁ-হাঁ করে সব কটা পোলাওয়ের খানা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর মজলিস গালগল্পে ফের মশগুল। ওদিকে গোলাম মুহাম্মদ শুকনো পোলাওয়ের মরুভূমিতে তুষার মারা গেল, না মাংসের থেঁ-থৈ খোলে ডুবে গিয়ে প্রাণ দিল, তার খবর ঘটখানেক ধরে আর কেউ রাখে না। এবং লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, পাঠান আজ্ঞা জমাবার ব্যতীতে অনেক রকম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। গম্পো নোবে-থোয়ালে অন্তত আধ ডজন অতিথি সুদু শুকনো রুটি চিবিয়েই যাচ্ছে, চিবিয়েই যাচ্ছে। অবচেতন ভাবটা এই, পোলাও-মাংস বাছতে হয়, দেখতে হয়, বন্ধ বয়নাঝা, তাহলে লোকসকল মুখের দিকে তাকাব কি করে, আর না তাকালে গম্প জমাবের বা কি করে।

অন্য ঠায়া সবাই ভদ্রসন্তান, দু' পয়সা কায়াও বটে। বাড়িতে নিশ্চয়ই পছন্দ-মাফিক পোলাও-কালিয়া খায়। কিন্তু পাঠান জীবনের প্রধান আইন, একলা বসে নবাবী খানা খাওয়ার চেয়ে ইয়ারবন্দীর সঙ্গে শুকনো রুটি চিবানো ভালো। ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

তব সাখী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ তুলে তবু মরি মসজিদে গিয়ে
তোমারে ছাড়িয়ে মসজিদে গিয়ে
কী হবে মস্ত শ্মরী?

কিন্তু ওমর বুর্জুয়া কবির বিদগ্ধ পদ্ধতিতে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পাঠান আঙা ভাঙা উর্দুতে ঐ একই আশুবাফ প্রলেটারিয়ায় কায়দায় জানায়—

'দোস্ত!
তুমাখারি রোটি, হমারা গোস্ত!'

অর্থৎ 'নেমস্তন করছে সেই আমার পরম সৌভাগ্য। শুধু শুকনো রুটি? কুছ পরোয়া নাই। আমি আমার মাংস কেটে দেব।'

কাব্যজগতে যে হাওয়া বইছে, তাতে মনে হয়, ওমরের শরাবের চেয়ে মজুরের ধোনার কদর বেশী।

তবে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো। পাঠানের ভিতরে বুর্জুয়া-প্রলেটারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। অনুভূতির জগতে তারা একই মাটির আসনে বসে, আর চিন্তাধারায় যে পার্থক্য সে শুধু কেউ খবর রাখে বেশী, কেউ কম। কেউ সেলসপীর পড়েছে, কেউ পড়েনি। ভালোমন্দ বিচার করার সময় দুই দলে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, মনে হয়নি। আচার-ব্যবহারে এখনো তারা গুপ্তির ঐতিহ্যগত সনাতন জান-দেওয়া-নেওয়ার পন্থা অনুসরণ করে।

এসব তত্ত্ব আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ইসলামিয়া কলেজের এক অধ্যাপক। অনেকক্ষণ ধরে নারা রঙ, নানা দাগ কেটে সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করে বললেন—

'এই ধরুন আমার সহকর্মী অধ্যাপক খুদাবখশের কথা। ইতিহাসে অগাধ পণ্ডিত। ইহমসোরে সব কিছু তিনি অর্থনীতি দিয়ে জলের মত তরল করে এই তুষার দেশে অহরহ

ছেলেদের গলায় চালছেন। ধর্ম পর্যন্ত বাদ দেন না। বীণ স্ট্রীট তাঁর ধর্ম আরম্ভ করেছিলেন ধনের নবীন ভাগ্যচলনপদ্ধতি নির্মাণ করে; তাতে লাভ হওয়ার কথা গরীবেরই বেশী। তাই সবচেয়ে দুখী জেলেরা এসে জুটেছিল তাঁর চতুর্দিকে। মহাপুরুষ মুহাম্মদও নাকি সুদ তুলে দিয়ে অর্থবটনের জমিকে আরবের মরুভূমির মত সমতল করে দিয়েছিলেন। এসব তো ইহনোকেবর কথা—পরলোক পর্যন্ত খুদাবখশ অর্থনৈতিক রায়াদা চালিয়ে চিঞ্চ মসণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু থাক এসব কচকালনি—মোদা কথা হচ্ছে অম্বলোক ইতিহাসের দুরবীনে আপন চোখটি এমনি চোপ ধরে আছেন যে অন্য কিছু তাঁর নজরে পরে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সকলের মনে গভীর সন্দেহ ছিল।

'আমরাখানেক পূর্ব তাঁর বড় ছেলে মারা গেল। মাদ্রিক ক্লাশে পড়ত, মেধাবী ছেলে, বাপেরই মত পড়াশুনার মনোভাব থাকত। বড় ছেলে মারা গিয়েছে, চোট লাগার কথা, কিন্তু খুদাবখশ নির্বিকার। সময়মত কলেজ ছাড়ার দিলেন। চায়ের সময় আমরা সন্তপণে শোক নিবেদন করতে গিয়ে আরেক প্রস্থ লেকচার শুনলুম, জরখুস্ত কেন অর্থনৈতিক কারণে রাজা গুশৎআসপরে তাঁর নুতন ধর্ম দীক্ষিত করলুম, তিন দিন বাদে দুসরা ছেলে টাইফয়েডে মারা গেল—খুদাবখশ বৌদ্ধ ধর্মের কি এক পিটিক, না যোদায় মালুম কি, তাই নিয়ে বাহাজনানলুন। এক মাস যেতে না যেতে স্ত্রী মারা গেলেন পিছালিয়ে—খুদাবখশ তখন সিদ্ধুর পারে পারে সিদ্ধুর শাহের বিজয়পথ্যুর অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধানে নাক-কান বন্ধ করে তুরীয়ভাব অবলম্বন করেছেন।

'আমরা ততদিনে খুদাবখশের আশা ছেড়ে দিয়েছি। লোকটা ইতিহাস করে করে অমানুষ হয়ে গিয়েছে এই তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর পাঠানসমাজ যখন মনুয্যজাতির সর্বোচ্চ গৌরবস্থল তখন আর কি সন্দেহ যে খুদাবখশের পাঠানত্ব সম্পূর্ণ কর্পূর হয়ে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক টেলিস্কোপের পাল্লারও বড় উর্ধ্বে দূরদূরান্তরে পক্ষেদ্রিয়াতীত কোন সম্মলোকে বিলী হলে গিয়েছে।

'এমন সময় মারা গেল তাঁর ছেলে ভাই—পল্টন কাক করত। খুদাবখশের আর কলেজে পাঠা নেই। আমরা সবাই ছুটে গেলাম খবর নিতে। গিয়ে দেখি এক প্রাতিহাসিক ছেড়া গালচের উপর খুদাবখশ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। পুথিপ্রত্ন, ম্যাপ, রুপাসা চতুর্দিকে ছড়ানো। গড়াগড়িতে চশমা আর একটা পরকলা ভেঙে গিয়েছে। খুদাবখশের বুড়ো মামা বললেন, দুদিন ধরে জল স্পর্শ করেননি।

'হাউ হাউ করে কাদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।' শোকে যে মানুষ এমন বিকল হতে পারে পূর্বে আর কখনো দেখিনি। আমরা সবাই নান্যাকবমের সান্দ্রনা দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু খুদাবখশের মুখে ঐ এক কথা, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে'।

'শেষত্যা থাকতে না গেলে আমি বললুম, 'আপনি পাণ্ডিত মানুষ, শোকে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আর আপনার সহ্য করবার ক্ষমতা যে কত অগাধ সে তো আমরা সবাই দেখেছি—দুটি ছেলে, স্ত্রী মারা গেলেন, আপনাকে তো এতটুকু কাতর হতে দেখিনি।

'খুদাবখশ আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি বন্ধ উদ্ভান। কিন্তু মুখে কথা ফুটল। বললেন, 'আপনি পর্যন্ত এই কথা বলেন? ছেলে মরেছিল তো কি? আবার ছেলে হবে। বিবি মরেছেন তো কি? নুতন শাদী করব। কিন্তু ভাই পাব কোথায়?' তারপর আবার হাউ হাউ করে কাদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।'

অধ্যাপক বলা শেষ করলে আমি বললুম, 'লক্ষ্যমণে মতুশোকে রামচন্দ্রও ঐ ব্রিলাপ করেছিলেন।'

আহমদ আলী বললেন, 'লতুন' রামচন্দ্ররাজী? হিন্দুদের কি একটা গল্প আছে না? সেইটে আমাদের শুনিয়া দিন। আপনি কখনো গল্প বলেন না শুধু শোনেনই।'

ইয়া আরা! আমি কবি বাম্পীকি যে গল্প বলেছেন আমাকে সে গল্প নতুন করে আমার টোটাফুটা উর্দু দিয়ে বলতে হবে। নিবেদন করলুম, 'অধ্যাপক খুদাবখশকে অনুরোধ করবেন। রামায়ণের নাকি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে।'

অধ্যাপক শুধলেন, 'কিন্তু রামচন্দ্ররাজী জবরদস্ত লড়েন-ওয়াল ছিলেন, নয় কি?'

আমি বললুম, 'আলবৎ।'

অধ্যাপক বললেন, 'ঐ তো হল আসল তত্ত্বখা। বীরপুরুষ আর বীরের জাতমাত্রই ভাইকে অত্যন্ত গভীর ভাবে ভালবাসে। পাঠানদের মত বীরের জাত কোথায় পাবেন বলুন?'

আমি বললুম, 'কিন্তু অধ্যাপক খুদাবখশ তো বীরপুরুষ ছিলেন না।'

অধ্যাপক পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললেন, 'সে তো ওহাতের তত্ত্ব। অধ্যাপকি কয়েক আর যাই করো, পাঠানরা যাবে কোথেকে? অর্থনৈতিক কারণ-ফারণ সব কিছুই অত্যন্ত পাতলা ফিল্ম—একটু খোঁজ লাগলেই আসল পেলেট বেরিয়ে পড়ে।'

মেজর মুহাম্মদ খান বললেন, 'ভাইকে ভালোবাসার জন্য পাঠান হওয়ার কি প্রয়োজন? ইউসুফও (জোসেফ) তো বেনয়ামিনকে (বেনজামিন) ভয়ঙ্কর ভাল বাসতেন।'

অধ্যাপক বললেন, 'ইহুদিদের কথা বাদ দিন। আমাদের এক ছেলে আরেক ছেলেকে খুন করেনি?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পাঠানরা ইহুদিদের হারিয়ে-যাওয়া বারো উপজাতির একটা নয়? কোথায় যেন ঐ রকম একটা থিয়োরি শুনেছি যে সেই জাতিগুলি যখন দেখল তাদের কপালে শুকনো, মরা আফগানিস্তান পড়েছে তখন হাতিমার্ট করে কেঁদে উঠেছিল—আরও ফারসীতে থাকবে বলে "ফুগান" করেছিল—তাই তো তাদের নাম "আফগান"। আর আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুধর্মী হয়েছেন।'

অধ্যাপক পাণ্ডিতের হাসি হেসে বললেন, 'ত্রিশ বছর আগে এ কথা বললে আপনাকে আরো সাবাসী দিতুম, এখন ওসব বদলে গিয়েছে। তখনো আমরা জানতুম না যে, দুনিয়ার বড় বড় জাতেরা নিজেরদের 'আর্য' বলে গৌরব অনুভব করছে। তখনো রেওয়াজ ছিল খানদানী হতে হলে বাইবেলের ইহুদী চিড়িয়াখানায়া কোনো না কোনো ঝাঁচার সিংহ বাঁদর কিছু না কিছু একটা হতেই হবে। এখন সে সব দিন গিয়েছে—এখন আমরা সবাই 'আর্য'। বেদফেদ কি সব আছে না?—সেগুলো সব আমরাই আড়িড়েছি। সিন্দুর শাহকে লড়াইয়ে আমরাই হারিয়েছি আর গান্ধার ভাস্কর্য আমাদেরই কাঁচা বয়সের হাত মাস্পের নমুনা। 'গান্ধার' আর 'কান্দাহার' একই শব্দ। আরবী ভাষায় 'গ' অক্ষর নেই বলে আরব ভৌগোলিকেরা 'ক' ব্যবহার করেছেন।'

পাণ্ডিত্যের অগাধ সাগরে তখন আমার ভ্রাণ যায় যায়। কিন্তু বিপদ-আপদে মুশ্ফিল-আসান হামেশাই পুলিশ। আহমদ আলী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রফেসরের ওসব কথা গায়ে মাখবেন না। ইসলামাবাদ কলেজের চায়ের ঘরে যে আজ্ঞা জম্মে তারি বামিকটে পেতলে নিয়ে তিনি সুন্দর ভাষায় রঙীন গলাসে আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন। কিন্তু আসল পাঠান এবং জিনিস নিয়ে কক-চো মাথা ঘামিয়ে পাগড়ির প্যাচ ঢিলে করে না। আফ্রিদী ভাবে, আফ্রিদী হল দুনিয়ার সেরা জাত; ঘোমদে ঘেঁষে বাজি কথা, খুঁতলালার খাপ পেয়ারা কোনো জাত যদি দুনিয়ায় থাকে তবে সে হচ্ছে মোহমদ জাত। এমন কি, তারা নিজেরের আফগান বলেও স্বীকার করেন না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই বুঝি আপনারা স্বাধীন আফগানিস্তানের অংশ হতে চান না? ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে, স্বাধীন পাঠান হয়ে থাকবেন বলে?'

সব পাঠান এক সঙ্গে চোঁচিয়ে বললেন, 'আলবৎ না; আমরা স্বাধীন ফুটিয়ার হয়ে থাকব—সে মুহুরকের নাম হবে পাঠানমুহুরক।'

অধ্যাপক বললেন, 'পাঠানের সোপবস্ত্র লেকচার শোনেদনি বুঝি কখনো। সে বলে, 'ভাই পাঠানসব, এস আমরা সব উড়িয়ে দি; ডিমোক্রেসি, অটোক্রেসি, ব্রোক্রেসি, কমুনিজম, ডিক-টেকশিপ—সব সব।' আরেক পাঠান তখন চোঁচিয়ে বলল, 'তুই বুঝি অ্যানাকিস্ট?'

পাঠান বলল, 'না, আমরা অ্যানাকিস্ট উড়িয়ে দেব।'

অধ্যাপক বললেন, 'বুঝতে পেরেছেন?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'একেবারে বৃন্দ হয়ে যাবে, কিম হয়ে যাবে, ভেঁ হয়ে যাবে, তারপর 'না' হয়ে যাবে।' এই তো?'

অধ্যাপক বললেন, 'ঠিক ধরেছেন?'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষের অংশ যখন হবেন না, তখন দয়া করে রাশানদের আপনারাই ঠেকিয়ে রাখবেন।'

সবাই সমধর্মের বললেন, 'আলবৎ।'

ছয়

পৃথিবীর আর সব দেশে যেতে হলে একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করে যে কোনো বন্দরে গিয়ে হাজির হলেই হল। আফগানিস্তান যেতে হলে সেটি হবার যো নেই। পেশাওয়ার পৌছে আবার নতুন স্ট্যাম্পের প্রয়োজন। সে-ও আবার তিন দিন পরে নাকচ হয়ে যায়। খাইবারপাসের আশে পাশে কখন যে দাফগাহাফামা লেগে যায় তার খ্রিস্টাব্দ নেই বলেই এই বন্দোবস্ত। আবার এই তিন দিনের মিয়াদী স্ট্যাম্প সত্ত্বেও হয়ত খাইবারের মুখ থেকে মোটার ফিরিয়ে নিতে পারেন—যদি ইতিমধ্যে কোনো বৎকা লেগে গিয়ে থাকে।

সেই স্ট্যাম্প নিয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় দেখি হরেক রকম বিদেশী লোকে ভর্তি কতকগুলো বাস পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এগুলো কোথায় যাচ্ছে?'

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'এগুলো কাবুল যায় না।' তারপর অন্য কথা পাড়বার জন্য বললেন, 'বাঙলা দেশের একটা গল্প বলুন না।'

আমি মনে মনে বললুম, আচ্ছা তবে শোন। বাইরে বললুম, 'গল্প বলা আমার আসে না, তবে একটা জিনিসে পাঠানে বাঙালীতে মিল দেখতে পেয়েছি, সেইটে আপনাকে বলছি, শুনুন—'

এখানে যে রকম সব কারবার পাঞ্জাবী আর শিখদের হাতে, কলকাতায়ও কারবার বেশী ভাগ অ-বাঙালীর হাতে। আর বাঙালী যখন ব্যবসা করে তখন তার কায়দাও আভ্রব।

'আমি তখন ইলিট রোডে লাক্ষ্মী, সেখানে দেকানপাট ফিরিজীদের। মুসলমানদের কিছু কিছু দজীর দোকান আর ধান, বাসু। তার মাঝখানে এক বাঙালী মুসলমান খাঁচকচকে ফ্যান্সি দোকান খুলল। লোকটির বেশভূষা দেখে মনে হল, শফিক, ভক্তলোকের ছেলে। স্থির করলুম, সাহস করে দোকান যখন খুলেছে তখন তাকে পেটানাইজ করতে হবে।

‘জোর গরম পড়েছে—বেলা দুটো। শহরে চকিবাজীর মত ঘুরতে হয়েছে—দেশার সাবান
চোখে পড়েছে কিন্তু কিনিনি—ভরলোকের ছেলেকে পেটাইজ করতে হবে।’

‘ট্রাম থেকে নেমে দোকানের সামনে এসে দেখি ভরলোক নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, পাখিটা
খাঁচায় ঘুমছে, ঘড়িটা পর্যন্ত সেই যে বারোটা দুপুরে পড়িয়েছিল, এখনো ভাগেনি।’

‘আমি মোলোয়াম সুরে বললুম, ‘ও মশাই, মশাই।’

‘ফের ডাকলুম, ‘ও সায়েব, সায়েব।’

‘কোনো সাড়াশব্দ নেই। বেজায় গরম, আমারও মেজাজ একটু একটু উষ্ম হতে আরম্ভ
করেছে। এবার চোঁচিয়ে বললুম, ‘ও মশাই, ও সায়েব।’

‘ভরলোক আন্তে আন্তে বোয়াল মারের মত দুই রান্ডা টকটকে চোখ সিকিটাকা খুলে
বললেন, ‘আজ্ঞে ?’ তারপর ফের চোখ বন্ধ করলেন।’

‘আমি বললুম, ‘সাবান আছে ? পামওলিত সাবান ?’

‘চোখ বন্ধ রেখেই উত্তর দিলেন না।’

‘আমি বললুম, ‘সে কি কথা, এ তো রয়েছে শে—কেসে।’

‘ও বিকিরির না।—’

তারপর আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘পাঠানরাও বুঝি এই রকম ব্যবসা করে ?’
তিনি তো খুব খানিকক্ষণ ধরে হাসলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেন বলুন তো ?’

আমি উত্তর দিলুম, ‘ঐ যে বললেন এসব বাসু কাবুল যায় না।’

এবার আহমদ আলী ধমকে দাঁড়ালেন। দেয়ালের দিকে ঘুরে, কোমরে দু’হাত দিয়ে
অনেকক্ষণ ধরে ঠাটা করে হাসলেন। সে তো হাসি নয়—হাসির ধমক। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে
অপেক্ষা করছি কখন ঠায় হাসি যাবে। উত্তর দিলেন ভালো। বললেন, ‘এসব বাসু
খাইবারপাস অবধি গিয়েই বাসু !’

আমি শুধালুম, ‘এই সামান্য রসিকতায় আপনি এত প্রচুর হাসতে পারেন কি করে ?’

‘কেন পারেন না ? হাসি কি আর গল্পে ঠাসা থাকে, হাসি থাকে খুশ—দিলে। আপনাকে বলিনি
স্বাধীনতা কোথায় চাষে বেঁধে থাকে ? রাইফেল নয়, বুকের খুন। একটা গল্প শুনবেন ? ঐ
দেখছেন, হোথায় চায়ের দোকানী উটলোয় বেঞ্চি পেতে দিয়েছে। চলুন না।’

পাঠান মার যাত্রাকৃত ডিমোক্র্যাট। নির্জলা টাঙ্গাওয়াল বিড়িওয়ালার চায়ের দোকান।

আহমদ আলী তার বিশাল বপুন্যনার গুজন সম্পর্কে সচেতন বলে হুটীর উপর ভর দিয়ে
বসলেন, আমি আমার তনুখানা বেধেই খুশী রাখলুম। বললেন—

‘এমর খৈয়ামে এক রাতে বজ্র নেশা পেয়েছে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঁচখানা
কুলাইয়া শেষ না করে উঠবেন না। জানেন তো কি রকম ঠাসবদুনির কবিতা—শেষ করতে
করতে রাত প্রায় কাবার হয়ে এল। মদের দোকানে যখন পৌঁছলেন তখন ভোর হব হব।
ভরলোক দিয়ে বললেন, ‘নিয়ে এস তো হে, এক পান্ডর উৎকৃষ্ট শিরাজী।’ মদওয়াল কাঁচুমাচু
হয়ে বলল, ‘ভজুর এত দেরিতে এসেছেন, রাত কাবারের সঙ্গে সঙ্গে মদও কাবার হয়ে
গিয়েছে।’ ওমর নরম হয়ে বললেন, ‘শিরাজী নেই তো অন্য কোনো মাল দাও না।’ মদওয়াল
বলল, ‘শরম কী বাঃ। কিছু নেই ছজুর।’ ওমর বললেন, ‘পরোয়া নদারদ, ঐ যে সব এটো
পোয়ালোলা গ্যাগজিট যাচ্ছে সেগুলো ঘুয়ে তাই দাও দিকিনি—নেশার জিম্মাদারি আমার।’

জিম্মাদের জিম্মাদারি, হাসির জিম্মাদারি, নেশার জিম্মাদারি কিংসে, কার, সে সম্পর্কে
আলোচনা করার পূর্বেই দেখতে পেলুম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সেই ভেজাল পাঠান—তার
রাস্তা—দোষ, তিনি তিন মাস লাহোরে কাটিয়েছিলেন—রমজান খান। আমি আহমদ আলীকে

আঙুল দিয়ে দেখালুম। আর যায় কোথায় ? ‘ও রমজান খান, জানে মন, বগাদরে মন, এদিকে
এসো।’ আমাকে তালী করে বললেন, ‘আমার লোক, আমি না ডাকলে আপনি ঠেকে যেতে
দিতেন ? এই গরমে ? লোকটা সর্গিষি হয়ে মারা যেত না ? আন্না রসুলের ভর-ভর নেই ?’

রমজান খান এসে বললেন, ‘ভগিনীপতির অসুখ, তার করতে যাচ্ছি।’ বলেই খুপ করে
বেঙ্কিতে বসে পড়লেন। আহমদ আলী সম্পূর্ণা দিয়ে বললেন, ‘হবে, হবে, সব হবে।
টেলিগ্রাফের তার শক্ত বলে তেরী—দুচার ফটা ফটা ফটে যাবে না। সুখবর শোনো।’
হিসেদ সাহেব একখানা বড়ই উমদা গল্প শেখ করেছেন।’ বলে তিনি আমার কাঁচাসিদ্ধ গল্পে বিস্তার
টমটো—রস আর উদ্ভার সসু ঢেলে রমজান খানকে পরিতবেশন করলেন। বারে বারে বললেন ‘ও
সাবান বিকিরির না—এ বাস কাবুল যায় না। এ কেন বাঙলা দেশের পূব আকাশে সূর্য্যোদয়
আর পেশাওয়ারের পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেল। ভবত একই রঙ।’

রমজান খান বললেন, ‘তা তো বুঝলুম। কিন্তু বাঙালী আর পাঠানে একটা জায়গায় সংখ
গরমিল আছে।’

আমি শুধালুম, ‘কিসে ?’

রমজান খান বললেন, ‘আমি সিদ্ধান্দ পেরিয়ে আহমদ আলীর পাক নজরে যে মহাপাপ
কিছুই এটা সেই সিদ্ধিপারের কাহিনী। তবে আটকের কাছে নয়, অনেক দক্ষিণে—সেখানে
সিদ্ধি বেশ চড়াও। তারি বাবুজীর বসে দুপুর রোদে আটজন পাঠান যামাচ্ছে। উটা ভাড়া দিয়ে
তারা ছিয়ানবুই টাকা পেয়েছে, কিন্তু কিছুই তা সমানে সমাজন ভাগ বাটোয়ারা করতে পারছে
না। কখনো কারো হিন্দ্যায় কম পড়ে যায়, কখনো কিছু টাকা উপরি থেকে যায়। ক্রমাগত
নুতন করে ভাগ হচ্ছে, হিসেব মিলছে না, ঘাম বরছে আর মেজাজ তিরিখি হয়ে গলাও
চড়াচ্ছে। এমন সময় তারা দেখতে পেল, অন্য পার দিয়ে এসে বেনে তার পুঁটুলি হাতে করে
যাচ্ছে। সব পাঠান এক সঙ্গে চোঁচিয়ে বেনেকে ডাকল, এপারে এসে তাদের টাকার কৈসলা
করে দিয়ে যেতে। বনে যাও না দেড়ে বোঝালো অতি মেহরত তার সহইবে না, আর কত
টাকা ক’জন লোক ভাঙি জামতে চাইল। চার কুড়ি দশ ও তার উপরে ছয় টাকা আর
হিসেদার আটজন। বেনে বলল, ‘বারো টাকা করে নাও ?’ পাঠানরা চোঁচিয়ে বলল, ‘তুই একটু
সবুর কর, আমরা দেখে নিচ্ছি বখরা ঠিক ঠিক মেল কিনা।’ মিলে গেল—সবাই অবাক।
তখন তাদের সর্দার চোখ পাকিয়ে বলল, ‘এতক্ষণ ধরে আমরা চেষ্টা করলুম, হিসেব মিলল না,
এখন মিলল কি করে ? ব্যাটা নিকসই কিছু টাকা সরিয়ে নিয়ে হিসেব মিলিয়ে দিয়েছে।
ওপার থেকে সে যখন হিসেব মেলাতে পারে তখন নিকসই কিছু টাকা সরাতও পারে।
পাকড়া শালাকা !’

রমজান খান বললেন, ‘যুঝতেই পারছেন, পরোপকার করতে গিয়ে বেনের পোর অবস্থা।
ভাগ্যিস সিদ্ধি সেখানে চড়াই এবং বেনের আর কিছু পারুক না—পারুক, ছুঁতে পারে আরবী
বোয়ার চেয়েও তেজো। সে—যাত্রা বেনে বেঁচে গেল।’

আমি বললুম, ‘গল্পটি উপাদেয়, কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে মিল-গরমিলের এতে আছে কোন
টাজ ?’

রমজান খান বললেন, ‘বাঙালী আপন দেশে বসে, এভারেষ্টের গায়ে ফিতে না লাগিয়ে,
চুয়েয় চড়াতে গিয়ে খামখা জান না দিয়ে ইংরেজকে বাংলা দেয়নি, ঐ দুনিয়ার সবচেয়ে উচ্চ
পাহাড়।’

আমি বললুম, ‘হাঁ, কিন্তু নাম হয়েছে ইংরেজের।’

আহমদ আলী শুধালেন, ‘তাই বুঝি বাঙালী চটে গিয়ে ইংরেজকে বোমা মারে ?’

আমি অনেকদূর ধরে বাড়ি চুলকে বললুম, 'সেইও একটা অতি সুন্দর কারণ বটে, তবে কিনা শিকদার এভারেস্ট সায়েবকে বোমা মারলেন।'।

রমজান খান উম্মা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু মারা উচিত ছিল।'

আমি বললুম, 'হ', কিন্তু একটু সামান্য টেকনিকল মুশকিল ছিল। নামকরণ যখন হয় শিকদার তখন কলকাতায় আর মহামান্য স্যার জর্জ লগুনে পেনসন টানছেন। পায়টান—'

পুরো পাঠান এবং নিমপাঠান এক সপ্তে হা হা করে উঠলেন। শুধালেন, 'তার মানে? তবে কি ও লোকটার তদারকিতেও এভারেস্টে মাথা হয়নি?'

আমি বললুম, 'না। কিন্তু আপনারা এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? এই আপনারদের জাহেবরাদারি কববার কাবুল দখল করেছেন আমার ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখা আছে যে, না। হয়েছে প্রতিভারই ইংরেজের। আর আপনারা যখন হাত গুটিয়ে বসেছিলেন তখনই হয় ইংরেজ কচুকাটা হয়ে মরেছে, নয় আপনারদের বদমাশ দিয়ে নিজের অপমান জ্বালার মত মোটা মোটা মেডেল পরে ঢেকেছে। এই গেলবারে যখন দু'খানা আকবরশাহী কামান আর তিনখানা জাহাঙ্গিরী বন্দুক দিয়ে আমানউল্লা ইংরেজকে ভুলোথানা করে ছাড়লেন, তখন ইংরেজ তামাম দুনিয়ায়কে ঢাক পিটিয়ে শোনায়নি যে, পাঠানের ফেরেবাজিতেই তারা লড়াই হারল?'

রাজান খান বললেন, 'বাঙালী এত খবর রাখে কেন?'

আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে না করেন, আর গোস্তাকি বেয়াদবি মাফ করেন, তবে সরিনয় নিবেদন, আপনারা যদি একটু বেশী খবর রাখেন তা হলে আমরা নিশ্চুতি পাই।'

দুজনেই চুপ কর গুনলেন। তারপর আহমদ আলী বললেন, 'সৈয়দ সাহেব, কিছু মনে করবেন না। আপনারা বোমা মারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন চালান, ইংরেজ আপনাদের ভয়ও করে। এসব তো আরম্ভ হয়েছে মাত্র সেদিন।' কিন্তু বকুনু তো, যেদিন দুনিয়ার কেউ জানত না ফ্রন্টিয়ার বলে এক ফালি পাথরভর্তি শুকনো জমিতে একদল পাহাড়ী থাকে সেদিন ইংরেজ তাদের ঘেরে শেষ করে দিত না, যদি পারত? ফসল ফলে না, মতি ঝুঁড়লে সোনা টানি কমলা তেল কিছুই বেরায় না, এক ফৌজা জ্বরের জন্য ভোর বোঝার ভিত্তি আগে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরোয়, এই দেশ কামড়ে ধরে পড়ে আছে মূর্খ পাঠান, কৃত যুগ্ম ধরে, কৃত শতাব্দী ধরে কে জানে? সিদ্ধুর পোয়ারে যখন বর্ষায় বাতাস পর্যন্ত সবুজ হয়ে যায় তখন তার হাতছানি পাঠান দেখেনি? পুরোঘরা ভেজা ভেজা হাওয়া অল্পত মিটে মিটে গন্ধ নিয়ে আসে, আজ পর্যন্ত কত জাত তার নেশায় পাগল হয়ে পুবে দেশে চলে গিয়েছে—মায়নি শুধু মূর্খ আফ্রিদী মোমদ।

'কড়াই করে যখন ইংরেজ এদেশকে উচ্ছন্ন করতে পারল না তখন সে প্রকোপিত দেখায়নি? লাখ লাখ লোক পল্টনে ঢুকল। ইংরেজের বাগা এদেশে উড়ল বটে, কিন্তু তার রাজত্ব এ বাগা যতদূর থেকে দেখা যায় তার চেয়েও কম। আর পল্টনে না ঢুকে পাঠান করতই বা কি? পাঠানমোগল আমলে তাদের ভাবনা ছিল না। পল্টনে মরওয়াজা খোলা, অথবা মোগলপাঠান এই গরীব দেশের গায়ে গায়ে ঢুকে বুড়ার রুটি কাড়তে চায়নি, বউঘিকে বিদেশী হারাম কাপড় পরাতে চায়নি। শাহানশাহ বাদশাহ দীনানুয়ার মালিক দিল্লীর তখনেলশীম সরকার-ই-আলা যখন হিন্দুস্থানের গরম বরনাস্ত না করতে পেলে এদেশ হয়ে ঠাণ্ডা সবুজ মোলায়েম কাবুল শহর বেঁচেন, পাঠান তখন তাঁকে একবার তসলীম দিতে ঠাণ্ডা সবুজ মোলায়েম কাবুল শহর বেঁচেন, পাঠান তখন তাঁকে একবার তসলীম দিতে আসত। শাহানশাহ বুশ, পাঠান তবু। বাদশাহের মীর-বখশী শিহনেদার তাজমহল থেকে মুঠা মুঠা আশরফী রাস্তার দুদিকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতেন। 'জিন্দাবাদ শাহানশাহ জহানপানা' চিৎকার

খাইবারের দুদিকের পাহাড়ে টুকর খেয়ে খেয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে খুদাতালার পা-দানে গিয়ে যখন পৌঁছাত তখন সে প্রশস্ততারনি লক্ষ করেই নয়, কোটি কোটি কটের। সে আশরফী আজ নেই, পর্বত-পারে প্রশস্ততার প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু এ পাথরের টুকরোগুলা পায়ণ পাঠান আপন ছাতির খুন দিয়ে এখনো স্বাধীন রেখেছে। তাই তার নাম এখনো 'নো ম্যান্স ল্যাণ্ড'। পাঠান আর কি করতে পারত, বলুন।'

আমি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বারবার আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'আমি সে অর্থে কথাটি বলিনি। আমি ভদ্রসন্তানদের কথা ভাবছিলাম এবং তাঁরাও কিছু কম করেননি। তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ না করলে পাঠান সেপাই হয়তো আমানউল্লার বিরুদ্ধে লড়ত।'

আহমদ আলী বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের কথা বাদ দিও না। এই অপলাদ শ্রেণী যত শীঘ্র মরে ভূত হয়ে অজরদিলের দক্ষতরে গিয়ে হাজিরা দেয় ততই ইমঙ্গল।'

রমজান খান আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের লড়ার কায়দা আর পাঠান সিপাহির লড়ার কায়দা তো আর এক ধরনের হয় না। সময় যেদিন আসবে তখন দেখতে পাবেন আমাদের 'অপলাদ' আলী কেন্দ্র দল গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

আমি আহমদ আলীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালুম। আহমদ আলী বললেন, 'আমি সব কথা ভালো করে শুনেতে পাইনে। একটু কালা—খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!'

সাত

আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'হোয়ায় উন্ সুফর, নিসুফ উন্ সুফর'—অর্থাৎ কিনা 'যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ।' পূর্ব বাঙালারও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, 'উঠানে সমুদ্র পেরলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠানে পেরতে গিয়ে আমরা পাক্সা স্টান্ডারনে কেটে গেল। আদিনির দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর নির্বিশালা দিয়ে বিদায় দিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল 'আমি একা', এখন মনে হল 'আমি ভয়ঙ্কর একা'। 'ভয়ঙ্কর একা' এই অর্থে যে 'নো ম্যান্স ল্যাণ্ড'ই বলুন আর খাস আফগানিস্তানই বলুন এসব ভাষায়ায় মাঝে আপন আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত। শুনেছি, কাবুলের বাইরেও নাকি পুলিশ আছে, কিন্তু আফগান আইনে খুন পর্যন্ত এখনো ঠিক 'কগনিজবল অফেন্স' নয়। রাজহাজিরি সময় যদি আপনি পাঠানী কায়দায় চটপট উড়ু হয়ে গুয়ে না পড়েন তাহলে সে ভুল অথবা গৌরাভূমির খেসারতি দেবেন আপনি। রাষ্ট্রাঘাত কি করে চলতে হয় তার আলিম দেওয়া তো আর আফগান সরকারের জিম্মায় নয়। 'কীপ টু দি লেফট' তো আর ইংরেজ সরকার আপনারকে ইচ্ছুরে নিয়ে গিয়ে শেখায় না। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, আপনি যদি প্রাণটো নিতান্তই দিয়ে দেন তবে আপনার আত্মীয়স্বজন তো রয়েছেন—তাঁরা খুনের বদলাই নিলেই তো পারেন। একটা বুলেটের জন্য তো আর আনুকমুখক বেচতে হয় না, পারমিটও লাগে না।

সামারল লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে একরকম কথাই কম। তবু আফগানিস্তান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুনখারাবির প্রতি এত বেমানাম উদাসীন নয় তখন তাদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে দু'চারটে পুলিশ দু'একদিন অকুশল বোঝাবারি করে যায়। যদি দেখে আপনার আত্মীয়স্বজন 'কা তব কাস্তা' দর্শনে ঝুঁদ হয়ে আছেন অথবা শোনে যে খুনী কিস্তা তার সূচনায় আত্মীয়স্বজনকে চাকচিক্যময় বিশেষ বিরল

ধাতুদ্বারা নাক কান চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, আপনার জীবনের এই তিনদিনের মুসাব্বিরাতে কে দু' দফা আগে গেল, কে দু' দফা পরে গেল, কে বিছানায় আরো রসুলের নাম শুনে গেল, কে রাস্তার পাশের নয়ানজলিতে খাবি খেয়ে খেয়ে পাড়ি দিল এসব তাৎৎ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তবে বিবেচনা করুন, মহাশয়, পুলিশ কেন মিছে আপনাদের তথা বুলী এবং তস্যা আত্মীয়স্বজনদের মামেলায় আরো ঝামেলা বাড়িয়ে সবাইকে খামকা, বেফায়দা তুল্প করবে? নিরীকল্প বৈরাগ্য তো আর আপনাদের একচেটিয়া কারবার নয়, পুলিশও এই সার্বজনীন সার্বভৌমিক দর্শনে অংশীদার। তবে হ্যাঁ, আলবৎ, এই বিশ্বের সংসারের মাঝে নান্নো রুটি-গোস্তরের প্রয়োজন হয়, সরকার যা দেন্নো তাতে সব সময় কুলিয়ে ওঠে না। বুলীর আত্মীয়স্বজনকে যখন মেয়েবালা খুদাতালা ধনদৌলত দিয়েছেন তখন—? তখন আফগান পুলিশকে আর দেখা যাবে কি হবে।

কিন্তু একটা বিষয়ে আফগান সরকার সচেতন—রাহাজানির যেন বাড়াবাড়ি না হয়। খুবীয়া সমরকন্দ শিরাজ তেহরানে যদি খবর রটে যায় যে, আফগানিস্থানের রাজবন্দি অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল তাহলে বাবসাণিজাত বন্ধ হয়ে যাবে ও আফগান সরকারের সঙ্কট-হ্রস্ব স্বগতিশ্রু প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।

জানদিকে ড্রাইভার শিশু সর্দারজী। বয়স যাটের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জমানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালারঞ্জাম ছাড়িয়ে আনার জন্য। সব ভাষাই জানেন অখচ বলতে গেলে এক ফারসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরিজী না বোঝেন তবে তিনি ভাবাবনা করেন যেন আপনিই যথেষ্ট ইংরিজী জানেন না, তখন তিনি ফারসীর যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু বাগিয়ে। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্ষদের সঙ্গে কথা বলবার যকুমারি আর তিনি কত পোহানেন? অখচ পরে দেখলুম ভ্রলোকের অত্যন্ত বন্ধুত্ববল্লব, বিপদের সহায়। তারো পরে বুরুতে পারলুম ভাষা বাবতে ভ্রলোকের এ দুর্দান্ততা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাণ্ডিত্যের দাবি করে বেতারের চাকরী পেয়েছেন। আমার সঙ্গে দুদিন একাসনে কাটাবেন—আমি যদি কামুলে গিয়ে রুটাই যে, তিনি গণ্ডুখলোর সফরী তাহলে বিপদাপদের সস্তাবনা। কিন্তু তাঁর এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল—তাঁর অজানতে বড়কর্তাদের বহাল ছিলেন তার সরল কারণ, অন্য সবাই ভাষা জানতেন তাঁর চেয়েও কম। এ তত্ত্বটি কিন্তু তিনি নিজে বুঝতে পারেননি। সরল প্রকৃতির লোক, নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে এতই ব্যস্ত যে পরের অজ্ঞতা তাঁর চোখে পড়ত না। গুলীয়া বলেন, 'চোখের সামনে ধরা আপন বন্ধুমুঠি দুয়ের হিমালয়কে ঢেকে ফেলে।'

বাসের পেটে একপাল কাবুলী ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পেলেট-সাবান, ব্যাড-লন্টন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজসরঞ্জাম, কেতাবপুথি, এক কথায় দুনিয়ায় সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফগান শিল্প প্রস্তুত করে যাত্রা ডিম বস্ত্র—বন্দুক, গোলাগুলী আর শীতের কাপড়। বাসবাণী প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্তান থেকে, কিছুটা রশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্য-প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়।

সে সব পরের কথা।

আগের দিন পেশাওয়ারে ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল—ছায়াতে। এখন বাস্ যাচ্ছে যেখান

দিয়ে সেখান থেকে দরবার নিয়ে তাকালেও একটা পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। থাকার মধ্যে আছে এখানে এখানে পাথরের গায়ে হলদে বাসর গেটা।

হস্টেলে স্টোভ ধরাতে গিয়ে এক আনাড়ী ছোকরা একবার জ্বলন্ত স্পিরিটে আরো স্পিরিট ঢালতে গিয়েছিল। ধপ করে বোতলে স্টোভে সর্বত্র আগুন লেগে ছোকরার ভুফ, চোখের লোম, মোলায়েম গোঁপ পুড়ে গিয়ে কুকুড়ে মুকুড়ে এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। এখানে যেন ঠিক তাই। মা ধরনী কখন যেন হঠাৎ তাঁর মুখখানা সূর্য দেবের অত্যন্ত কায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেখানে আগুনের এক ধাবড়ায় তাঁর চুল ভুফ সব পুড়ে গিয়ে মাটির চামড়া আর বাসের চুলের সেই অবস্থা হয়েছে।

এরকম ঝলসে—রাওয়া দেশ আর কখনো দেখিনি। মরুভূমির কথা আলাদা। সেখানে যা কিছু পোড়বার মত সে সব আমাদের জন্মের বহুপূর্বে পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গিয়েছে মরুভূমি ছেড়ে—সার হয়ে নতুন ঘাসপাতা জন্মবার চেষ্টা আর করেনি। সূর্যদেব সেখানে একছত্রাবিপতি। এখানে নগ্না ভীষন্ত স্বদ্ধ। স্বদ্ধ বলা ভুল—এখানে নির্মম কঠোর অত্যাচার। ধরনী দেশকে শস্য-শ্যামল করার চেষ্টা এখানে সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি—প্রতি ক্ষীণ চেষ্টা বারে বারে নির্দয় প্রহারে ব্যর্থ হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী প্রজার কথা মনে পড়ল। বার বার তারা চরের উপর খড়ের ঘর বাঁধে, বার বার জমিদারের লেইল সব কিছু পুড়িয়ে দিয়ে ছারখার করে চলে যায়।

পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হল। তারপর খাইবার গিরিসঙ্কট।

তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না, করজোড়ে স্বীকার করে নিছি। কারণ আমি যে অবস্থায় ঐ সঙ্কট অতিক্রম করেছি সে অবস্থায় পড়লে স্বাধে পিরের লোতি কি করতে জানিনে। লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মত অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলা মত অসাধারণ ক্ষমতা অন্য কোনো লোকের রচনায় চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিগুরু বাঙালীর অচেনা জিনিস বর্ণনা করতে ভালোবাসেন না। পাহাড় বাঙলা দেশে নেই—তাঁর আড়ষ্ট খাজার গানের কোথাও পাহাড়ের বর্ণনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সমুদ্র বাঙলা দেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে কিন্তু সাধারণ বাঙালী সমুদ্র দেখে জগদাখের রথ দলনের সঙ্গে সলো কলি চোরের মত করে—পুতীতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যও তাই 'পুরীর সমুদ্র দর্শনে' অখচ তিনি যে লোতির চেয়ে খুব কম সমুদ্র দেখেছিলেন তাও তো নয়। তবু এ সব হল বাঙালীর কিছু কিছু দেখা—সমুদ্র সমুদ্র অচেনা জিনিস নয়। কিন্তু শীতের দেশের সঙ্গেই অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরফপাত, রবীন্দ্রনাথ নিম্নেনপক্ষে সে সৌন্দর্য পাঁচ শ' বার দেখেছেন, একবারও বর্ণনা করেননি।

তবু যদি কেউ বারফ্রন্ট সেই গরম সহ্য করে খাইবারপাসের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে তাহলে আলাদা কথা। শীতমকুষ্ম বলেছেন, সংসারের সুখদুঃখ অনুভব করা যেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার মত। ক্ষ্যানিবিস্তির আনন্দ সে তাতে পায় বটে কিন্তু ওদিকে কাঁটার ঘোচায় ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্তও পড়ে। তাই অনুমান করা বিচিত্র নয় খাইবারের গরম কাঁটা খেলে তার থেকে কাব্যতত্ত্বা নৃবিশিষ্ট কারও মত রসও কিছুই বেরতে পারে।

আমি যে বাসে গিয়েছিলুম তাতে কোনোপ্রকারের রস থাকার কথা নয়। সিকন্দরশাহী, বাবুরশাহী রাস্তা দিয়ে তাকে যেতে হবে বলে তাঁর উপযুক্ত মিলিটারি বন্দোস্ত করেই সে বেরিয়েছে। তার আশ্রয়স্থলকে পুরু করায়গেটে টিন দিয়ে ঢাকা এবং নম্বর ভঙগুর কাঁচ সে তার উইও-স্ক্রীন থেকে বেড়ে ফেলে দিয়েছে। একটা হেড-লাইট কানা, কাঁচের অবগুণ্ডন

নেই। তখনই বুঝতে পারলুম বাইবেলের শব্দটা প্রাশংসক—এ বর্ণিত এক চোখের মর্হিমা—

"Thou hast ravished my heart, my spouse, thou hast ravished my heart with one of thine eyes."

যে সমস্যাটির সমাধান বড়দিনে বড় কলকণ্ডে বড় চিকিৎসার্নী খেঁটেও করতে পারেনি, আজ এক দুহুত সঙ্গরক্ষণ কৃপায় আর খাবারী বাসের নির্মিতে তার সমাধান হয়ে গেল।

দুনিরক হাজার ফুট উচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাবারপাস। এক ফোড়া রাস্তা একেবৈকে একে অনোর গা ঘেঁষে চলেছে কবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খাচর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা কারাভানের জন্য। সম্বন্ধীভবন স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মত চলতে চলতে এতই একেবৈকে গিয়েছে যে, যে-কোনো জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ত ডাইনে বায়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

বিপ্রহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে—তাই নিয়ে চতুর্দিকে পাহাড় যেন লোকানুফি খেলছে। এই গিরিসঙ্কটে আফগানের লক্ষ কষ্ট প্রতিধ্বনিত হয়ে কোটি কণ্ঠে পরিবর্তিত হত—এই গিরিসঙ্কটে এক মার্তও ফণে ফণে লক্ষ মার্তও পরিণত হন। তাদের কোটি কোটি অগ্নিজিহ্ম আমাদের সর্বাংশ লেহন করে পরিতুই হন না, চক্ষুর চর্চ পশ্চত অগ্নিশিখা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ে দেখি সর্দারজীর চোখ সম্যাস্পর্শ না করেই সম্মাধ্যাক্ষের মত লাল হয়ে উঠেছে। কাবুলী রুমাল দিয়ে ফেটা মেরে চোখ বন্ধ করেছে। নুগুচোখে সজ্জন লোক ফায়ারিং স্কোয়ারডের সামনে দাঁড়তে পারে?

এই গরমেই কি কান্দাহারের বধু গাছারী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? কান্দাহার থেকে দিল্লী যেতে হলে তো খাবারপাস ছাড়া গতাত্তর নেই। কে জানে, ধৃতরাষ্ট্রকে সাহুনা দেবার জন্য, অন্ধ বধুর দুর্দৈব দহন প্রশমিত করার জন্য মহাতারতকার গাছারীর অন্ধত বরণের উপাখ্যান নির্মাণ করেননি?

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুঝার পুত্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ানা চামড়ার ওড়ারকোট গায়ে দিয়ে শব্দের খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজীকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বলেন, 'মাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সভাই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম ঢুকতে পারে না, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কি? এরা তার খোড়াই পরোয়া করে।' এটুকু বলতে বলতেই সেলুলুম গরমের হুন্ডা মুখে ঢুক সর্দারজীর গলা শুকিয়ে দিল। গম্প জমাবার চোপ বাখা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গের চলেছে। কত চক্কর টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত ঘুগের অশ্ব—গাদানন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দমস্কেবের বিখ্যাত সুদর্শন তরবার, সুপারি কাটার জীতির মত 'জামধর' মোগল ছবিতো দেখেছিলাম, বাস্তবে দেখলুম ছবত সেই রকম—গোলাপী সিল্কের কোমরবন্ধে গৌজ। কারো হাতে কনাজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা বাকবাক বর্শা। উটের পিঠে পশমে বেশমে বোনা কত রঙের কাপেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেজা বালাম আখেরোট কিসমিস আলু-বুঝার চলেছে হিন্দুস্থানের বিরয়ানি—পোলাওয়ের জেলুস বাভাবার জন্য। আরো চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজরের ভাঙে, পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিড আর হাশীশ, না ককনাই, না আরো কিছু।

সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মরমে। মনে পড়ল মানাস সরোবর—ফেটা আমার এক বন্ধু

বলেছিলেন যে, কঠোর শীতে উচু পাহাড়ে যখন মানুষ কাতর হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে প্রশস্ততম পদ্যা অতি ধীর পদক্ষেপে চলা, তড়িৎগতিতে সে যন্ত্রণা এড়াতে চেষ্টা করার অর্থ সন্ধানো যমদুস্তর হস্তে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ সমপণ করা। এও দেখি সেই অভিজ্ঞতার উগ্র সম্বন্ধ। সেখানে প্রচণ্ড শীত, এখানে দুল্লভ গরম। পাঠান দুবার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। 'হস্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা।'

রবীন্দ্রনাথও এই রকম কি একটা কথা বলেছেন না, দুঃখ না পেলে দুঃখ ঘূচবে কি করে? তবে কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তাড়াতাড়ি করে দুঃখ এড়াবার চেষ্টা করা বখা? মোমাদ পূর্ণ হ'ত যে সময় লাগবার কথা তা লাগবেই।

স্ট্রীটও তো বলেছেন—

"Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence [prison] till thou hast paid the uttermost farthing."

কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেছে যেন ধড়াম করে শব্দ হল। কাবুলী তড়িৎগতিতে চোখের ফোটা খুলে আমার দিকে নির্বণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজীর দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শাস্তভাবে গাড়িখানা এক পাশে নিয়ে পাড় কালেন। বললেন, 'টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমেই হওয়াই বিচিত্র।'

হৃদয়লজ্জা করলুম, সৃষ্টি যখন তার রক্ততম রূপ ধারণ করেন তখন তাড়াতাড়ি করতে নেই। কিন্তু এই গ্রীষ্মে রক্ত তাঁর প্রসঙ্গকল্যাণ দক্ষিণ মুখ দেখালেই তো ভক্তের হৃদয় আকৃষ্ট হ'ত বেশী।

প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাবারপাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দুদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছি কি মরেছি। আড়ালে-আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওং পেতে বসে আছে। নামলেই কড়া-পিড়। তারপর সব কিছু হরণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই। শিকারী হরিণ নিয়ে কি করে না-করে সকলবর্ণই জানা কথা—চামড়টুকুও বাদ দেয় না। এ স্থলে শুনলুম, শুধু যে হানিসুকু গুলী খাওয়ার পূর্ব মুখে লেগেছিল সেটুকু হাওয়ায় ভাসতে থাকে—বাদবাকী উবে যায়।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের উপর রাহাজানী না করে তার জন্য খাবারপাসের দুদিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দুটাকা করে বছরে খাজনা দেয় পরে আরেকটি শর্ত অতি কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদী আফ্রিদীতে বগড়া বাখলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন কদুক না মারা হয়।

মোটর মোরামত করতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই। শুনেছি ভয়ঙ্কর জ্বর হলে রোগীর সময়েই আলাক এক্কেবারে চলে যায়। পরের দিন যখন সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম ঢাকা বদলাতে দুফটা লাগল কি করে, তখন সর্দারজী বলেছিলেন, সময় নাকি লেগেছিল মাত্র আধ ফটা।

মোটর আবার চলল। কাবুলীর গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিভ্রবিড় করে যা বলাছিলেন, তার নির্মাস—

'কিছু ভয় নেই সারোব—কালই কাবুল পৌঁছে যাবছি। সেখানে পৌঁছে কব্ব করে কাবুল নদীতে ডুব বেব। বরফখা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নেয়ে উঠে বরফে ঘেঁষে ঘেঁষে আঙুর খাব তামাম জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বরের

শেষাংশেই নয়ানজুলিতে জল জমতে আরম্ভ করবে। অস্ত্রোত্তরে শীতের হাওয়ায় বরা-পাতা কাবুল শহরে হাজারো রঙের গালিচা পেতে দেবে। নভোবন্ধের পুস্তিদের জোশা বের করবে। ভিসেশ্বরের বরফ পড়তে শুরু করবে। সেই বরফের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেরবে। উঃ! সে কী শীত, সে কী আরাম!

আমি বললুম, 'আপনার মুখে ফলচন্দন পড়ুক।'
হঠাৎ দেখি সামনে একি। মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর ধামল। পাসপোর্ট দেখাতে হল। গেট খুলে গেল। আফগানিস্তানে ঢুকলুম। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা—

It is absolutely forbidden
to cross this border into
Afghan territory.

কাবুলী বললেন, 'দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবার-পাস পাস করা। অল্‌হমদুলিল্লা (যুদ্বাক ধন্যবাদ)।'
আমি বললুম, 'আমেন।'

অটি

খাইবারপাস তো দুই-সুঁথে পেরলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমন বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল—তা সে সর্বকীর্তিই হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বলাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির উপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এক দাগের উপর দিয়ে পন্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়নামক হতে পারে তার বানকিতা তুলনা হয় বীরভূম-বীকানুর ডাঙা ও খোয়াইয়ে রায়িকালে গোৱুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে—যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোষক না থাকে, এবং ছোটবড় নুড়ি দিয়ে ডাঙা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

আহমদ আলী যাত্রাকালে আমার মাথায় একটা দশগজী বিরাট পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। খাইবারপাসের মাঝখানে সে পাগড়ি আমাকে সর্দিপর্মি থেকে বাঁচিয়েছিল; এখন সেই পাগড়ি আমার মাথা এবং গাড়ির ছাতের মাঝখানে বাফার-স্টেট হয়ে উভয় পক্ষকে গুরুতর লড়াই-জয়ন থেকে ফেলা হয়।

সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাগড়ি আর কোনো কাজে লাগে কিনা। তিনি বললেন, 'আরো বহু কাজে লাগে কিন্তু উপস্থিত একটা কথা মনে পড়ছে। বিশেষ অবস্থাতে শুধু কলাশীতাই চলে; দড়ি কেনার দরকার হয় না।'

বুললুম, রাস্তার অবস্থা, গ্রীষ্মের আতিশয়া আর দ্বিপ্ৰহরের অনাহার এপথের ফুল-টাইম গাহক সর্দারজীকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলেছে—তা না হলে এ বকম বীভৎস প্রয়োজনের কথা তাঁর মনে পড়বে কেন?

দুখ হল। ঘাট বৎসর বয়স হতে চলল, কোথায় সর্দারজী দেশের গায়ে তেঁতুলের ছায়ায় নার্তি-নান্দীর হাতে হাওয়া খেতে খেতে পল্টনের গল্প বলবেন আর কোথায় আজ এই

একটানা আঙনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে যাবু যারা। কেন এমন অবস্থা কে জানে, কিন্তু দেশ, কাল ও বিশেষ করে পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করে আজ্ঞা জমাবার রৌদ্রাতুর ফীদাখুর উপড়ে ফেলতে নৌকি টানাটানা করতে হল না।

কী দেশ! দুমিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে নুড়ি আর নুড়ি। যেখানে নুড়ি আর নুড়ি সেখানে থেকে চোখে পড়ে বহুদূরে আরছায়া আরছায়া পাহাড়। দূর থেকে বলা শক্ত, অনুমান করলুম লাক বৎসরের রৌদ্রবর্ষণ তাতেও সস্তীম কোনো কিছু না থাকারই কথা। রেডিয়েটরের জল ঢলার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল; তখন লক্ষ্য করলুম এক কণা ঘাসও দুই পাথরের ফাঁকে কোথাও জন্মায়নি। পোকামাকড়, কোনো প্রকারের প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই—যাবে কি, বাঁচবে কি দিয়ে? মা ধরণীর বৃকের দুয় এদেশে যেন সম্পূর্ণ শুন্দিয়ে নিয়েছে; কোনো ফাটল দিয়ে কোনো বাঁদন ছিড়ে এক ছোট্টা জল পর্যন্ত বেরোয়নি। দিকনিগন্তব্যাপী বিশাল শ্মশানভূমির মাঝখান দিয়ে প্রেতযোনি বর্মহারণী কোর্ড গাড়ি চলেছে ছায়াময় সন্তানসন্ততি নিয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, চত্বালপরিপূর্ণ মহানির্জনতার আদ্য প্রহরীরা হঠাৎ কখন যন্ত্রস্তনিত ধূমপুঙ্খ এই স্বতচ্চলশকট শূন্যে তুলে নিয়ে বিরাট নৈস্তম্যের যোগভূমি পুনরায় নিরঙ্কুশ করে দেবে।

তারপর দেখি মৃত্যুর বিস্তীর্ণিকা। প্রকৃতি এই মরুপ্রান্তরে প্রাণ সৃষ্টি করেন না বটে কিন্তু প্রাণ গ্রহণে তিনি বিমুখ নন। রাস্তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে উটের এক বিরাট কঙ্কাল। গৃধ্রীণী শুকনি অনাহারে অবশ্যাব্দী মৃত্যুভয়ে এখানে আসে না বলে কঙ্কাল এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। রৌদ্রের প্রকাপে ধীরে ধীরে মাংস শুকিয়ে গিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়েছে। মসৃণ শুভ্র সম্পূর্ণ কঙ্কাল যেন যাদুঘরে সাজানো বৈজ্ঞানিকের কৌতুহলসমগ্রী হয়ে পড়ে আছে।

নাগিকোটাল থেকে দশ মাইল।

সেই মরুপ্রান্তরে দশা দুনি অত্যন্ত আন্ডার বলে মনে হল। মাটি আর বড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু মেন্দাল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে—ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রঙ। দেয়ালের উপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারি ভিতর দিয়ে বন্দুকের মল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলী করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অক্ষের উপড়ে-নোড়া চোখের শূন্য কোঁটার।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বা দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। হলছল করে কাবুল নদী বাক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে—ডান দিকে এক কালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পলিমাটি জমে গিয়ে যৌকু মেঠো রাসের সৃষ্টি হয়েছে তারি উপরে ভুলা দেশ ফসল ফলিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম; মনে হল ভিজ়ে সবুজ নেকড়া নিয়ে কাবুল নদী আমার চোখের জ্বালা বুচিয়ে দিলেন। মনে হল এ সবুজবৃক্ষের কল্যাণে সে-যাত্রা আমার চোখ দুটি বেঁচে গেল। না হলে দশা দুর্গপ্রাকারের অন্ধ কোঁটার নিয়ে আমাকেও দিশেহারা হয়ে এ দেয়ালেরই মত ঠায় দাড়িয়ে থাকতে হত।

কাবুলী বললেন, 'চলুন, দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারী কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তাহলে সন্ধ্যার আগেই জলালাবাদ পৌছতে পারব।'

দুর্গের অফিসার আমাকে বিদেশী দেখে প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। দশার মত জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরৎবে খেলুম তার জন্য ঠাণ্ডা জল কুজাতে কি করে তৈরী করা সম্ভব হল বুঝতে পারলুম না।

অফিসারটি সতি অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমার কাতর অবস্থা দেখে বললেন, 'আজ রাস্তা

mone-prane-bangali.blogspot.com

এখানেই জিরিয়ে যান। কাল অন্য মোটরে আপনাকে সোজা কাবুল পাঠিয়ে দেব।' আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম যে, আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে।

অফিসরটি শিক্ষিত লোক। একলা পড়েছেন, কথা কবির লোক নেই। আমাকে পেয়ে নিজের জমানে তাঁর চিন্তাধারা যেন উপচে পড়ল। হাফিজ-সালীর অনেক বয়েস আওড়ালেন এবং মরুপ্রান্তরে একা একা আপন মনে সেগুলো থেকে নিঃড়ে নিঃড়ে যে রস বের করেছেন তার খানিকটা আমায় পরিবেশন করলেন। আমি আমার ভাঙা ফারসীতে জিজ্ঞাসা করলুম, সঙ্গীহীন জীবন কি কঠিন বোধ হয় না? বললেন, 'আমার চাকরী পচনো, ইস্তাফা শেবার উপায় নেই। কাকেই বাইরের কাবুল নদীটি নিয়ে পড়ে আছি। রোজ সন্ধ্যায় তার পাড়ে গিয়ে বসি আর ভাবি যেন একমাত্র নিতান্ত আমার জন্য সে এই দুর্গের নোংরা আঁচল বুলিয়ে চলে গিয়েছে। অনায়াস কথাও নয়। আর দু'চারজন যারা নদীর পারে যায়, তাদের মতলব ঠাঙা হওয়ার। আমিও ঠাঙা হই, কিন্তু শীতকালেও কামাই দিইনে। গোড়ার দিকে আমিও স্বার্থপর ছিলাম, কাবুল নদী আমার কাছে সৌন্দর্য উপভোগের বস্তু ছিল। তার গান শুনতুম, তার নাচ দেখতুম, তার লুটিয়ে-পড়া সবুজ আঁচলের এক প্রান্তে আসন পেতে বসতুম। এখন আমাদের অন্য সম্পর্ক। আচ্ছা বলুন তো, অবসার অধিকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আপনি কখনো নদীর পারে কান পেতে শুনেছেন?'

আমি বললুম, 'নৌকোতে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি।' তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। মনে হয় না কুলকুল শুনে, যেন আর দুর্গিন কাটলেই আরেকটু আর সামান্য একটু অভ্যাস হয়ে গেলেই হঠাৎ করণ এই রহস্যময়ী ভাষার অর্থ সরল হয়ে যাবে? আপনি ভাবছেন আমি কিবডি করছি। আদ্যপেই না। আমার মনে হয় মেঘের ডাক যেমন জনশ্রুতিকে বিদ্রুতের ভণ্ড জানিয়ে দেয়, জলের ভাষাও তেমনি কোনো এক আশার বাণী জানাতে চায়। দূর সিঁধাপর থেকে সে বাণী উজিয়ে উজিয়ে এসেছে, না কাবুল পাহাড়ের শিখর থেকে বরফের বুকের ভিতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখানে এসে গান গেয়ে জেগে উঠেছে, জানিনে।

'এখন বন্ধ গরম। শীতকালে যখন আপনার ছুটি হবে তখন এখানে আসবেন। এই নদীর অনেক গোপন বরষা আপনার কাছে বাৎসব দেব। আহরাণিও? কিছু ভাবনা নেই। মুগি, দুগ্ধা যা চাই। শাকসবজী? সে শুড়ে পারব।'

অফিসার যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার এক একবার সন্দেহ হচ্ছিল, একা থেকে থেকে বোধ হয় জঙ্গলকের মাথা, কেমন জামি, একটুখানি... কিন্তু কাবুল নদীর সবুজ আঁচল ছেড়ে তিনি যখন অকস্মে দুপারার পিঠে সোওয়ার হলেন, তখনই বুকলান ভল্লোক স্ফুট আনেন। বললেন, 'আমার কাজ... বুগাট সহঁ কাবা আর কি মাল আসিয়ে-যাচ্ছে তার উপর নজর রাখা। কিছু কঠিন কর্ম নয়, এসেই উঠে পারবেন।' ওদিকে নতুন বাদশা উঠেপড়ে লেগেছেন আফগানিস্তানকে সজীব সবল করে তোলবার জন্য। অনেক লোক তার চারদিকে জড়ো হয়েছেন। শুধুবে পাই কাবুলে নাকি সর্বত্র নতুন প্রাণের সবুজ ঘাস জেগে উঠেছে। কিন্তু এদিকে ইয়েরেজ দুগ্ধা, ওদিকে রুশী বকরী। সুযোগ পেলেই কাঁচা খাস সাফ করে দিয়ে কাবুলের নেড়া পাহাড়কে ফের নেড়া করে দেবে। ভাগিস, চতুর্দিকে খেদার দেওয়া পাহাড়ের বেড়া রয়েছে, তাই রক্ষা। আর রক্ষা এই যে, দুগ্ধা আর বকরীতে কোনোদিন মনের মিল হয় না। দুগ্ধা যদি ঘাসের দিকে নজর দেয় তবে বকরী শিও উচিয়ে লাফ দিয়ে আমুরিয়া যার হতে চায়। বকরী যদি তেড়িমুখে কপে, তবে বকরী মাঝ করে আর বাহাধিক জানিয়ে দেয় যে, বকরীর নজর শুধু কাবুলের চাটখানি ঘাসের উপর নয়—তার আসল নজর হিন্দুস্থান, চীন, ইরান সবকটা বড় বড় সাম্রাজ্যের উপর।

আমি শুধুলাম, 'দুগ্ধাটি শুধু শুধু মা মা করবে কেন? তারো তো একজোড়া খাসা শিঙ আছে।'

'ছিল। হিন্দুস্থান তাহে, এখানে আছে, কিন্তু এদেশের পাথরে খাঁককা গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে ভোতা করে ফেলেছে। তাই বোধ হয় সেটা ঢাকবার জন্য সোদা দিয়ে বান্ধিয়ে নিয়েছে—গোরা সেপাইয়ের খানাপিনার জমক-জৌলুস দেখেছেন তো? হিন্দুস্থান সেই সোনালী শিঙের কলমলাদি দেখে আরো বেশী ভয় পায়। ওদিকে মিশর সাঁদ জগলু পাশ, তুর্কীতে মুসল কামাল পাশা, হিজাজতে ইবনে সউদ, আফগানিস্তানে আমানউল্লা খান পুখার পিঠে কয়েকটা আচ্ছা ভাঙা বুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো জানোয়ারই সহজে ঘায়েল হয় না। জানোয়ার তো!'

আমি আঁৎকে উঠলুম। কী ভয়ঙ্কর ডিসিশন! নাঃ, তা তো নয়। মনেই ছিল না যে খারী আফগানিস্তানে বসে কথা কইছি।

অফিসার বলে যেতে লাগলেন, 'তাই আজ হিন্দুস্থান আফগানিস্তানে মিলেমিশে যে কাজ করতে যাচ্ছে সে যড় খুশীর কথা। কিন্তু আপনাকে বতঃ তকলিফ বরদাস্ত করতে হবে। কাবুল শক্ত জায়গা। শহরের চারিদিকে পাহাড়, মানুষের দিলের ভিতর আরো শক্ত পাহাড়। শাহনশা বাদশা সেই পাহাড়ের ফটলে ঘাস গজাচ্ছেন, আপনাকে পানি ঢালতে ডেকেছেন।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'লজ্জা দেবেন না। আমার কাজ অতি নগণ্য।'

অফিসার বললেন, 'তার হিসেবদিকের আর—একদিন হবে। আজ আমি খুশী যে এতদিন শুধু পেশাওয়ার পাঠাবের লোক আফগানিস্তানে আসত, এখন দূর বাঙলা মুহুকেও আফগানিস্তানের ডাক পৌঁছেছে।'

দেখি সর্দারজী দূর থেকে ইলাঘায় জানাচ্ছেন, সব তৈরী—আমি এলেই মোটর ছাড়ে।

অফিসার সর্দারজীকে দেখে বললেন, 'অমর সিং বুলানীর গাড়িতে যাচ্ছেন বুধি? ওর মত ঈশিয়ার আর কলকন্ডায় ওস্তাদ ভাইভার এ রাজ্য আর কেউ নেই। এমন গাড়িও নেই যার গ্যার অমর সিরয়ের দুটা টোকর, দুটা চারটে কদরের চাঁটি পড়েনি। কোনো বেয়াড়া গাড়ি যদি বেশী কাড়কাড়ী করে তবে শেষ দাওয়াই হতে যোমট পলক কানের কাছে বলা, 'ওবা অমর সিংকে খবর দেওয়া হয়েছে।' আর দেখতে হবে না। সেলফ-স্টার্টার না, হ্যাণ্ডিল না, হঠাৎ গাড়ি পাই পাই করে ছুটতে থাকে। ভাইভার বোনো গতিকে যদি পিছনে দিক বলে পড়তে পারে তাই বরকা।

কিছু হামেশাই দেখবেন লাইনের সবচেয়ে লজ কড় গাড়ি চালাচ্ছে অমর সিং। একটা মজা দেখবেন? বলে তিনি অমর সিংকে ডেকে বললেন, 'সর্দারজী, আমি একখানা নয়া গাড়ি কিনেছি। সিখা আমেরিকা থেকে আসছে। তুমি চালাবে? তুমি এখন যা পাছ তাই পাবে।' অফিসারের নজরে পড়তে সর্দারজী তো হাসিমুখে এসে সালাম করে গাড়িতে ছিলেন। কিন্তু কথা শুনে মুখ গভীর হল। পাগড়ির ন্যাডকা দুহাতে নিয়ে সর্দারজী ভাঁজ করেন আর ভাঁজ খোলেন—নজরও এদিকে ফেরানো। তারপর বললেন, 'তজুরের গাড়ি চালালে বজী ইজ্ঞাও বাই কিন্তু আমার পুরানো চুক্তির মিয়াদ এখানে ফুরায়নি।'

অফিসার বললেন, 'তাই নাকি? বড় আফেসারের কথা। তা সে চুক্তি শেষ হলে আমায় খবর দিয়ে। আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমি খুদে আপাকে (অর্থ্যাৎ আমাকে) পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখছেন তো? নতুন গাড়ি সে চালাতে চায় না। চুক্তি-ফুক্তি সব বাজে কথা। আমার ভাইভারের দরকার শুনে এ লাইনের কোন মোটরের পোশাই চুক্তির ফরদালালী করতে পারে বলুন তো। তা নয়। অমর সিং নতুন গাড়ি চালিয়ে

mone-prane-bangali.blogspot.com

সুখ পায় না। পদে পদে যদি টারার না ফাটল, এগুনি না বিগড়ল, ছাতখানা উড়ে না গেল, তবে সে মোটার চালিয়ে কি কেরামতি? সে গাড়ি তো বোরকা-পরা মেয়েই চালাতে পারে।

‘আমার কি মনে হয় জানেন? বুড়ী মরে গিয়েছে। মোটারের বন্টে খুলতে গেলে সে এখন বউয়ের ঘোমটা খেলার আনন্দ পায়। নূতন গাড়িতে তাম্র অজুহাত কোথায়?’

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ‘বউয়ের ঘোমটা খেলার জন্য আবার অজুহাতের প্রয়োজন হয় নাকি?’

অফিসার বললেন, ‘হয়, হয়। রাজদারিাজের বেলাও হয়। শুনুন কাবুল-বদখশান আধা হিন্দুস্থানের মালিক হামাদুন বাদশা জুব্বীকে কি বলেছেন—

তবু যদি সাধি তোমা’ ভিখারীর মত

সেখা মোরে দিতে করুণায়;

বল তুমি, ‘রাই অবগুঠনের মাঝে

এ-রূপ দেখাতে নারি হয়।’

তুমি আর তুমি মাঝে রাবে ব্যবধান

অবহীন! এ অবগুঠন?

আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার

দূরে মাঝে কোন আবরণ।

একি গো সমরলীলা তোমায় আমায়?

কহা দরজা, মাগি পরিহার;

মরমের মর্ম যাবা তাই তুমি মোর

জীবনের জীবন আমার!

—সত্যেন দত্তের অনুবাদ

নয়

আফগানিস্থানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পীর হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার ঢাকা ফাটল, আর এগুনি সর্দারজীর উপর গোসা করে দুবার গুম হলেন। ঢাকা সারাল হ্যাণ্ডিয়ান—তদারক করলেন সর্দারজী। প্রচুর ফৌজদার জনক স্বহস্ত সর্দারজীকে ওকনো তুলে অনেক কাকুতিমিনতি করে হলে। একবার চটে গিয়ে তিনি হ্যান্ডিল মারার ভয়ও দেখিয়েছিলেন শেখটায় কোন শর্তে রক্ষারফি হল, তার খবর আমার পাইনি বটে, কিন্তু হরেকরকম আওয়াজ থেকে আমেজ পেলুম বিবিজান অনিচ্ছায় শব্দগুণবাড়ি যাচ্ছেন।

জলালাবাদ পৌছবার কয়েক মাইল আগে তাঁর কোমরবন্ধ অথবা নীতিবন্ধ, কিম্বা বেট্টে যাই বলুন, ছিড়ে দুটুকুরে হল। তখন খবর পেলুম সর্দারজীও রাতকনা। রেডিয়োর কর্মচারী আমার কানটাকে মাছিক্রোফোন ভেবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, ‘অদ্যকার মত আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হল। কাল সকালে সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হবে।’

আধ মাইলটাক দূরে আফগান সরাই। বেতারের সায়েরও আমি আস্তে আস্তে সন্দিগে এগিয়ে চললুম। বাদবাকী আর সকলেই হে-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল। বুরলুম,

এদেশেও বাস চড়ার পূর্বে সাদা কালিতে কাবিন-সামায় লিখে দিতে হয়, ‘বিবিজানের বুধীশীর্ষিতে এতথাক স্বহস্তে স্বস্বকণ্ঠে ঠেঁলিয়া লইয়া যাইবে গররাজী হইন না।’

‘সমরলীলা’ তখবী করে বললেন, ‘একটু প্যা চানিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।’

সরাই তো নয়, ভীষণ দুশমনের মত দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। ‘কর্মঅন্তে নিভৃত পাত্মশ্রান্তিতে’ বলতে আমাদের চোখে যে শিশুত্বের ছবি ফুটে ওঠে এর সঙ্গে তার কোন সম্প্রব নেই। ত্রিশ ফুট উঁচু হলদে মাটির নিরোটে চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা—তার ভিতর দিয়ে উট, বাস, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভিতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরতে হবে না।

টুকই ধমকে দাড়ালুম। কত শত শতাব্দীর পুণ্ড্রীভূত দুর্গন্ধ আমাকে ধাক্কা মেরেছিল বলতে পারিনে, কিন্তু মনে হল আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পিছিয়ে পেলুম। ব্যাপারটা কি বুঝতে অবশ্য বেশী সময় লাগল না। এলাকাতা মৌসুমী হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বাঠি হয় না—যেখটে উঁচু নয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা ঝরনা নেই বলে গোয়ামোছার জন্য জলসে বাজে খরচার কথাও ওঠে না। অতএব সিন্ধুদরশাবী বাহিরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যে সব ‘অবনান’ রেখে গিয়েছে, তার স্থলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব; ইচ্ছে করলে চামচ দিয়ে কুয়ে কুয়ে তোলা যায়। চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল, মাত্র একদিকে একখানা দরজা। বাইরের হাওয়া তারি সামনে এসে ধমকে দাঁড়ায়, অন্যদিকে বেরবার পথ নেই দেখে এ জালিয়ানওয়ালাবাঘে আর ঢোকে না। সুচীভেদা অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সুচীভেদা দুর্গন্ধ শুঁকলুম।

দুর্গপ্রাকারকে পিছনের দেয়ালবরাপ ব্যবহার করে চার সারি কুঠরি নয়—খোপ। শুধু দরজার জায়গাটা ফাঁকা। খোপগুলোর তিন দিক বন্ধ—সামনের চত্বরের দিক খোলা। বেতারওয়ালান সরাইয়ের মালিকের সঙ্গে দর-কযাকবি করে আমাদের জন্য একটা খোপ তাকো নিলেন—আমার জন্য একখানা দক্ষিণ চারপাইও যোগার করা হল। খোপের সামনের দিকে একটু বারাদা, চারপাই সেখানে পাতা হল। খোপের ভিতর একবার এক লহমার ওরে ঢুকেছিলুম—মানুষের রক্ত কবুচ্ছি না হয়। ধর্ম সাক্ষী, স্পেনলিং সন্টে যার ভিন্নি কাটে না, তাকে আধ মিনিট সেখানে রাখলে আর দেখতে হবে না।

কেরোসিন কুপির কীপ আলোকে ঘুরিয়া আপন জানোয়ারের তদারক করছে। উট যদি তাড়া খেয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করে, তবে খচ্চরের পাল চিৎকার করে রুটিওয়ালার বারাদায় ওঠে আর কি। মোটার যদি হেলানাই জালিয়ে রাব্বিসের স্থান অনুসন্ধান করে, তবে বাদবাকী জানোয়ার ভয় পেয়ে সব দিকে ছুটেছুটি আরম্ভ করে। মালিকেরা তখন আবার চিৎকার করে আপন আপন পানোয়ারে ঝুজতে বেরায়। বিটুলি নিয়ে টানাটনি, রুটির দোকানে দর-কযাকবি, মোটার মোরামতের হাতুড়ি স্টো, মোরগ-জবাইয়ের ঘড়ঘড়ানি, আর পাশের খোপের বারাদায় খান সায়েরবর নাক-ডাকানি। তার নাসিকা আর আমার নাকের মাঝখানে তফাত হয় ইচ্ছা। শিশুর বদল করার উপায় নেই—পা তাহলে পশ্চিম দিকে নাড়ে ও মুখ উটের নোজের চামর ব্যক্ত পায়। আর উট যদি পিছু হটতে আরম্ভ করে, তবে কি হয় না—হয় বালা কিছু কঠিন নয়। গোমতের মত পবিত্র জিনিসও প্রপাতস্থানের বরস্রা নেই।

তবে একথা ঠিক, দুর্গন্ধ ও নোংরামি সহ্য করে করে কেউ যদি সরাইয়ে জ্ঞান অশেষণ অথবা আভ্যার সন্ধানে একটা চকর লাগায়, তবে তাকে নিরাস হতে হবে না আহমদ আলীর

ফিরিশ্টিমায়ফিক সব জাত সব ভাষা তো আছেই, তার উপরে গুটিকয়েক সাধু সজ্জন, দু-একজন হজ-যাত্রী—পায়ে চলে মক্কা পৌঁছাবার জন্য তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়েছেন। এদের চোখেমুখে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই; কারণ এরা চলেন অতি মনঃমগ্নভাবে এবং নোংরাই থেকে গা বাঁচাবার কায়দাটা এরা ফকিরায়েই রপ্ত করে নিয়েছেন। সম্বল-সামগ্রী এদের কিছুই নেই—উপরে আল্লার মরজি ও নিচে মানুষের দাফিগা এই দুই-ই তাঁদের নির্ভর।

অনৈসর্গিক পাপের আভাস ইখিতও আছে—কিন্তু সেগুলো হিশফেলট সায়েবের জিম্মাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সেই সাভ-সকালে পেশাওয়ারের আঙ-কুটি খেয়ে বেরিয়েছিলুম তারপর পেটে আর কিছু পড়িনি। দকার শরবৎ পেট পর্যন্ত পৌঁছয়নি, শুকনো তালু-গলাই তাকে শুষে নিয়েছিল। কিন্তু চতুর্দিকে নোংরাখিমে এমনি গা ঘিন ঘিন করছিল যে, কোনো কিছু গিলবার প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের আধিখোতায় নিজের উপর বিরক্তিও ধরছিল—‘আরে বাপু, আর পাঁচজন যখন দিবা নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছে—যুসুখে, তখন তুমিই বা এমন কোন নবাব খাজা খার নাতি যে, তোমার শ্মান না হলে চলে না, সব দুঃখার বহুরের জমানো গন্ধে তুমি ভিন্নিমা পাও।’ তবু তো জানোয়ারগুলো চতুর, তুমি বারাদান শুয়ে। যা জান্না মেরী সরাইয়েও জাগা যাননি বলে শেষটার গাধা-খকরের মাঝখানে প্রভু যুশীর জন্ম দেন নি? ছবিতে অবশ্য সায়েবসব্বোরা যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে সব কিছু একেছেন, কিন্তু শাকে ঢাকা পড়ে কটা মাছ?

‘বেংলহেমেব সরাইয়ে আর আফগানিস্তানের সরাইয়ে কি তফাত? বেংলহেমেবও বৃষ্টি হয় তিন ফোঁটা আর বরফ পড়ে আড়াই তোলা। কে বললে তোমায় ইহুদি আফগানের চেয়ে পরিষ্কার? আফগানিস্তানের গন্ধে তোমার গা বিড়োছে, কিন্তু ইহুদির গায়ের গন্ধে বোকা পাঁঠা পর্যন্ত লাফ দিয়ে দরদা ফুটো করে প্রাণ বাঁচায়।’

এই সব হল তত্ত্বজ্ঞানের কথা। কিন্তু মানুষের মনের ভিতর যে রকম গীতাপাত হয়, সে রকম বয়োভাড়া দুর্ধ্বংসও সেখানে বসে। তার শুধু এক উত্তর, ‘জানামি ধর্ম, ন চ মে প্রব্র্টি’, অর্থাৎ ‘তবু কথা আর নূতন শোনাছ, কিন্তু ওসবে আমার প্রব্র্টি নেই।’ তার উপর আমার বয়োভাড়া মনো হাতে আরেকখানা খাসা উত্তরও ছিল। ‘সদারীণী ও বনোবাসিনীতে যদি মাঝে একে চলাচল আরম্ভ না হত তবে অনেক আগেই জলালাবাদের সরকারী ডাকবাংলোয় পৌঁছে সেখানে তোমাকে আমাতে স্মানাহার করে একতফে নরগিস ফুলের বিছানায়, নিনার গাছের দোপুল হাওয়ায় মনের হরিষে নিভা যেতুম না?’

বয়োভাড়া মনে কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞানেরও সন্ধান রয়েছে—না হলে বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে এক ঘরে সারাজীবন কাটাতে কি করে? ফিস ফিস করে তর্কও জুড়ে দিয়ে বলল, ‘আ মেরী ও গীতর যে গম্প বললে সে হল বাইবেলী ক্রেষ্ট। মুসলমান শান্তে আছে, বিবি ময়রম (মেরী) খেজুরগাছের তলায় ইনা-মসীহকে পবন করিয়াছিলেন।’

বিবেকবুদ্ধি—‘সে কি কথা! ডিসেম্বরের গীতে মা মেরী গেলেন গাছতলায়?’

বয়োভাড়া মন—‘কেন বাপু, তোমার বাইবেলেই তো রয়েছে, প্রভু জন্মগ্রহণ করলে পর বেসদুতরো সেই সুসমচারের মতোই মাঝখানে গেলে রাখাল ছেলেনের জানালেন। গয়লার ছেলে যদি শীতের রাত মনে কাটাতে পার, তবে ছুতোয়ারের বউই পারবে না কেন, শুনি? তার উপর গর্ভস্বস্তগা—সর্বাঙ্গে তখন গল গল করে গা ছোটে।’

ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি আমি আপপেই পছন্দ করিনি। দুজনকে দুই ধমক দিয়ে চোখ বন্ধ করলুম।

চতুরের ঠিক মাথানো চার্লস-পঞ্চাশ হাত উঁচু একটি প্রহরী শিখর। সেখান থেকে হঠাৎ এক তজ্জারধনি নির্গত হয়ে আমার তল্লাভগ্ন করল। শিখরের চূড়া থেকে সরাইওয়াল চোঁচিয়ে বলছিল, ‘সরাই যদি রাতিকালে দস্যুদস্যু আক্রান্ত হয়, তবে হে যাত্রীদল, আপন আপন মাল-জান বাঁচাবার জিম্মাদার তোমাদের নিজের।’

এটুকুই বাকী ছিল। সরাইয়ের সব কষ্ট চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিয়েছিলুম এ জানতুক বাঁচাবার আশায়। সরাইওয়াল সেই জিম্মাদারিটুকুও আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ায় যখন আর কোনো ভরসা কোনো দিকে রইল না, তখন আমার মনে এক অদ্ভুত শান্তি আর সাহস দেখা দিল। উদ্ভূত বলে, ‘নাম্পেসে খুদাভী ভরতে হ্যাং’ অর্থাৎ ‘উলঙ্গকে ভগবান পর্যন্ত সম্মুখে চলে।’ সেজা বাঙালয় প্রবাসী সামান্য অনারুণ নিয়ে অম্প একটু গীতিরসে ভেজা হয়ে বেরিয়েছে, ‘সমুদ্রে শয়ন যার শিরিণে কি ভয় তার?’

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার মনে তখন আরও একটা ঘটকা লাগল। রেডিয়েওয়ালার চোন্ত ফাসী জানার কথা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘ঐ যে সরাইওয়াল বলল, ‘মালা-জানের’ তদারকি আপন আপন কাঁধে এ কথাটা আমার কানে কেমনতরো নূতন ঠেকালে। সমাসটা কি ‘জান-মাল নয়?’

অন্ধকারে রেডিয়েওয়ালার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই তাঁর কথা অনেকটা বেতারবার্তার মত কানে এসে পৌঁছল। বললেন, ‘ইরানদেশের ফাসীতে বলে, ‘জান-মাল’ কিন্তু আফগানিস্তানে জান সত্য, মালের দাম ঢেবে বেশী। তাই বলে ‘মাল-জান।’

আমি বললুম, ‘তা বোধ করি হবে। ভারতবর্ষেও প্রাণ বেজায় সস্তা—তাই আমরাও বলি ‘ধনে-প্রাণে’ মেরো না। ‘প্রাণে-ধনে’ মেরো না কথাটা কখনো শুনিনি।’

আমাকে বেতারওয়ালতে তখন এতটা ছোটখাটো ‘ব্রেন্-স্ট্রান্’ বানিয়ে বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ফকিয়ারের ওপারে তো শুনেছি জীবন পদে পদে বিশেষ বিপদ হয় না। তবে আপনামুখে এরকম কথা কেন?’

আমি বললুম, ‘মূলটে ছাড়া অন্য নানা কায়দায়ও তো মানুষ মরতে পারে।’

জ্বর আছে, কফো আছে, সান্নিপাতিক আছে, আর না খেয়ে মরার রাজকীয় পন্থা তো বারোমাসই খাবার রয়েছে। সে পথ ধরলে দু-দু জিরোবার তরে সরাই-ই বলুন আর হাসপাতালই বলুন কোনো কিছুইই বলাই নেই।’

বেতারবার্তা হল, ‘না খেয়ে মরতে পারাটা তামাম প্রচ্যাভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। একে অজরামর বর্গে রাখার নিষেধাজ্ঞা প্রচেষ্টার নামান্তর ‘হোয়াইট মেনস বার্ডেন’। কিন্তু আফগানার প্রচ্যাভূমির ছোটজাত বলে নিজের মোট নিজেই হবিবার ফোঁটা করে। সাধারণত এই মোট নিয়ে প্রথম কাড়াকাড়ি লাগায় ‘ধর্মপ্রাণ’ মিশনারীরা, তাই আফগানিস্তানে তাদের ঢোকা কড়া বাধণ। কোনো অবস্থাতেই কোনো মিশনারীকে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না। মিশনারীর পরে আসে ইংরেজ। তাদেরও আমার পারতপক্ষে ঢুকতে দিই না—ব্রিটিশ রাজদুতবাসের জন্য যে ক’জন ইংরেজের নিভাত্ত প্রয়োজন তাদের আমার বড় অনিচ্ছায় বরদাস্ত করছি।’

এই দুটি খবর আমার কর্ণকুহরে মধি ও মার্ক লিখিত দুই সুসমচারের ন্যায় মধুশিঙ্গুর করল। গুলিভান, বোতানের খুবশাই হয়ে সকল দুর্দুর্ভ মেয়ে ফেলে আমার চোখে গোলাপী ঘুমের মোলায়েম তত্তা এনে দিল।

‘জিম্মাদার আফগানিস্তান।’ না হয় থাকলই বা লক্ষ লক্ষ ছারপোকা সে দেশের চারপাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্দা হয়ে।

তোরাবেলা ধুম ভাঙল আজান শুনে। নামাজ পড়লেন বুথারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবী উচ্চারণ শুনে বিশ্বয় মানলুম যে তুর্কীস্থানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রইল কি করে। যে তারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতো তিনি বললেন, 'আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।' আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে করেন?' আমার এই সংকেতে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুথাত পারলুম, খাস প্রাচ্যদেশে অনেকে অজ্ঞান লোককে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সম্পর্কে কৌতূহল দেখানো হয় সে তাকে বরফ খুঁধী হয়।

ঘোঁরে বসে আরি সেই তুল নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমাখরচা নিতে লাগলুম।

গ্রেট ইস্টার্ন পাহাশালা, আফগান সরাইও পাহাশালা। সরাইয়ের আরাম-ব্যারাম তো দেখা হল-গ্রেট ইস্টার্ন, গ্রাওয়ের খবর কিছু কিছু জানা আছে।

মার্কস না পড়েও চোখে পড়ে যে সরাই গরীব, হোটেল ধনী। কিন্তু প্রশ্ন তাই দিয়ে কি সব পার্থক্যের অর্থ করা যায়? সরাইয়েও জন আটক এমন সদাগর ছিলেন যারা অন্যায়সে গ্রেট ইস্টার্নের সুইচ নিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছিল। গ্রেট ইস্টার্নের বড়সায়েরদের কিছু কিছু চিনি।

কিন্তু আচার্যবাবুহরে কী ভয়ঙ্কর তফাত। এই আটজন ধনী সদাগর হচ্ছে করলেনই একত্র হয়ে উক্ত মথানাপিনা করে জুয়েয়ারি মুদ্রা চার শ' টাকাও গুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে রাত কাটতে পারতেন। চাকরবাকর সন্তুষ্ট হয়ে হজ্জুদের হুকুম তামিল করত—সরাইয়ের ভিথির ফকিরদের তো ঠেকিয়ে রাখতই, সাধুসম্পন্নদের সঙ্গেও এঁদের কোনো যোগাযোগ হত না।

পৃথক হয়ে আপন আপন দ্বিরদরস্তে এঁরা তো বসে থাকলেনই না—আটজনে মিলে 'খানদানী' গোষ্ঠেও এঁরা থাকলেন না। নিজ নিজ পণ্যবাহিনীর ধনী গরীব আর পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের দরহম-মহরম আগের থেকে তো ছিলই, তার উপরে সরাইয়ে আসন পেতে জিরিয়েজুরিয়ে নেওয়ার পর তাঁরা আরো পাঁচজনের তত্তাবধা করতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে হরেকরকমের আড্ডা জমে উঠল, ধনী গরীবের পার্থক্য জামা কাপড়ে টিকে থাকল বটে কিন্তু কথাবার্তায় সে সব তফাত রইল না। দূরভাটে মোসাহবে 'ইয়েলমেন' ছিল সন্দেহ নেই, তা সে গরীব আড্ডা-সদারদেরও থাকে। বাস্তবসিদ্ধি, তত্ত্বকথা, দেশ-বিদেশের রাস্তাঘাট-পিরিসবকট, ইংরেজ-কুশের মন-কথাকথি, পাগলা উট কামড়ালে তার দাঁড়ায়, সারগঞ্জীর মাধুর্য হিট, সব জিনিষ নিয়েই আলোচনা হল। গরীব ধনী সকলেরই সকল রকম সমস্যা আড্ডায় দিয়ে মজ্ঞে কখনো ভুল কখনো ভাসল; কিন্তু বাকচতুর গরীবও ধনীর পেলোও-কালিয়ার অশ্রয় বেশরম বীরদর্পচা নাচল না।

ঝগড়া-কাজিয়াও আড্ডার চোখের সামনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে। কথাবার্তার খোঁচাখুঁচিতে যতক্ষণ উত্তাপক সন্তুষ্ট ততক্ষণ আড্ডা সে সব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, কিন্তু মারামিরের পূর্বাভাস দেখা দিলেই কেউ না—কেউ মহাশয় হয়ে বখেড়া ফেসলা করে দেয়। মনে পড়ল বায়স্কেপারের ছবিও সেখানে দুই সায়েরে বগড়া লাগে, আর পাঁচজন হিট গিয়ে জায়গা করে দিয়ে গোলে হয়ে দাঁড়ায়। দুই সায়েরে তখন কেট বুলে ছুঁড়ে ফেলেন, আর সঙ্কলের দয়ার শরীর, কেটিটাকে ধুলোয় গড়াতে দেন না, লুফে নেন। তারপর গুরু হয় ঘুঘুঘুমি রক্তরক্তিক। পাঁচজন বিনা টিকিটে তামাশা দেখে আর সমস্ত বর্বরতাটিকে অন্য লোকের নিতান্ত ঘরোয়া

ব্যাপার' নাম দিয়ে ফীণ বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায়।

সরাইয়ে কারো কোনো নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নেই। তাই পার্সোনাল ইভিসিংক্রেসি বা খোয়াল খুশী হিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না। অথবা বলতে পারেন, সকলেই যে যার খুশী মত কাজ করে যাচ্ছে, আপনি আপত্তি জানাতে পারবেন না, আর আপনিও আপনার পছন্দ মত যা খুশী করে যাবেন, কেউ বাধা দেবে না। হাতাহাতি না হলেই হল।

তাতে করে ভালো মন্দ দুই-ই হয়। একদিকে যেমন গরম, ধুলো, তৃষ্ণা স্নেহও মানুষ একে অন্যকে প্রচুর বরদাত কর্তাব্য করে, অন্যদিকে যেমন সকলেই সরাইয়ের কুঠির-চত্বর নিম্নমতাবে নোয়া করে।

একদিকে নিষিদ্ধ সামাজিক জীবনযাত্রা অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিকাশ। অর্থাৎ 'কমুনিটি সেন্স' আছে কিন্তু 'দিবিক সেন্স' নেই।

ভাষতে ভাষতে দেখি সরাইয়ে এক রাত্রি বাস করেই আমি আফগান তুর্কোমান সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছি। ঊর্শিয়ার হয়ে ভিতরের দিকে তাকানো বন্ধ করলুম। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখব আর কি? সেই আগের দিনকার জনপদ বা জনশূন্য শিলাপর্বত।

সারগঞ্জীকে বললুম, 'রাতিরে যখন গা বিড়োছিল তখন একটু, সুপুরি পেলে বড় উপকার হত। কিন্তু সরাইয়ে পানের দোকান তো দেখলুম না।'

সারগঞ্জী বললেন, 'পান কোথায় পানের বাবুসায়ের? পেশাওয়ায়েই শেষ পানের দোকান। তার পশ্চিমে আফগানিস্তান ইরান ইরাকের কোথাও পান দেবিনি—পস্টনে ড্রাইভারি করার সময় এসব দেশ আমার ঘেরা হয়ে গিয়েছে। পাইনও তো পান খায় না। পেশাওয়ারের পানের দোকানের গাছ সব পাঞ্জরী।'

তাই তো। মনে পড়ল, কনুটোলা জাকারিয়া স্ট্রীটে হোটেলের গাড়ি বারাদার বেঞ্চে বসে কাবুলীরা শরর রাড্ডা করে না বটে। আরো মনে পড়ল, দক্ষিণ-ভারতে বর্মা মালয়ে এমন কি থায়াসি পাহাড়েও প্রচুর পান খাওয়া হয়—যদিও এদেশে কেউই কাশী-লক্ষ্মীয়ে মত তরিব্ব করে জিনিসদার রস উপভোগ করতে ছােন না। তবে কি পান অন্য জিনিস? 'পান' সম্পর্ক তাই আর্য-কর্ণ থেকে 'কান', 'পর্ণ' থেকে 'পান'। তবে 'সুপারি'ও উভ, কথটা তো সঙ্কটাত নয়। লক্ষ্মীয়ে বসে 'ডলি' অথবা 'ছালিয়া'—সেগুলোও তো সম্পর্কত থেকে আসেনি। কিন্তু পূর্ববেঙ্গে 'গুয়া' কথটার 'গুয়াক' না 'গুয়াক' কি একটা সম্পর্কত রূপ আছে না? কিন্তু তাহলেও তো কোনো কিছুই সমাধান হয় না, কারণ পাঞ্জাব দোয়াব এসব উন্নীতিসক আর্থভূমি ত্যাগ করে খাঁটি গুয়াক হঠাৎ পূর্ববেঙ্গে গিয়ে গাছের ডোয়ায় আশ্রয় নেন কেন?

আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের সব মাজলিকই সুপারির প্রয়োজন হয়, কিন্তু গুয়াসুয়ের ফিরিঙিতে গুয়াক-গুয়াক। নাঃ। মনে তো পড়ে না। তবে কি এ নিতান্তই অনর্থজনসুলভ সামগ্রী? পূর্বপ্রাচ্য থেকে উজিয়ে উজিয়ে পেশাওয়ার অবধি পৌঁছেছে? সারে বলি, ভারতবর্ষ তাৎ প্রাচ্য সভ্যতার মিলনভূমি।

ডিম্বোপেসি ডিম্বোপেসি জিগির তুলে বহু বেশী চোঁমাটেই করাতো দক্ষিণভারতের এক সাধক বলেছিলেন 'তাহলে সবই ঘুমিয়ে পড়। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ ভেদ থাকে না, সবাই সমান।' সেই পরমেন বসে বসে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়গম্য করলুম। ঝাঁকুনি, ধুলো, কঠিন আসন, ছুড়াযুগ্মা স্নেহও যেতার-কর্তা ও আমার দুজনেরই ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর মাথা আমার কাঁধে চাপে পড়ছিল, আমি তখন শক্ত হয়ে বসে তাঁর ঘূমে তা দিচ্ছিলুম। তারপর হঠাৎ একটা জোর ঝাঁকুনি খেয়ে গুথমড়িয়ে জেগে উঠে তিনি আমার কাঁধে মাফ চেয়ে শক্ত

হয়ে বসছিলেন। তখন আমার পালা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভ্রমর তার বেড়া ভেঙে আমার মাথা তার কাছে ভিরিয়ে নিচ্ছিল।

চোখ বন্ধ অবস্থায়ই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলাম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা—রাস্তার দুদিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'জলালাবাদ'।

দক্ষার পাশের সেই কাবুল নদীর কপায় এই জলালাবাদ শস্যশ্যামল। এখানে ভ্রমি বোধ হয় দক্ষার মত পাথরে ভর্তি নয় বলে উপত্যকা রীতিমত চওড়া—একটু নিচু জমিতে বাস নামার পর আর তার প্রসারের আদ্যাক করা যায় না। তখন দুদিকেই সবুজ, আর লোকজনের ঘরবাড়ি। সামান্য একটি নদী ক্ষুদ্রতম সুযোগ পেলে যে কি মোহনে সবুজের লীলাখেলো দেখাতে পারে জলালাবাদের তার অতি মধুর তবসির। এমনকি যে দূরো পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমাতের পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হল। লক্ষ্য করলুম, যে পাঠান শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের 'বেপদামির' নিন্দা করে তারি বউ-কিৎ ফোতে কাজ করছে অন্য দেশের মেয়েদেরই মতো। মুখ তুলে বাসের দিকে তাকাতেও তাদের আপত্তি নেই। বেতারকতাবেই জিজ্ঞাসা করলে তিনি গভীরভাবে বললেন, 'আমার যতদূর জানা, কোনো দেশের গরীব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্ততঃ আপন গাঁয়ে মানে না। শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের আকর্ষণে কখনো পর্দা মেনে 'ভরলোক' হবার চেষ্টা করে, কখনো কাজ-কর্মের অনুশীলন হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আরবের বেদুইন মেয়ে?'
তিনি বললেন, 'আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছালাল চরাতে দেখেছি।'
ধাক উপস্থিত এ সব আলোচনা। গোটা দেশটা প্রথম দেখে নিই, তারপর রীতিরেওয়াজ ভালো-মন্দের বিচার করা যাবে।

গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জলালাবাদ শহরে ঢুকল। কাবুলীরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক দিগিরের ভিতর অস্ত্রধার। কেউ একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, বাস ফের ছাড়বে কখন। আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজীকে শুধালুম, 'বাস' আবার ছাড়বে কখন?' সর্দারজী বললেন, 'আমার যখন সবাই জড়ো হবে।' জিজ্ঞেস করলুম, 'সে কবে?' সর্দারজী যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি তার কি জানি? সবাই খোঁয়েদেয়ে আসবে যখন, তখন।'

বেতারকতা বললেন, 'ঠায় গেলিয়ে করছেন কি? আসুন আমার সঙ্গে।'
আমি শুধালুম, 'আর সব দেখেই বা ফিরবেই বা কখন?'

তিনি বললেন, 'ওদের জন্য আপনি এত উত্তিগ্ন হচ্ছেন কেন? আপনি তো ওদের মাল-জানের জি'মদার নন।'

আমি বললুম, 'তাতে নই-ই। কিন্তু যে রকমভাবে ছুঁ করে সবাই নিরুদ্দেশ হল তাতে তো মনে হল না যে ওরা শিগগির ফিরবে আর সন্ধ্যায় তাহলে কাবুল পৌঁছবে কি করে?'

বেতারকতা বললেন, 'সে আশা শিকয়ে তুলে রাখুন। এদের তো কাবুল পৌঁছবার কোনো তাড়া নেই। বাস যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পৌঁছতে পনেরো দিনে, এখন চারদিন লাগলেও তাদের আপত্তি নেই। ওরা খুশী, ওদের হেঁটে যেতে হচ্ছে না, মালপত্র তদারক করে গাথা-খচরোর পিঠে চাপাতে-মাঝাতে হচ্ছে না, তাদের জন্য বিচুলির সন্ধান করতে হচ্ছে না। জলালাবাদ পৌঁছেছে, এখানে সড়কলই কাঁকা মাঝা-শালা, কেউ না কেউ আছে, তাদের তত্ত্বাবধায় করবে, ঘাবে-দাবে, তারপর ফিরে আসবে।'

আমি চুপ করে গেলুম। দক্ষাত অফিসারকে বলেছিলাম, 'আর পাঁচজনের গাতি

আমারও তাই হবে', এখন বুঝতে পারলুম সব মানুষই কিছু-না-কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। তখনও শুধু এটুকু কেউ করে জেনে, কেউ না জেনে।

আফগানিস্তানের বড় শহর পাঁচটি। কাবুল, হিরাত, গভনী, জলালাবাদ, কান্দাহার। জলালাবাদ আফগানিস্তানের শীতকালের রাজধানী। তাই এখানে রাজপ্রাসাদ আছে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য খাস পাহনিবাস আছে।

বেতারবাণী যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উপস্থিত জলালাবাদের বাজার দেখে আফগানিস্তানের অন্যতম প্রধান নগর সম্পক্ষে উদ্বেষিত হওয়ার কোনো কারণ বৃজে পেলাম না। সেই নোরা মাটির মেয়াল, অত্যন্ত গরীব মোকানপাট—সস্তা জাপানী মালে ভর্তি—বিতর চায়ের দোকান, আর অসংখ্য মাছি। হিমালয়ের চটিতে মানুষ যে রকম মাছি সম্পক্ষে নিষিকার চায়েও ঠিক তাই।

হঠাৎ আঁখ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। চৌকো চৌকো করে কেটে দোকানের সামনে সাজিয়ে রেখেছে এবং তার উপরে দুনিয়ার সব মাছি বসতে চেহারাটা চালে-তিলের মত হয়ে গিয়েছে। যিনিপিত ঝেড়ে ফেলে কিলনুম এবং খেয়ে দেখলুম, দেশের আখের চেয়েও মিষ্টি। সাথে কি বাবুর বাদশা এই আঁখ খেয়ে খুশী হয়ে তার নুন্নান বদখশানবুখারায় পাঠিয়েছিলেন। তারপর দেখি, নোনা ফুটি শসা তরমুজ। ঘন সবুজ আর সোনালী হলদেতে ফলের দোকানে রঙের অপর খোলতাই হয়েছে—খুবশাই চতুর্দিক মাত করে রেখেছে। দরদস্তুর না করে কিলেও ঠকবারও ভয় নেই। রপ্তানি করার সুবিধে নেই বলে সব ফলও বেজায় সস্তা। বেতারবার্তা জান বিতরণ করে বললেন, 'যারা সত্যিকার ফলের রসিক তারা এখানে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা ফল খেয়েই কাটায় আর যারা পাঁড় মেওয়া-খোর তারা শীতকালেও কিসমিস আখরাতে শ্বেতা বাদামের উপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝে রুটি পনির আর কুচিৎ কখনো এক টুকরো মাংস। এরাই সব চাইতে দীর্ঘজীবী হয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এদের গায়ে বুলেট লাগে না বুঝি? জলালাবাদের ফল তাহলে মস্তপুত বসতে হয়।'

বেতারবার্তা বললেন, 'জলালাবাদের লোক গুলী খেতে যাবে কেন? তারা শহরে থাকে, আইনকানুন মানে, হানাহানির কিবা জানে?'

কিন্তু জলালাবাদের যথার্থ মহাশূঁ শহরের বাইরে। আপনি যদি ভূবিদ্যার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চান তবে কিঞ্চিৎ খোঁড়াখুঁড়ি করলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আপনি যদি নৃত্যের অনুসন্ধান করতে চান তবে চারিদিকের নানাপ্রকারের অনুন্নত উপজাতি আপনাকে দেবার যোগাড় করে দেবে। যদি মার্কসবাদের প্রাচ্যদেশীয় পটভূমি তৈরী করতে চান তবে মাত্র এঙ্গেলসের 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি' খানা সঙ্গল নিয়ে আসুন, বানাবাকী সব এখানে পাবেন—জলালাবাদের গ্রামাঞ্চলে পরিবারপত্তনের ভিত, আর এক শ' মাইল দূরে কাবুলে রাষ্ট্রনির্মণের গম্ভূজ-শিখর বিরাজমান। যদি ঐতিহাসিক হন তবে গান্ধারী, সিকন্দর, বাবুর, নাদিরের বিজয় অভিযান বর্ণনার কতটা খাটি কতটা ফুটা নিজের হাতে যাচাই করে নিতে পারবেন। যদি ভূবিদ্যা অর্থনীতির সময়ে প্রমাণ করতে চান যে, তিন ফোঁটা নদীর জল কি করে নব নব মনুষ্যের কার্যের সময়ে তারে জলালাবাদ থেকে পাঠে তাহলে জলালাবাদে আস্তানাগেড়ে কাবুল নদীর উলান ভাঁটা করুন। আর যদি গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন তবে তার রপ্তানি তো জলালাবাদের কয়েক মাইল দূরে হাদা গ্রামে। ধানী বৃদ্ধ, কঙ্কালসার বৃদ্ধ, অমিত্যত বৃদ্ধ যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান সব উপস্থিত। মাটির উপরে কিঞ্চিৎ, ভিতরে প্রচুর। টিটপাতা দেখানো অজলালে বসতে পারে।

আর যদি আপনি পাণ্ডিত্যের বাজারে সত্যিকার দাঁও মারতে চান তবে দেখুন, সিদ্ধুর পারে মোন-জো-দেড়া বেরল, ইউফ্রাটিস টাইগরিসের পারে আসিরীয় বেবিলনীয় সভ্যতা বেরল, নীলের পারে মিশরীয় সভ্যতা বেরল—এর সব ক'টাই পৃথিবীর প্রাক-আর্য প্রাচীন সভ্যতা। শুনতে পাই, নর্মদার পারে ঐরকম একটা দাঁও মারার জন্য একপাল পণ্ডিত মাথায় গামছা বেঁধে শাবল নিয়ে লেগে গিয়েছেন সেখানে গিয়ে বাজার কোণঠাসা করতে পারবেন না, উষ্ট্রে দেউলে হবার সম্ভাবাই বেশী। আর যদি নীলতটই বরাতজোরে কিছু একটা পেয়ে যান তবে হবেন না হয় রাখাল বাড়িজো। একপাল মার্শাল উড্ডোউড়ি করছে, হোঁ মেরে আপনারি কাচামাল বিলতে নিয়ে গিয়ে তিন ভল্লুম চামড়ায় বেঁধে আপনারি মাথায় ছুড়ু মারবে। শোনেদনি, গুণী বলেছেন, 'একবার ঠকলে ঠেকের নেয়, দুবার ঠকলে তোমার মেয়।' তাই বলি, জলালাবাদ যান, মোন-দেড়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপকার করুন, তাতে ভারতের গর্ব বারো আনা, আফগানিস্তানের চার আনা। বিশেষতঃ যখন আফগানিস্তানে কাক ছিল নেই—আপনার মেহমতের মাল নিয়ে তারা চুরিচামারি করবে না।

জানি, পণ্ডিত মাহই সন্দেহ-পিশাচ। আপনিও বলবেন, 'না হয় মানলুম, জলালাবাদের জমির শুধু উপরেই নয়, নিচেও বিস্তর সোনার ফসল ফলে আছে, কিন্তু প্রশ্ন, চতুর্দিক থেকে আর্দ্রিনি ধরে থাকে থাকে বুলবুলির পাল সেখানে যাকোনা লাগায়নি কেন?'

তার কারণ তো বেতারবাণী বহু পূর্বে বলে দিয়েছেন। ইংরেজ এবং অন্য হরেকরকম সাদা বুলবুলিকে অফগান পছন্দ করে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাণ্ডিত্যাস্তরে উপস্থিত যে কয়টি পক্ষী উড়িয়ায়মান তারে সর্বাকো শ্বেতকুণ্ড, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আপনার রঙ দিবা বাদামী, আপনি প্রতিবেশী, অফগান আপনাকে বহু শতাব্দী ধরে চেনে—আপনি না হয় তাকে ভুলে গিয়েছেন, আপনার জাতভাই বহু ভারতীয় এখনো আফগানিস্তানে ছোটোখাটো নানা কদমায় ঘোরামুরি এমন কি বসবাসও করে, আপনাকে আনাচে কানাচে মুরতে দেখালে কানলীওয়াল আর যা করে করুক, অঁতকে উঠে কোঁচকা ঝুজবে না।

তবু শুনাবেন না? সাথে বলি, সব কিছু পণ্ড না হলে পণ্ডিত হয় না।

এগার

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌঁছাবার আর কোনো ভরসাই রইল না।

পেশাওয়ার থেকে জলালাবাদ এক শ' মাইল, জলালাবাদ থেকে কাবুল আরো এক শ' মাইল। শাস্ত্রে লেখে সকালে পেশাওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জলালাবাদ পৌঁছাবে। পর্দিনি ভোরবেলা জলালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই যেকো উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অস্পষ্ট লোকেরই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না।

জলালাবাদের আশেপাশের গায়েই ছেলেরা রাস্তায় খেলাডুলো করছে। তারি এক খেলা মোটরের জন্য রাস্তায় গোলকধাঁস বানিয়ে দেওয়া। কয়দানী নুতন। কাবুলীরা যে আগুর মত শক্ত টুপি'র চতুর্দিকে পাগড়ি জড়ায় ছোঁড়ার সেই টুপি এমনভাবে রাস্তায় সাজিয়ে রাখে যে, ইশিয়ার হয়ে গাড়ি না চালালে দুটো-চারটে খেঁতল দেবার সম্ভাবনা। দূর থেকে সেগুলো দেখতে গেলেই সর্দারজী দাড়িগোঁফের ভিতরে লিড়িভিড়ি করে কি একটা গালাগালি দিয়ে মোটরের বোকা কমান। কয়েকবার এ রকম লন্ডা করার পর বললুম, 'দিন না দুটো চারটে খেঁতলে। ছোঁড়াদের তাহলে অক্কেল হয়।' সর্দারজী বললেন, 'খুদা পানাহ। এমন কর্ম করতে

নেই। আর টায়ার ফাঁসাতে চাইনে।' আমি বুঝতে না পেরে বললুম, 'সে কি কথা, এই টুপিগুলো আপনার টায়ার ছাদা করে দেবে?' তিনি বললেন, 'আপনি খেলটোর আসল মর্মই ধরতে পারেননি। টুপি'র ভিতরে রয়েছে মাটিতে শক্ত করে পোতা লম্বা লোহা। যদি টুপি বাঁচিয়ে চলি তবে গাড়ি বাঁচানো হল, যদি টুপি খেঁতলাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়ুল মারা হল।

আমি বললুম, 'অর্থাৎ ছোকরারা মোটরওয়ালাদের শেখাতে চায়, পরের অপকার করিলে নিজের অপকার হয়।'

সর্দারজী বললেন, 'ওহ, আপনার কি পরিষ্কার মাথা।' বেতারবাণী বললেন, 'কিন্তু প্রশ্ন, এই মহান শিক্ষা এল কোথা হতে?'

আমি নিবেদন করলুম, 'আপনিহি বলুন।'

তিনি বললেন, 'ছোঁড়াদের খেলাতে রয়েছে, বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শের ভঙ্গাবশেষ। জানেন, এককালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রসারপ্রতিপত্তি ছিল।'

আমি বললুম, 'তাই তো শুনেছি।'

তিনি বললেন, 'শুনেছি মানে? একটুখানি ভাইনে হটলেই পৌঁছবেন হাক্দার। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন কত বৌদ্ধমূর্তি বোরিয়েছে মাটির তলা থেকে। আপনি কি ভাবছেন, সে আমলের লোক নানা রকম মূর্তি জড়ো করে যাদুঘর বানাত?'

এ বেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন, 'কনিষ্কের আমলে গান্ধারবাসীরা যাদুঘর নির্মাণ করিত কিনা?'

ফেল মারলুম। কিন্তু বাঙালী আর কিছু পারুক না পারুক, বাজে তর্কে খুব মজবুত। বললুম, 'কিন্তু কাল রাত্রে সরাইয়ে নিজের 'জান-মাল, -খুড়ি, 'মাল-জান' সম্পর্কে যে সতর্কতার হুক্কার শুনতে পেলুম তা থেকে তো মনে হল না প্রভু তথাগতের সাম্যমন্ত্রীর বাণী শুনছি।'

বেতারবার্তা বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে অহিংস শিশু-শাবক ও স্ত্রীলোকের ধর্ম। পূর্ণবয়স্ক, প্রাণবন্ত দুর্ধর্ষ পুরুষের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

সর্দারজী খানিকক্ষণ গভীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি তো গ্রন্থসাহেব মানি কিন্তু একথা বার বার স্বীকার করব যে, এই আধা-ইনসান পাঠান জাতকে কেউ যদি ধর্মের পথে নিয়ে যেতে পারে তবে সে ইসলাম।'

আমি তো ভয় পেয়ে গেলুম। এইবার লাগে বৃষ্টি। 'আধা-ইনসান' অর্থাৎ 'অর্ধ-মনুষ্য' বললে কার রক্ত গরম না হয়। কিন্তু বেতারবাণী অত্যন্ত সৌম্য বৌদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আপনি বিদেশী' এবং আমাদের সকলের চেয়ে লোকজনের সংস্পর্শে এসেছেন, তার উপর আপনি যিসে প্রবীণ। আপনার এই মত শুনে ভারি খুশী হলুম।'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কৌতুহল দমন করতে না পেরে গাড়ির কড়কড়ানির সঙ্গে মিলিয়ে সর্দারজীকে আন্তে আন্তে উদ্গত শুধালুম, 'একি কাণ্ড? আপনি এর জাত তুলে একে আধা-ইনসান বললেন আর ইনি খুশী হয়ে আপনাকে তসলীম করলেন!'

সর্দারজী আরো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ইনি চটবেন কেন? ইনি তো কাবুলী।'

আমি আরো সাত হাত জলে। ফের শুধালুম, 'কাবুলী পাঠান নয়?'

সর্দারজী তখন আমার অজ্ঞতা ধরতে পেরে বৃষ্টিয়ে বললেন, 'আফগানিস্তানের অধিবাসী পাঠান। কিন্তু সাত কাবুলের লোক ইরান দেশ থেকে এসে সেখানে বাড়িঘরদার বেঁধে শরয়

জমিয়েছে। তাদের মাতৃভাষা ফার্সী। পাঠানের মাতৃভাষা পশতু। বেতারের সায়েব পশতু ভাষায় এক বর্ণও বোঝেন না।

আমি বললুম, 'তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু কলকাতার কাবুলীওয়ালারা তো ফার্সী বোঝে না।'

'তার কারণ কলকাতার কাবুলীরা কাবুলের লোক নয়। তারা সীমান্ত, খাইবার বড় জেজর চমন কন্দাহারের বাসিন্দা। খাস কাবুলী পারতপক্ষে কাবুল শহরের সীমানার বাইরে যায় না। যে দুদশ জন যায় তারা সদাগর। তাদেরও পাল্লা ঐ পেশাওয়ার অবধি।'

এত জ্ঞান দান করেও সর্দারজীর আশ মিটল না। আমাকে শুধালেন, 'আপনি 'কাবুলীওয়াল', 'কাবুলীওয়াল' বলেন কেন? কাবুলের লোক হয় হবে 'কাবুলী', নয় 'কাবুলওয়াল'। 'কাবুলীওয়াল' হয় কি করে?'

হকচকিয়ে গেলুম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কাবুলীওয়াল'। গুরুকে বাঁচাই কি করে? আর ব্যাচাতে তো হবেই, কারণ—

যদপিু আমার গুরু শূড়ি-বাড়ি যায়।

তদপিু আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।।

সামলে নিয়ে বললুম, 'এই আপনি যে রকম 'জগদ্বাহিরাত' বলেন। 'জওহর' হল এক ঘটন : 'জওহাহির' বহুবচন। 'জওহাহিরে' ফের 'আত' নাগিয়ে আরো বহুবচন হয় কি প্রকারে?'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিন্তু মাছ দিয়ে ঢাকা যায় কিনা সে প্রশ্ন অন্য যে কোনো দেশে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কিন্তু পাঠানমুন্সুকের অর্থে, এক খুনের বদলে আরেক খুন। তাই সে যাত্রা সর্দারজীর সামনে ইজ্জত বজায় রেখে ফাঁড়া কাটপে পাললুম।

অবশ্য দরকার ছিল না। সর্দারজী তখন মোড় নিতে ব্যস্ত। আমি ভাবলুম, ম্যাপে দেখেছি জলালাবাদ থেকে কাবুল সোজা নাকবরবোর রাস্তা—গাড়ি আবার মোড় নিচ্ছে কেন?'

বেতারবাণী হল, 'সেই ভালো, আজ যখন কিছুতেই কাবুল পৌঁছন যাবে না তখন নিমলার বাগানেই রাত কাটানো যাক।'

দূরে থেকেই সারি সারি চিনার গাছ চোখে পড়ল। সুপারির চেয়ে উঁচু—সোজা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। বুক অবধি ডালপাড়া নেই, বাকীটুক মসৃণ ঘন পল্লবে আন্দোলিত। আমাদের ষাঁধপাড়ার সঙ্গে কচি অশখপাড়ার সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়ে সীর্ণ বিনুনির মত যদি কোনো পল্লবের কম্পনা করা যায় তবে তাই হয় চিনারের পাতা। কিন্তু তার দেহটির সঙ্গে অন্য কোনো গাছের তুলনা হয় না। ইরানী কবিতা উদ্ভাসিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তরুণী তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঞ্জিমার সঙ্গে চিনারের দেহেসৌন্দর্যের তুলনা করে এখানে তও

হলনি। মৃদুমন্দ বাতাসে চিনার যখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রীতে মথুরে আন্দোলিত করে তখন রসকব্জীনা পাঠান পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বারোবার তার দিকে তাকায়। সুপারির সোলের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা মিল আছে কিন্তু সুপারির রঙ শ্যামলিমাইন কর্কশ, আর সমস্তকণ ভয় হয়, এই বুঝি ভোঙ্গে পড়ল।

মনে হয়, মানুষ ছাড়া অন্য যে-কোনো প্রাণী চিনারের দেহেচ্ছন্দকে তরুণীর চেয়ে মধুর বলে স্বীকার করবে।

বেতারওয়ালী ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো খবরই রাখেন না। সর্দারজীর কাছ থেকে বেশী আশা করাও অন্যায্য কিন্তু তিনিই বললেন নিমলার বাগান আর তাজমহলের বাগান নাকি একই সমত্বকার। নিমলার বাগনে যে প্রাসাদ ছিল সেটি অভিযান আক্রমণ সহ্য না

করতে পেরে অদৃশ্য হয়েছে কিন্তু সারিবাগানো রমণীয় চিনারগুলো নাকি শাহজাহানের হাটুবে

পোতা। সর্দারজীর ঐতিহাসিক সত্যতা এখানে অবশ্য উদ্ভিদবিদ্যা দিয়ে পরখ করে নেবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এই অজ্ঞানা অচেনা দেশে শাহজাহানের তৈরী তাজের কনিষ্ঠ উদ্যানে ঢুকতি কম্পনা করাতো যে সুখ, উদ্ভিদতত্ত্বের মোহমুগ্ধের দিয়ে সে মায়াজাল ছিদ্র করে কি এমন চরম মোক্ষলাভ। বাগানে আর এমন কিছু চারুশিল্পও নেই যার কৃতিত্ব শাহজাহানের দিয়ে দিলে অন্য কারো ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। আর এ কথাও তো সত্য যে শাহজাহানের আসন উচু করার জন্য নিমলার বাগানের প্রয়োজন হয় না—এক তাজই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

তবু স্বীকার করতে হবে অতি অল্প আয়াসের মধ্যে উদ্যানটি প্রাণাভিরাব। চিনারের সারি, জল দিয়ে বাগান তাজা রাখবার জন্য মাথাখানে নালা আর অসংখ্য নরগিস ফুলের চারা। নরগিস ফুল দেখতে অনেকটা রক্তনীলগন্ধার মত, চারা হবেও একই রকম অর্থাৎ ট্রুবরোজ জাতীয়। গ্রীক দেবতা নারসিসাস নাকি আপন রূপে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত দিন নদীর জলে আপন চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেবতা ব্যিরক্ত হয়ে শেষটায় তাকে নদীর পারের ফুল গাছে পরিবর্তিত করে দিলেন। এখনো নারসিসাস ফুল—ফার্সীতে নরগিস—ঠিক তেমনি নদীর জলে আপন ছায়ার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নরগিস বনের এক পাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সূর্যাস্তের শেষ আভ্যুত্কা চিনার-পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পর ডাকবাকুলার খানসামা আহ্বার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সেখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল অর্পূ মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি নিত্যন্ত কানের পাশে জলের কুলকল শব্দ আর আমার সর্বদেহে জড়িয়ে, নাকমুখ ছাপিয়ে কোন অজ্ঞানা সৌরভ সুন্দরীর মধুর নিশ্বাস।

শেষরাত্রে নৌকা যখন বিল ছেড়ে নদীতে নামে তখন যেমন নদীর কুলকল শব্দে ঘুম ভঙে যায়, জানলার পাশে শিউলি গাছ থাকলে শরতের অতি ভোরে যে রকম তজ্জা টুটে যায়, এখানে তাই হল, কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে। এ সম্বন্ধিত বজবার শুনেছি কিন্তু তার সঙ্গে এধেনে সৌরভসোষণ জীবনে আর কখনো পাইনি।

সেই আধা-আলোঅন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলায় শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে, নরগিসের পা ধুয়ে ছুটে চলেছে। বরলুম, নালার উজানে দিনের বেলায় বাধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল—ভোরের আজ্ঞাসনে সমগ্র নিমলার বাগানের পলা; বাধ খুলে দিলেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে—তারি পরের নরগিস নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান গর সৌরভে মিশে গিয়েছে।

আর যে চিনারের পদপ্রান্তে উভয়ের সঙ্গীতসৌরভ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিব্যেকের জন্য। দেখতে না—দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল—পদপ্রান্তে পুষ্পবনের গন্ধরূপে বৈতালিক মুখরিত হয়ে উঠল।

'এনি আভি কোন ঘরে গো

বুলে দিল হার,

আভি প্রাতে সূর্য ওঠা

সফল হল কার?'



ভোরের নামাজ শেষ হতেই সর্দারজী তৈপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিতে দেখে মনে হল তিনি মানস্তুির করে ফেলেছেন আজ সন্ধ্যায় যে করেই হোক কাবুল পৌঁছাবেন।

বেতার-মায়েবের দিলও খুব চাঞ্চা হয়ে উঠেছে। সর্দারজীর সঙ্গে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন ও আমাকেও আফগানিস্তান সম্বন্ধে নানা কাক্তের খবর নানা রঙীন গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য, কতটা কল্পনা, কতটা ডায়া মিথো বুঝবার মত তথ্য আমার কাছে ছিল না, কাক্তেই একতরফা গল্প জমে উঠল ভালো। তারই একটা বলতে গিয়ে ভুলিকা দিলেন, ‘সামান্য জিনিস মানুষের সমস্ত জীবনের ধারা কি রকম অন্য পথে নিয়ে ফেলতে পারে শুনুন।’

‘প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই নিমলার বাগানেই জ্বন চল্লিশ কয়েদী আর তাদের পাহারাওয়ালারা রাত কাটিয়ে সকালবেলা দেখে একজন কি করে পালিয়েছে। পাহারাওয়ালাদের মস্তকে বস্ত্রযাত। কাবুল থেকে যতগুলো কয়েদী নিয়ে বেরিয়ে ছিল জলালাবাদের যদি সেই সংখ্যা না দেখাতে পারে তবে তাদের যে কি শাস্তি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের আইনজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। কেউ বলল, ফাঁস দেবে, কেউ বলল, গুলী করে মারবে, কেউ বলল, জ্যান্ত শরীর থেকে টেনে টেনে চামড়া তুলে ফেলবে। জেল যে হবে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, আর আশপাশ জেলের অবস্থা আর কেউ জানুক না জানুক তারা বিলম্বিত জনত। একবার সে জেলে ঢুকলে সাধারণত কেউ আর বেরিয়ে আসে না—যদি আসে তবে সে ফায়ারও স্কোয়ারডের মুখেমুখি হতে, অথবা অন্যের স্বাক্ষরের উপর সোয়ার হয়ে কবিরের ভিতর শুয়ে শুয়ে। আফগান জেল সম্বন্ধে তাই যেসব কথা শুনতে পাবেন তার বেশীর ভাগই কল্পনা—মরা লোকে তো আর কথা কয় না।’

‘আ সে যাই হোক, পাহারাওয়ালারা তো ভয়ে আত্মমরা। শেষটায় একজন বুদ্ধি বাৎসাল, যে রাস্তার যে-কোনো একটা লোককে ধরে নিয়ে ফিরেবে গৌজামিন দিতে।’

‘পাছে অন্য লোককে জানতে পেরে যায় তাই তারা সাতভাড়াভাতি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় চতুর্দিকে নজর, কড়কে যদি একাকি পায় তবে তাকে দিয়ে কাজ হাসিল করবে। ভোরের অন্ধকার তখনো কাটেনি। এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার পাশে প্রয়োজনীয় কর্ম করতে এসেছিল। তাকে ধরে শিকলি পরিয়ে নিয়ে চলল আর সকলের সঙ্গে জলালাবাদের দিকে।’

‘সমস্ত রাস্তা ধরে তাকে হইলোক পরলোক সকল লোকের সকল রকম ভয় দেখিয়ে পাহারাওয়ালারা শাসিয়ে বলল, জলালাবাদের জেলের তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যেন শুধু বলে, “মা খু চিহল ও পশ্তু হস্তম” অর্থাৎ ‘আমি পয়তাল্লিশ নম্বরের।’ বাস, আর কিছু না।’

‘লোকটা হয় আকটী মূখ ছিল, না হয় ভয় ফেরে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল অথবা এ হতে পারে যে সে ভেবে নিয়েছিল যে যদি কোনো কয়েদী পালিয়ে যায়, তবে সকলের পয়লা রাস্তায় যে সামনে পড়ে তাকেই সরকারী নম্বর পুরিয়ে দিতে হয়। অথবা হয়ত ভেবে নিয়েছিল রাস্তার যে-কোনো লোককে রাজার হাতী যখন মাথায় তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারে তখন তাকে জেলখানায়ই বা নিয়ে যেতে পারেনা না কেন?’

বেতারবাণী বললেন, ‘গল্পটা আমি কম করে জন পাঁচেকের মুখে শুনেছি। ঘটনাগুলোর বর্ণনায় বিশেষ ফেরফার হয় না কিন্তু ঐ হতভাগা কেন যে জলালাবাদের জেলরের সামনে

সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার চেষ্টা একবারও করল না সেই বিচিত্র।’

সর্দারজী শুধলেন, ‘অন্য কয়েদীরাও চুপ করে রইল?’

বেতারওয়ালার বললেন, ‘আদের চুপ করে থাকার প্রচুর কারণ ছিল। সব কটা কয়েদীই ছিল একই ডাকাত দলের। তাদেরই একজন পালিয়েছে—অন্য সকলের ভরসা সে যদি বাইরে থেকে তাদের জন্য কিছু করতে পারে। তার পালানোতে অন্য সকলের যখন যড় ছিল তখন তারা কিছু বললে তো তাকে ধরিয়ে দেবারই সুবিধে করে দেওয়া হত।’

‘আ সে যাই হোক, সেই হতভাগা তো জলালাবাদের জাহায়েম নিয়ে ঢুকল। কিছুদিন যাওয়ার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারল কি বোকামিই সে করেছে। তখন একে একে বলে কয়েদী আলা হজরত বাদশার কাছে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা দিয়ে সে দরখাস্ত পাঠানোর চেষ্টা করল। কিন্তু জলালাবাদের জেলের দরখাস্ত সহজে হজুরের কাছে পৌঁছয় না। জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে, ভালো করে সাবান না করে বেকসুর লোককে জেলে পোরার সাজাও হয়ত তার কপালে আছে। অথবা হয়ত ভেবেছে, সমস্তটাই গাজা, কিস্মা ভেবেছে, জেলের আর পাঁচজনের মত এরও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।’

‘জলালাবাদের জেলের ভিতরে কাপাজ-কলমের ছড়াছড়ি নয়। অনেক খুলেখুলি করে সে দরখাস্ত লেখায়, তারপর সে দরখাস্তের কি গতি হয় তার খবর পর্যন্ত বেচারীরা কানে এসে পৌঁছয় না।’

‘বিশ্বাস করবেন না, এই করে করে একমাস নয় দু’মাস নয়, এক বৎসর নয় দু’বৎসর নয়—ঝাড়া ফোলটি বৎসর কেটে গিয়েছে। তার তখন মনের অবস্থা কি হয়েছে বলা কঠিন, তবে আন্দাজ করা বোধ করি অন্যায় নয় যে, সে তখন দরখাস্ত পাঠানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে।’

‘এমন সময় তামাম আফগানিস্তান জুড়ে খুব একটা খুশীর জশন (পরব) উপস্থিত হল—মুহীন-উস-সুলতানের (যুবরাজের) শাদী অথবা তাঁর প্রথম ছেলে জন্মেছে। আমীর হবীবউল্লা খুশীর জোশে অনেক দান-খরাত রগলেন ও সে খরাতের বরসাত রুখাসুখা গুলোলাতোও পৌল। শীতকাল; আমীর তখন জলালাবাদে। ফরমান বেরল, জলালাবাদের জেলের যেন তাবৎ কয়েদীকে হজুরের সামনে হাজির করবে। তজ্জুর তাঁর বেহদ মেহেরবানি ও মহববতের তোছে বেখাতওয়ার হয়ে হকুম দিয়ে ফেলেছেন যে খুদ তিনি হরেক কয়েদীর ফরিদাদ তকলিফের খানাতল্লাশ করবেন।’

‘বিস্তর জেদী খালাস পেল, তারা বেশী কয়েদীর মিাদ কমিয়ে দেওয়া হল। করে করে শেষটায় নিমলার সেই হতভাগা হজুরের সামনে এসে দাঁড়াল।’

‘হজুর শুধলেন, “ও কীটী, “তুই কে?”

‘সে বলল, “মা খু চিহল ও পশ্তু হস্তম” অর্থাৎ ‘আমি তো পয়তাল্লিশ নম্বরের।’

‘হজুর যতই তার নামধাম কসুরসাজার কথা জিজ্ঞাসা করেন সে ততই বলে সে-শুধু পয়তাল্লিশ নম্বরের। ঐ এক বুলি, এক জিগির। হজুরের সন্দেহ হল, লোকটা বুঝি পাপল। ঠাঠর করবার জন্য অন্য নানা রকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল, সূর্য কোন দিকে ওঠে, কোন দিকে অস্ত যায়, মা ছেলেকে দুখ খাওয়ায়, মা ছেলে মাকে। সব কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু তার নিজের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে, ‘আমি তো পয়তাল্লিশ নম্বরের।’

‘মেল বরদ এ মস্ত জপ করে করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, তার নাম নেই ধাম নেই, সাকিনটিকানা নেই, তার পাপ তার সর্বের সত্তা ঐ এক মস্তে, ‘আমি পয়তাল্লিশ নম্বরের।’

more-prime-bangal.blogspot.com

‘শুভ’ দেয় থাকলেও আমীর হবীবউল্লাহ একটা গুণ ছিল; কোনো জিনিসের খেঁচি ধরলে তিনি জট না ছাড়িয়ে সন্তুষ্ট হতেন না। শেষতায় সেই ডাকাতিদের যে দু’—একজন তখনো বেঁচেছিল ভরাই রহণ্যের সমাধান করে দিল।

‘শুনতে পাই খালসা পাওয়ার পরও, বাকী জীবন সে এঁ পয়তালিশ নম্বরের তানুমতী কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।’

গম্পা শুনে আমার সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিশব্দ বৃদ্ধ সর্দারজীর মুখে শুধু ‘আজ্ঞা মালিক’, ‘খুদা বাচানোওয়াল’।

ততক্ষণে চড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাবুল যেতে হলে যে সাত আট হাজার ফুট পাহাড় চড়তে হয় নিম্নলার কিছুক্ষণ পরেই তার আরম্ভ।

সিলেট থেকে যারা শিলঙ গিয়েছিলেন, দেয়াদুন থেকে মসৌরী, কিম্বা মহাবলেশ্বরের কাছে পশ্চিম বাট উজীর্ণ হয়েছেন, তাদের পক্ষে এ রকম রাস্তার চুল্লার কাঁটার ঝাঁক, হাঙ্গুলি চাকের মোড় কিছু নতুন নয়—নতুন হুটা হচ্ছে যে, এ রাস্তা কেউ মেরামত করে দেয় না, এখানে কেউ রেলিও বানিয়ে দেয় না, হযেরকরকম সাইনবোর্ড দুদিকের পাহাড়ে পেঁতে দেয় না, বিশেষ সম্বর্ধীর্ণ সবকট পেরবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দুদিকের মোটর আটকানো হয় না। মাটি ধসে রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ না জন আটকে ড্রাইভার আটকা পড়ে আপন আপন শাবল দিয়ে রাস্তা সাফ করে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমদাময়ের ‘রাখে গো ব্রজসুন্দরী, পার করে’ বলা ছাড়া অন্য কিছু করার নেই। বারো শীতকালে এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন তাদের মধ্যে শুনেছি যে রাস্তার বরফও নিজেদের সাফ করতে হয়। অবশ্য বরফ সাফ করতে আভিজাত্য আছে—শুনেছি স্বয়ং হুমায়ুন বাদশাহ নাকি শের শাহের তাদার খেয়ে কাবুল না কদমহার যাবার পথে নিজ হাতে বরফ সাফ করেছিলেন।

শিলঙ—নৈনিতাল যাবার সময় গাড়ির ড্রাইভার অন্তত এই সন্দ্বান্দা দেয় যে, দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। এখানে যদি কোনো ড্রাইভার এ রকম কথা বলে তবে আপনাকে শুধু দেখিয়ে দিতে হবে, রাস্তার যে—কোনো এক পাশে, হাজার ফুট গভীর খাদে দুর্ঘটনার অপমৃত্যু দুটো একটা মোটর গাড়ির কঙ্কাল। মনে পড়ছে যে এখিল—সেন্টোপার চড়াইয়ের মুখে দেখেছিলাম, ড্রাইভারদের বুকে যমুনোতর ভয় জাগাবার জন্য রাস্তার কর্তা ব্যক্তির একলম্বা ভাঙা মোটর খুলিয়ে রেখেছেন—নিচে বড় বড় হরপ লেখা, ‘সম্বাদনে না লললে এই অবস্থা তোমারও হতে পারে।’ কাবুলের রাস্তার মুখে সে রকম ব্যাপক কোনো বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয় না—চোখ খোলো রাখলে দুদিকে বিস্তর প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে চিত্তির যখন হঠাৎ ঝাঁক নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন আধ মাইল লম্বা উটের লাইন। একদিকে পাহাড়ের গা, আর একদিকে হাজার ফুট গভীর খাদ, মাঝখানে গাড়ি বাদ দিয়ে রাস্তার ক্লিয়ারিং এক হাত। তার ভিতর দিয়ে নড়বড়ে উট দূরের কথা, শান্ত গাধাও পেরতে পারে না। চণ্ডা রাস্তার আশায় আধ মাইল লম্বা উটের সারিকে পিছু তেলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তখন গাড়িই ব্যাক করে চলে উল্টা দিকে। সে অবস্থায় পিছনের দিকে তাকাতো পারেন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন স্মার্যবাহিনী ‘দুঃখবনুষ্টিগুণনা’ স্থিতবী মুনিপ্রবর আমি কখনো দেখিনি। সবাই তখন চোখ বন্ধ করে কলমা পড়ে আর মোটর না—থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর চোখ খুলে যা দেখে সেও পিলে—চমকানিয়া আস্তে আস্তে একটা একটা করে উট সেই ফাঁকা দিয়ে যাচ্ছে, তারপর বলা নেই কাণ্ডা নেই একটা উট আধপাক নিয়ে ফাঁকটুকু চণ্ডাচণ্ডি বন্ধ করে দেয়। পিছনের উটগুলো সঙ্গে সঙ্গে না থেমে সমস্ত রাস্তা জুড়ে আমলমা লাগায়—স্রোতের জলে বাধ দিলে যে রকম জন চতুদিকে ছড়িয়ে

পড়ে। যে উটটা রাস্তা বন্ধ করেছে তাকে তখন সোজা করে ফের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জন পাঁচেক লোক সামনে থেকে টানাতামি তখন, আর জন বিশেক পিছন থেকে চেষ্টামেচি হৈ—হৈ লাগায়। অবস্থান তখন অনেকটা ছোট গলির ভিতর অবস্থান। ড্রাইভার মোটর মোরাতে গিয়ে আটকা পড়ে গেলে যে রকম হয়। পার্থক্য শুধু এটুকু যে সেখানে হাজার ফুট গভীর খাদের ভয় নেই, আর আপনি হয়ত রকে বসে বিড়ি হাতে আগ—বাচ্চা নিয়ে গুপ্তিসুখ অনুভব করছেন।

এই অবস্থায় যদি পিছন থেকে আর এক সার উট এসে উপস্থিত হয় তবে দুটোর সম্পূর্ণ খোলত্রাই হয়। আধ মাইল ধরে, সমস্ত রাস্তা জুড়ে তখন ঢাকা দক্ষিণের মেলায় গোরুর হাট বসে যায়।

বুখারা—সমরকন্দ, শিরাজ—বদখশান সেই দম্বে মজে গিয়ে চিৎকার করে, গলাগাল দেয়, জট খোলে, ফের পাকায়, অস্ত্র সম্বরণ করে দুন্দও জিরিয়ে নেয়, ঢেলে সেজে ফের গোড়া থেকে শুড় কাষদায় আরম্ভ করে—

‘ক’ রে কমললোচন শ্রীহরি

‘ব’ রে খণ—আসনে মুরারি

‘গ’ রে গুরুভূ—

স্মৃতিগঞ্জির উপর নির্ভর করাই যদি সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হয়, তবে আমাকে ঈক্যর করভেই হবে যে আমি আজও সেই রাস্তার মাঝখানে মোটরের ভিতর কনুয়ের উপর ভর করে দু’ হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছি। জটপাতানো স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু সেটা কি করে খুলল, মোটর আবাব কি করে চলল, একদম মনে নেই।

তের

ফ্রান্সের বেতারবাণী আরম্ভ হয় ‘হিস পারি’ অর্থাৎ ‘হেথায় প্যারিস’ দিয়ে। কাবুল ইয়োরোপীয় কোনো জিনিস নকল করতে গেলে ফ্রান্সকে অনাদর্শণে মেনে নেয় বলে কাবুল রেডিয়ো দুই সন্ধ্যা আপন অভিজ্ঞতা—বাণী প্রচারিত করে ‘ইন জা কাবুল’ অর্থাৎ ‘হেথায় কাবুল’ বলে। মোটরও বেতারবাণী হল ‘ইন জা কাবুল’। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বলে বেতারযোগে প্যারিস অর্থাৎ কাবুলের যতটা দেখবার সুবিধা হয়, আমার প্রায় ততটাই হল।

ফেডলাইটের জোরে কিছু যে দেখব তারও উপায় ছিল না। পূর্বেই বলেছি বাসুখানার মাত্র একটি চোখ—সাঁঝের পিড়িম দেখাতে গিয়ে সর্দারজী তার উপর আবিষ্কার করলেন যে, সে চোখটিও বাইবারের রৌদ্রমাহনে গান্ধারীর চোখের মত কানা হয়ে গিয়েছে। সর্দারজীর নিজের জন্য অবশ্য বাসের কোনো চোখেরই প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি রাতকানা। কিন্তু রাস্তার পয়তালিশ নম্বরের উপকারের জন্য প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে একটা হারিকেনে যোগাড় করা হল। হ্যাণ্ডিমান সেইটে নিয়ে একটা মাদ—গার্ডের উপর বসল।

‘আমি সভয়ে সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করলুম, ‘হারিকেনের সামান্য আলোতে আপনার মোটর চালাতে অনুবিধা হচ্ছে না তো?’

সর্দারজী বললেন, ‘হাচ্ছে বই কি, আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওটা না থাকলে গাড়ি জোরে চালাতে পারতুম।’ মনে পড়ল, দেশের মাথীরাও অন্ধকার রাত্রে নৌকার সমুখো আলো রাখতে দেয় না।

more prane bangali.blogspot.com

কিন্তু ‘ভাণ্ডা-বিধাতা’ অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তেঁা কবি তাঁরই হাতে গোটা দেশটার ভার ছেড়ে দিয়ে গেয়েছেন—

পতনআত্মদ্রবধর পদ্ম
মৃগ মৃগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

কিন্তু কবির তুলনায় দার্শনিক চের বেশী ঠগনিয়ার হয়। তাই বেধ হয় কবির হাতে রাষ্ট্রের—
কি দুরবস্থা হতে পারে, তারই কল্পনা করে নেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে ভালোমন্দ সব
করিচ্ছেই অবিচারে নির্ভান্দন দিয়েছিলেন।

এ সব তবচিন্তা না করা ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায় ছিল না। যদিও কাবুল
উপত্যকার সমতল ভূমি দিয়ে তখন গাছ চলেছে তবু দুটো একটা মোড় সব সময়ই থাকার
কথা। সে সব মোড় নেবার সময় আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করছিলাম এবং সেই খবরটি
সদাঁরতীকে দেওয়াতে তিনি যা বললেন, তাতে আমার সব ডর ভয় কেটে গেল। তিনি
বললেন, ‘আম্মা চোখ বন্ধ করি।’ শুনে আমি যা চোখ বন্ধ করলুম তার সঙ্গে গাধারীর
চোখ বন্ধ করার তুলনা করা যায়।

সে মাত্রা যে কাবুলে পৌছতে পেরেছিলাম তার একমাত্র কারণ বেধ হয় এই যে, রপরাগে
উপন্যাসের গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না—ভ্রমণকাহিনী—লেখকের জীবনেও সেই সূত্র
প্রযোজ্য।

‘গুমরুক’ বা কাস্টম-হাউস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—বিধানখানা পর্যন্ত ছাড়ল না। টাঙ্গা
নিয়ে ফরাসী রাজদূতবাসের দিকে রওয়ানা হলুম—কাবুল শহরে আমার একমাত্র পরিচিত
ব্যক্তি সেখানেই থাকতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আমার ফার্সী অধ্যাপক ছিলেন ও তখন
ফরাসী রাজদূতবাসে কর্ম করতেন।

টাঙ্গা তিন মিনিট চলার পরেই বুঝতে পারলুম মস্কা রেডিও, কোন ভরসায় তাবৎ
দুনিয়ার প্রলেতারিয়াকে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করে। দেখলুম, কাবুল শহরে
আমার প্রথম পরিচয়ের প্রলেতারিয়ার প্রতীক টাঙ্গাওয়ালা আর কলকাতার গাড়িওয়ালায়
কোনো তফাত নেই। আমাকে উজ্জ্বল পেয়ে সে তার কর্তব্য শৈ্যালদার কাপ্তেনদের মত
তখন স্থির করে নিয়েছে।

বেতারওয়ালা তাকে পই পই করে বুকিয়ে দিয়েছিলেন ফরাসী দূতবাস কি করে যেতে
হয়, সেও বার বার ‘চম্’, ‘বস্’ ও চম্’ অর্থাৎ ‘আমার মাথার দিবি, আপনার তামিল এবং
হকুম আমার চোখের জ্যোতির ন্যায় মূল্যবান’ ইত্যাদি শপথ-কসম খেয়েছিল, কিন্তু কাজের
বেলায় দু’ মিনিট যেতে না যেতেই সে গাড়ি দাঁড় করায়, বেছে বেছে কাবুল শহরের সবচেয়ে
আকর্ষিত মূর্খকে জিজ্ঞাসা করে ফরাসী দূতবাস কি করে যেতে হয়।

অনেকে অনেক উপদেশ দিলেন। এক গুণী শেষটায় বললেন—‘ফরাসী রাজদূতবাস?
সে তো প্যারিসে। যেতে হলে—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘বোম্বাই গিয়ে জাহাজ ধরতে হয়। চল হে টাঙ্গাওয়ালা,
পেশাওয়ার অথবা কন্দাহার—যেটা কাছে পড়ে। সেখান থেকে বোম্বাই।’

টাঙ্গাওয়ালা ঘড়ল। বুঝল,

‘বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হলো,
আমি ঢাকার বাঙাল নহি গো’

তখন সে লব-ই-দরিয়া, দেহ-আফগানান, শহর-আরা হয়ে ফরাসী রাজদূতবাস
পৌছল। কাবুল শহর ছোট—কম করে তিনবার সে আমাকে এক রাস্তা দিয়ে আশেই নিয়ে
গিয়েছে। চতুর্দিকে পাহাড়—এর চেয়ে প্যাঁচালো কেপ অব গুড হোপ চেষ্টা করলেও হয় না।

আমি কিছু বললে এতক্ষণ ধরে সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে আমার কাঁচা ফার্সী সে
বুঝতে পারে না। এবার আমার পালনা। ভাড়া বেবার সময় সে যতই নানারকম যুক্তিতর্ক
উত্থাপন করে আমি ততই বোকরা মত তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাই আর এক ঘেয়ে
আলোচনায় নৃত্যরত আনবার জন্য তার খেলা হাত থেকে আমারই দেওয়া দুচার আনা
কমিয়ে নিই। সন্ধ্যা সন্ধ্যা আমার ভাঙ্গা ফার্সীকে একদম ক্ষুদ্র বানিয়ে দিয়ে, মাথা দুলিয়ে
দুলিয়ে বলি, ‘বুকেছি, বুকেছি, তুমি ইমদাদুর লোক, রিদেদৌ বলে না জেনে বেশী দিয়ে
ফেলেছি, অত বেশী নিতে চাও না। যা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিদেদৌ দরজ
করুন, তোমার বেটোবেটর—’

পর্যাস সরালেই সে আঠকঠে চিৎকার করে ওঠে, আল্লা রনুলের দোহাই কাছে, আর
ইমান-ইনসাফ সম্বন্ধে সাদী-রশ্মীর ব্যর্থও আওড়ায়। এমন সময় অধ্যাপক বগদানফ এসে
সব কিছু রফারফি করে দিলেন।

যাবার সময় সে আমাকে আর এক দফা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত
মেপে নিয়ে, অতন্ত মালোয়েম আবার শুধালো, ‘আপনার দেশ কোথায়?’

বুঝলুম, গয়ার পাণ্ডার মত। ভবিষ্যৎ সত্যকর্তার জন্য।

কে বলে বাঙালী হীন? আমার হেলায় লজ্জা করিনি জয়?

রাতের বেলাই বগদানফ সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধা। সমস্ত রাত ধরে পড়াশোনা
করেন, আর দিনের বেলা যতটা পারেন ঘুমিয়ে নেন। সেই কারণেই বেধ হয় তিনি
ভারতবর্ষের সব পাখির মাথা গৌচাকে পছন্দ করতেন বেশী। শান্তিনিকেতনে তিনি যে ঘরটির
ক্লাস নিতেন, নন্দাবাবু তাঁরই দেয়ালে একটা পেঁচা একে দিয়েছিলেন। বগদানফ সায়েব তাতে
ভারি খুশী হয়ে নন্দাবাবু মেলো তারিফ করেছিলেন।

বগদানফ জাতে রুশ, মস্কার বাসিন্দা ও কটর জারপন্থী। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময়
মস্কা থেকে পালিয়ে আজরবাইজান হয়ে তেহরান পৌছান। সেখান থেকে বসরা হয়ে
বোম্বাই এসে বাসী বাঁধেন। ভালো পেহলেদৌ বা পছন্দী জনতেন বলে বোম্বাইয়ের জরখুস্তী
কামা-প্রতিনিধি তাকে দিয়ে সেখানে অনেক পুঁথিপত্রের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ
সে সময়ে রুশ পণ্ডিতদের দুরবস্থায় সাহায্য করার জন্য এক আন্তর্জাতিক আহবানে
ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সাজা দেন এবং বোম্বাইয়ে বগদানফের সঙ্গে দেখা হলে বিশ্বভারতী
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাকে ফার্সী অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন।

১৯১৭ সালের পূর্বে বগদানফ রুশের পররাষ্ট্রবিভাগে কাজ করতেন ও সেই উপলক্ষে
তেহরানে আট বৎসর কাটিয়ে অতি উৎকৃষ্ট ফার্সী শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন
পরবর্তীকালে ইরান যান, তখন সেখানে ফার্সীর জন্য অধ্যাপক অনুসন্ধান করলে পণ্ডিতেরা
বলেন যে, ফার্সী পড়বার জন্য বগদানফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব। কাবুলের
অন্য জহরীদদের মুখেও আমি শুনেছি যে, আধুনিক ফার্সী সাহিত্যে বগদানফের লিপ্যলিঙ্গী

mone-prane-bangali.blogspot.com

আপন বিশিষ্টা দেখিয়ে বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে।

ইউরোপীয় বড় ভাষা তো জানতেনই—তাহাজ্ঞা জগতাই, উসমানলী প্রভৃতি কতকগুলো অজানা অচেনা তুলী ভাষা উপভাষায় জরবদস্ত শৈলীও ছিলেন। কবুলের মত জগাখিড়ি শহরের দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গেই তিনি তাঁদের মাতৃভাষায় দিব্য স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন।

একদিকে আগার পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে কুসংস্কারের ভিত্তি। বা দিকে নাড় ফিরিয়ে পিছনের চাঁদ দেখতে পেয়েছেন না তো গোখরোর ফণায় যেন পা দিয়েছেন। সেই 'দুখতিনা'র তিন মাস পরেও যদি তাঁর পেয়ারা বেরাল বধি করে, তবে ঐ বা কানের উপর দিয়ে অপূয়া চাঁদ দেখাই তার জন্য দায়ী। মইয়ের তলা দিয়ে গিয়েছ, হাত থেকে পড়ে আরশি ভেঙে গিয়েছে, চাবির গোছা তুলে মেঘের উপর রেখেছিলেন—আর যাবে কোথায়, সে রাশ্রে নগদানক্ষ সাহেব তোমার জন্য এক ফটা ধরে আইকনের সামনে ভিড়িভিড় করে নানা মস্ত পড়বেন, গ্রীক অর্থডক্স চার্চের তাবৎ সেন্টদের কাছে কাম্বাকাটি করে ধমা দেবেন, পরদিন ভোরবেলা তোমার চোখে মুখে মস্তপুত জল ছিটিয়ে দিয়ে তিন বৎসর ধরে অপেক্ষা করবেন তোমার কাছ থেকে কোন দুষ্প্রবোধ পাবার জন্য। তিন বছর দীর্ঘ মিয়াদ, কিছু—না কিছু একটা ঘটবেই। তখন বাড়ি বসে এসে বগদানক্ষ সাহেব তোমার সামনে মাথা নিচু করে জানুতে হাত রেখে বসবেন, মুখে ঐ এক কথা 'বলিনি, তখনই বলিনি'।

শ্রীমানকৃষ্ণাবেন বলেছেন, 'বড় বড় সাধক মহাপুরুষ যেন এক একটা কাঠের গুড়ি হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। শত শত কাক তারই উপরে বসে বিনা মেহরতে ভবনদী পার হয়ে যায়।'?

বগদানক্ষের পাল্লায় পড়লে তিন দিনে দুনিয়ার কুলে কুসংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা আপনান মুখস্থ হয়ে যাবে, এক মাসের ভিতর সেগুলো মানতে আরম্ভ করবেন, দুমাসের ভিতর দেখতে পাবেন, বগদানক্ষ-কারের গুড়িতে আপনি একা নন, আপনান এবং সায়েবের পরিত্রিত প্রায় সবাই তার উপরে বসে বসে কিমোচ্ছেন। ঘোর বেলেঙ্গা দু—একটা নাস্তিকের কথা অবশিষ্ট আলাদা। তারা প্রেম দিলেও কলসী নানা করে।

দাদুল বন্ধুবৎসল ও সদানন্দ পুরুষ। তার মুখে হস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলেছিলেন, 'হু! আশেং লে মার্শিন আ পের্সে লে মাকারনি।' অর্থাৎ 'মাকারনি ফুটো করার জন্য তিনি মেশিন কেনেন।' সোজা বাঙালয় 'কাকের ছানা কেনেন'।

কাবুলের বিদেশী দুনিয়ার কেন্দ্রস্থলে ছিলেন বগদানক্ষ সায়েব—একটি আন্ত প্রতিষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তাঁর সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল।

চোদ্দ

এক বর্ষা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'পালা-পরবে নেমস্তম্ভ গেলে অরক্ষণীয় মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' তারপর বুদ্ধিয়ে বলেছিলেন, 'বাড়িতে যদি মেয়েকে রেখে যাও তাহলে সমস্তক্ষম দুর্ভাবনা, ভালো করলুম না মন্দ করলুম; সঙ্গে যদি নিয়ে যাও তবে সঙ্কলের কাছ থেকে একই গলাগাল, এতদিন ধরে রিয়ে দাওনি কেন?'

দেশত্রমণে দেখলুম একই অবস্থা। মোকামে পৌঁছেই প্রশ্ন, দেশটার ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেব; কি দেব না। যদি না বল তবু সমস্তক্ষম দুর্ভাবনা, ভালো করলুম না, মন্দ করলুম। যদি দাও তবু লোকের গলাগাল নিশ্চিত খেতে হবে। বিশেষ করে আফগানিস্তানের বেলা,

কারণ অরক্ষণীয় কন্যার যে রকম বিয়ে হয়নি, আফগানিস্তানেরও ইতিহাস তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস গোড়া আছে সে দেশের মাটির তলায়, আর ভারতবর্ষের পুরাণ মহাভারতে। আফগানিস্তান গরীব দেশে, ইতিহাস গভীর জন্য মাটি ভাঙবার ফুরাস আফগানের নেই, মাটি যদি সে নিতান্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলী মেন—(জো-দজো বের করার জন্য নয়—কয়লার খনি পাবার আশায়। পুরাণ ঘাঁটখাঁটি করার মত পাণ্ডিত্য কাবুলীর এখনো হয়নি—আমাদেরই কতটা হয়েছে কে জানে? পুরাণের কতটা সত্যিকার ইতিহাস আর কতটা ইতিহাস—পাগলাদের বোকা বানাবার জন্য পুরাণকারের নির্মম অটুটাসা তারই মীমাংসা করতে আরেক জীবন কেটে যায়।

আফগানিস্তানের অবচীন ইতিহাস নানা ফাসী পাখুলিপিতে এদেশে ওদেশে, অন্তত চারভাষা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এদেশের মাল নিয়ে পণ্ডিতেরা নাড়াচাড়া করেছেন—মাহমুদ, বাবুরের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের পঠান-তুলী-মোগল যুগের ইতিহাস লেখার জন্য। কিন্তু বাবুরের আত্মজীবনী সঙ্গে নিয়ে আরজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় পণ্ডিত—আফগানের কথাই ওঠে না—কাবুল হিন্দুকুশ, বদখশান বলখ, মৈমানা হিরাতে তৈয়ামুর করেন নি, কারণ আফগান ইতিহাস লেখার শিরঃপীড়া নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনও উন্মত্ত হয়নি। অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্তানের ইতিহাস না লিখে ভারত-ইতিহাস লেখবার জো নেই, আফগান রাজনীতি না জেনে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ঠাণ্ডা রাখবার কোনো মধ্যমানায়ণ নেই।

গানের উপর আরেক বিধ-কোড়া—আফগানিস্তানের উত্তরভাগ অর্থাৎ বলখবদখশানের ইতিহাস তার সীমান্ত নদী আমুরিয়ার গ্রীক অফুস, সংস্কৃত বহু। গুপারের তুলীস্থানের সঙ্গে, পশ্চিমভাগ অর্থাৎ হিরাতে অফুল ইরানের সঙ্গে, পূর্বভাগ অর্থাৎ কাবুল জলালাবাদ খাস ভারতবর্ষ ও কাশ্মীরের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা মুখে নানা রঙ ধরেছে। আফগানিস্তানের তুলনায় সুইটজারল্যান্ডের ইতিহাস লেখা ঢের সোজা—যদিও সেখানে তিনটে ভিন্ন জাত আর চারটে ভাষা নিয়ন্ত্রণ করবার।

আর শেষ বিপদ, যে দু'চারভাষা কেতাব-পত্র আছে সেগুলো খুললেই দেখতে পাবেন, পণ্ডিতেরা সব রামদা উচিয়ে আছেন। 'গাফ্ফার' লিখেই সেই রামদা—'গ'—উচিয়েছেন অর্থাৎ 'গাফ্ফার কোথায়?' 'কাম্বোজ' বলেই সেই খড়গ—'গ' অর্থাৎ 'কাম্বোজ বলতে কি বোঝে—' 'কম্বুকুটী' বা 'কম্বুগ্রীবী' বলতে বোঝায় গয়ের গলায় শাঁখের গয়ের তিনটে দাগ কাটা রয়েছে—যেমনতম বৃদ্ধের গলায়। কাম্বোজ দেশ কি তবে গিরি উপত্যকার কটী—কোলানা দেশ আফগানিস্তান, অথবা কম্বু যেখানে পাওয়া যায় অর্থাৎ সমুদ্র-পারের দেশ বেলুচিস্তান? এমন কি দেশগুলোর নামের পর্যন্ত ঠিক ঠিক বানান নেই, যেমন ধরুন বলখ—কখনো বালহিকা, কখনো বালহিকা, কখনো বালহীকা। সে কি তবে ফেরদৌসী উল্লিখিত বলখ—যেখানে জরখুস্তর রাজা গুশকআসপকে আবোজা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন? সেখান থেকেই কি আজকের দিনের কাবুলীয়া জাফরান আর হিঙ নিয়ে আসে? কারণ ঐ দুয়ের নামই তো সংস্কৃতে বালহিকজ।

গাফেল বলেছেন, 'পণ্ডিতজন যে স্থলে মতানৈক্য প্রকাশ করেন মুখ যেন তথায় ভাষণ না করে'।

আমার ঠিক উল্টো বিশ্বাস—আমার মনে হয় ঠিক এ জায়গাতেই তার কিছু বলার সুযোগ—পণ্ডিতরা তখন একজোটে হতে পারেন না বলে সে ব্যায়েয়ারি কিল থেকে নিষ্কৃতি পায়।

পণ্ডিতে মুখে মিলে আফগানিস্তান সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার মেটামুর্টি তত্ত্ব এই—

আর্যজাতি আফগানিস্তান, খাইবারপাস হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—পামির, দার্দিস্তান বা পেশাভূমি কাশ্মীর হয়ে নয়। বোগাজ—কোই বর্ণিত মিতানি রাজ্য ধ্বংসের পরে যদি এসে থাকে তবে প্রচলিত আফগান কিংবদন্তী যে আফগানরা ইরানীদের অন্যতম পঞ্চস্তম্ভ উপজাতি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ কিংবদন্তী দেশ ঠিক রেখেছে কিন্তু পাত্ত নিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে।

গান্ধারী কান্দাহার থেকে এসেছিলেন। পাঠান মেয়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখেই বোধকরি মহাভারতকার তাকে শতপুত্রবীরুরূপে কল্পনা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম-অমুদরয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের ইতিহাস স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। উত্তর-ভারতের যোলটি রাজ্যের নির্মণে গান্ধার ও কান্দাহারের উল্লেখ পাই। তাদের বিস্তৃতি প্রসার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে পণ্ডিতেরা সেই রামদা দেখেন।

এ-যুগে এবং তারপরও বহুযুগ ধরে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে যে-রকম কোনো সীমান্তরেখা ছিল না, ঠিক তেমনি আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারসার মধ্যে কোনো সীমান্তভূমি ছিল না। বহু বা আমুদরয়ার উভয় পারের দেশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের অংশরূপে ধরা হয়েছে, প্রাচীন ইরানী সাহিত্যে তাকে আবার ইরানের অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে।

তারপর ইরানী রাজা সায়েরাস (কুরশ) সম্পূর্ণ আফগানিস্তান দখল করে ভারতবর্ষের সিদ্ধনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। সিদ্ধনের শাহের সিদ্ধদেশ জয় পর্যন্ত আফগানিস্তান ও পশ্চিম-সিদ্ধ ইরানের অধীনে থাকে।

সিকন্দর উত্তর-আফগানিস্তান হয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেন কিন্তু তাঁর প্রধান সৈন্যদল খাইবারপাস হয়ে পেশাওয়ারে পৌঁছান। খাইবার পেরোবার সময় সীমান্তের পার্বত্য জাতি পাথারের চূড়াত বসে সিকন্দরী সৈন্যদলকে এতই উদ্ভাত করেছিল যে গ্রীক সেনাপতি তাদের শহর গ্রাম জালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সিকন্দরের সিদ্ধজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে-রকম জোর দাগ কেটে গিয়েছে তেমনি গ্রীক অধিকারের ফলে আফগানিস্তানও ভৌগোলিক আরিয়ান, আরাকোসিয়া, গ্রেসড্রাসিয়া, পারোপানিসোস ও দাক্ষিণাসিয়া অর্থাৎ হিরাত, বলখ, কাবুল, গজনি ও কান্দাহার প্রদেশে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপ নিতে আরম্ভ করে।

সিকন্দর শাহের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তরভারতবর্ষ দখল করে গ্রীকদের মুখোমুখি হন—ফলে হিন্দুকুশের উত্তরের বালহিক প্রদেশ ছাড়া সমস্ত আফগানিস্তান তাঁর অধীনে আসে। মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত আফগানিস্তান ভারতবর্ষের অংশ হয়ে থাকে।

ভারতীয় আর্যদের চতুর্দশ ও ইরানী আর্যদের আবেস্তা একই সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু মৌর্যযুগে এক দিকে যেমন বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয় অন্যদিকে তেমনি ইরানী ও গ্রীক ভাস্কর্য শিল্প ভারতীয় কলাকে প্রায় সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। অশোকের বিজয়স্তম্ভের মসৃণতা ইরানী ও তার রসবস্ত্র গ্রীক। সে-যুগের রিষ্টান্ত ভারতীয় কলা যে নির্দশ পাওয়া যায়ছে তার আকার রূপ, গতি পঙ্কিল কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বিকাশের আশায়া পূর্ণবর্ত।

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মাতান্ত্রিক নামক শ্রমণকে আফগানিস্তানে পাঠান। সমস্ত

দেশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল কিনা বলবার উপায় নেই কিন্তু মনে হয় আফগানিস্তানের অনুরক্ত বংশাশ্রমধর্মের অন্তরায় ছিল বলে আফগান জনসাধারণের পক্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। দুই শতাব্দীর ভিতরেই আফগানিস্তানের বহু গ্রীক সিংহাসন ও তুর্ক বুদ্ধের শব্দ নিয়ে ভারতীয় সভ্যতাসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বেম-আবেস্তার ঐতিহ্য বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে কিছুটা ব্যটিয়ে রাখে।

উত্তর-আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশ মৌর্য সম্রাটদের যুগে গ্রীক সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। মৌর্যবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বলখ অঞ্চলের গ্রীকদের ভিতর অন্তর্কলহ সৃষ্টি হয় ও বলখের গ্রীকগণ হিন্দুকুশ অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকা দখল করে। তারপর পাঞ্জাবে ঢুকে গিয়ে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদের একজন রাজা মোনাদের (পালিম্বগ্রুথ 'মিলিন্দপত্রাহো' রাজা মিলিন্দ) নাকি পূর্বে পাটলিপুত্র ও দক্ষিণে (আমুনিক) করাচী পর্যন্ত আক্রমণ করেন।

মধ্য ও দক্ষিণ-আফগানিস্তান তথা পশ্চিম-ভারতের গ্রীক রাজাদের কোনো ভালো বর্ণনা পাবার উপায় নেই। শুধু এক বিষয়ে ঐতিহাসিকের তৃপ্তা তারা মেটাতে জানেন। কাবুল থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ব্রেগাম উপত্যকায় এদের তিনই হাজার হাজার মুদ্রা প্রতি বৎসর মাটির তলা থেকে বেরায়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০ রাজ্যকালের ভিতর অন্তত উনিশজন রাজা ও তিনজন কনীর নাম চিহ্নিত মুদ্রা এ-মাত্র পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর উপরে গ্রীক ও খরোষ্ঠী এবং শেষের দিকের মুদ্রাগুলোর উপরে গ্রীক ও ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজারানীর নাম পাওয়া যায়।

এ যুগে রাজারাজ্য বিস্তর বুদ্ধগিহ হ'য়েছিল কিন্তু আফগানিস্তান ও পশ্চিম ভারতের যোগসঙ্গুট আঁটে ছিল।

আবার মৌর্যগণ উপস্থিত হন। আমুদরয়ার উত্তরের শক জাতি ইউয়েচিদের হাতে পারাজিত হয়ে আফগানিস্তান ছেয়ে ফেলন। কাবুল দখল করে তারা দক্ষিণ পশ্চিম দুদিকেই ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও সিদ্ধদেশে তাদের বসতি পাকাপাকি হলে পর এই অঞ্চলের নাম সংস্কৃতে শকদ্বীপ ইরানীতে সখসান হয়। বর্বর শকের ইরানী, গ্রীক ও ভারতীয়দের সংস্পর্শ এসে কিছুটা সভ্য হয়েছিল বটে কিন্তু আফগানিস্তানের ইতিহাসে তার কিছু দিয়ে যেতে পারেনি।

শকদের হারায় ইন্দো-পার্থিয়ানরা। এদের শেষ রাজা গন্ধকারেন্দু নাকি যীও খ্রীষ্টের শিষ্য সেন্ট টমাসের হাতে খ্রীষ্টান হন। কিন্তু এই সেন্ট টমাসের হাতেই নাকি আর্সিসিসিয়ারাও হারবীরাও খ্রীষ্টান হয় ও এরই কাছে মালাবার ও তামিলনাড়ুর হিন্দুরাও নাকি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মাজাজের কয়েক মাইল দূরে এক পাথরের উপর সেন্ট টমাসের কবর দেখানো হয়।

কয়েক আফগানিস্তানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বোধকরি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু সম্রাটদের ইতিহাস ভারতে অজানা নয়। কুষণ-বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম শক এবং ইরানী পার্থিয়ানদের হারিয়ে আফগানিস্তান দখল করেন। কনিষ্ক পশ্চিমে ইরান-সীমান্ত ও উত্তরে কাশগড় খোতান, ইয়ারকন্দ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পেশাওয়ারের বাইরে কনিষ্ক যে স্থপ নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধের দেহাশ্রিত রক্ষা করেন তার জন্য তিনি গ্রীক শিল্পী নিযুক্ত করেন। সে-শিল্পী ভারতীয় বুদ্ধের নাম আফগান গ্রীক বলা কঠিন—দরকারও নেই—কারণ পশ্চিম-ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে তখনো সংস্কৃতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না।

যে-স্থপে কনিষ্ক শেষ বৌদ্ধ অধিবেশনের প্রতিবেদন তাম্রফলকে খোদাই করে রেখেছিলেন তার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। জগলানারো যে অসংখ্য স্থপ এখনো কোরে

হয়নি তারই একটার ভিতরে যদি সে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তাহলে আফগান ঐতিহাসিকেরা (৭) আশ্চর্য হবেন না। কনিষ্ঠকে যদি ভারতীয় রাজা বলা হয় তাহলে তাকে আফগান রাজা বলতেও কোনো আপত্তি নেই। ধর্মের কথা এখানে অবাস্তব—কনিষ্ঠ বৌদ্ধ হওয়ার বতপূর্বই আফগানিস্তান তখাশাতের শরণ নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে কুশাণ-রাজা পতনের পরও আফগানিস্তানে কিদার কুশাণগণ দু'শ বছর রাজত্ব করেন।

এ যুগের সবচেয়ে মহৎ বাণী গান্ধার শিল্পে প্রকাশ পায়। ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে কলা বৌদ্ধধর্মকে রূপায়িত করে তার শেষ নিদর্শন দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তার বৌদ্ধধর্মের আফগানিস্তান ও পূর্ববঙ্গীস্থানের ষষ্ঠ শতকের শিল্পে স্বরূপ। গুপ্তযুগের শিল্পপ্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা কৃষী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। ভারতবর্ষের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কখনো কখনো গান্ধার শিল্পের নিন্দা করেছে—যেদিন বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখবে সেদিন জানবে যে, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানকে পৃথক করে দেখা পরবর্তী যুগের কুসংস্কার। বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণায় ভারত অশ্বভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমিকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তী যুগে তা আর কখনো সম্ভবপর হয়নি। আফগানিস্তানের ভূগর্ভ থেকে যেমন গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বেরোলে সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের চারুকলার ইতিহাস লেখা হয়ে ভারতবর্ষকে তার ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য করবে।

ভারতবর্ষে যখন গুপ্ত-সম্রাটদের সুশাসনে সনাতনধর্ম বৈষ্ণব রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল, আফগানিস্তান তখনো বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেনি। মৌর্যদের মত গুপ্তরা আফগানিস্তান জয় করার চেষ্টা করেননি, কিন্তু আফগানিস্তানে পরবর্তী যুগের শক শাসনপতিগণ ইনবল। পঞ্চম শতকের চীন পর্যটক ফা-হিয়েন কাবুল খাবার হয়ে ভারতবর্ষে আসবার সাহস করেননি, খুব সম্ভব আফগান সীমান্তের অরাজকতা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক দূরের অনেক কঠিন রাস্তা পারির কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষ পৌছান।

তারপর বর্ষহু অতিযান ঢোকাতে গিয়ে ইরানের রাজা ফিরাজ প্রাণ দেন। হুণ অভিযান আফগানিস্তানের বহু মন্দির ধ্বংস করে ভারতবর্ষে পৌছন—গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাদের যে সব লড়াই হয় সেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে। এই হুণ এবং আফগানদের সংঘর্ষের ফলে পরবর্তী যুগে রাজপুত বংশের সূত্রপাত হয়।

সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ তামরকদ সমরকন্দ হয়ে, আমুদরিয়া অতিক্রম করে কাবুল পৌছন। কাবুল তখন কিছু হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ। ততদিনে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের নবজীবন লাভের স্পন্দন কাবুল পর্যন্ত পৌছেছিল। শান্ত ভারতবাসীই যখন বেশীদিন বৌদ্ধধর্ম সহ্যে পারল না তখন দুর্ধর্ষ আফগানের পক্ষে যে জীব দয়ার বাণী মেনে চলতে কষ্ট হয়েছিল তাতে বিশেষ সমেহ করার কারণ নেই। হিউয়েন-সাঙ কান্দাহার গজনী কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশরূপে গণ্য করেছেন।

এখন আরব ঐতিহাসিকদের যুগ। তাদের মতে আরবরা যখন প্রথম আফগানিস্তানে এসে পৌছন তখন সে-দেশ কনিষ্ঠের বংশধর তুর্কি রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু পরে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে ব্রাহ্মণ রাজ্য স্থাপন করেন। ৮৭১ সনে ইয়াকুব-বিন-লায়স কাবুল দখল করেন। শাহিয়া বংশ তখন পাঞ্জাবে এসে আশ্রয় নেন—যেখ রাজা হিলাচান পাল গজনীর সুলতান মাহমুদের হাতে ১০২১ সনে পরাজিত হন। আফগানিস্তানের শেষ হিন্দু রাজবংশের বাকী ইতিহাস কাশ্মীরে। কল্লহের রাজত্বভ্রংশিগণ্যে তাদের বর্ণনা আছে।

এখানে এসে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এক প্রকাণ্ড চেরা কাটেন। আমি পণ্ডিত নই, আমার মনে হয় তার কোনোই কারণ নেই। প্রথম আর্থ অভিযানের সময়—কিন্ধা তারও পূর্ব থেকে—আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ নানা যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একই ঐতিহ্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র অবিক্রম্য রাখবার চেষ্টা করেছে। যদি বলা হয় আফগানরা মুসলমান হয়ে গেল বলে তাদের অন্য ইতিহাস তাহলে বলি, তারা একদিন অগ্নি-উপাসনা করেছিল, গ্রীক দেবদেবীর পূজা করেছিল, বেদবিরাগী বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করেছিল। তবুও যখন দুই দেশের ইতিহাস পৃথক করা যায় না, তখন তাদের মুসলমান হওয়াতেই হঠাৎ কোন মহাভারত অন্তঃস্থ হয়ে গেল? বুদ্ধের শরণ নিয়ে কাবুলী যখন মাদ্যধারী হয়নি তখন ইসলাম গ্রহণ করে সে আরবও হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুসলিম আফগানিস্তান—বিশেষ করে কান্দাহার, গজনী, কাবুল, জলালাবাদ—বাদ দিলে ফ্রিট্যার, বামু, কোহাট এমন কি পাঞ্জাবও বাদ দিলে হয়।

পার্থক্য তবে কোথায়? যদি কোনো পার্থক্য থাকে, তবে সে শুধু এইটুকু যে, মাহমুদ-গজনীর পূর্বে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস নেই, মাহমুদের পরে প্রতিযুগে নানা ভূগোল, নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের শক্ত জমি চোরাবলির উপর তো আর ইতিহাসের ভাঙমূল খাড়া করা হয় না।

মাহমুদের ইতিহাস নতুন করে করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল-বীরুনীর কথা ব্যাধ দেবার উৎসাহ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল-বীরুনীর নাম করতে হয়। পঞ্চমত আরবী, পঞ্চমত আরবী, পঞ্চমত আরবী সে যুগে ছিল না (এখনো নেই), অল-বীরুনী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোনো মাধ্যম ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কি করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, অলম্ভকার, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্পর্কে 'তহকীক-ই-হিন্দ' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিখ্যাস্য প্রাণেলিকা।

একাদশ শতাব্দীতে অল-বীরুনী ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে লিখেছিলেন—প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় আফগানিস্তান সম্পর্কে পুস্তক লেখেননি। এক দার্শনিক ছাড়া আর পণ্ডিত পণ্ডিত কেউ আরবী ও সংস্কৃতের একক অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেননি। এই বিশ শতকেই ক'টি লোক সংস্কৃত আরবী দুই-ই জানেন আঙুলে গুণে বলা যায়।

ভারতবর্ষের পাঠান তুর্কী সম্রাটেরা আফগানিস্তানের দিকে ফিরেও আসেননি, কিন্তু আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। একটা উদাহরণ দিলেই খেতে হবে। আলাউদ্দীন খিলজীর সভাকবি আমীর খুসরু কাশ্মীরে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নাম ইরানে কেউ শোনেনি, কিন্তু কাবুলকান্দাহারে আজকের দিনেও তাঁর প্রতিপত্তি হাজির—সাদীর চেয়ে কণা নয়। 'শুকিয়া' কাব্যে দেবলা দেবী ও বিজয় খানের প্রেমের কাহিনী পড়েননি এমন শিক্ষিত মৌলবী আফগানিস্তানে আজও বিরল।

আফগানিস্তান—বিশেষ করে গজনীর—দৌত্যে উদ্ভূত-ভারতবর্ষে কাশী ভাষা তার সাহিত্যসম্পদ, বাইজিন্টাইন সেরাসীনি ইরানী ছাপতা, ইতিহাস-লিখনপদ্ধতি, ইন্দানী ভোজবিজ্ঞান, আরবী-ফার্সী শাস্ত্রভাষা ইত্যাদি প্রচলিত হয়ে, নূতন নূতন ধারা বয়ে নব নব বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। একদিন আফগানিস্তান গ্রীক ও ভারতবাসীকে মিলিয়ে দিয়ে গান্ধার-কলার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, পাঠান তুর্কী যুগে সেই আফগানিস্তান আরব-ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হাত মিলিয়ে দিল।

mone-prane-bangali.blogspot.com

তারপর তৈমুরের অভিযান।

তৈমুরের মৃত্যুর পর তার বংশধরগণ সমরকন্দ ও হিরাতে নূতন শিল্পপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আফগানিস্তানের হিরাতে অতি সহজেই তুর্কীস্থানের সমরকন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৈমুরের পুত্র শাহ-রুম চীন দেশ থেকে শিল্পী আনিয়ে ইরানীদের সঙ্গে মিলিয়ে হিরাতে নবীন চাকরকার পঙ্কন করেন। তৈমুরের পুত্রবধূ গৌহর শাদ শিক্ষাদীক্ষায় রানী এলিজাবেথ, কাথারিনের চেয়ে কোনো অংশে নান ছিলেন না। তার আপন অর্থে তৈরী মসজিদ-মাদ্রাসা দেখে তৈমুরের প্রপৌত্র বাবুর বাদশাহ চোখ ফেরাতে পারেন নি। এখানে আফগানিস্তানে যেটুকু দেখবার আছে, সে ঐ হিরাতে—যে কায়টি মিনার ইংরেজের বর্বরতা সত্ত্বেও এখনো বেঁচে আছে, সেগুলো দেখে বোকা যায় মধ্য-এশিয়ায় সর্বকালশিল্প কী আশ্চর্য প্রাণবন্তে সম্প্রদীত হয়ে এই অনূর্বব হলে কী অপরূপ মর্যাদা সৃষ্টি করেছিল।

অল-বীরানীর পর গৌহর শাদ, তারপর বাবুর বাদশাহ।

স্বোভাষ্য পণ্ডিতের নির্লজ্জ জাত্যাভিমানের চূড়ান্ত প্রকাশ হয় যখন সে বাবুরের আত্মজীবনী অপেক্ষা জুলিয়াস সীজারের আত্মজীবনীর বেশী প্রশংসা করে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মূলতরী থাক।

আফগানিস্তান ভ্রমণে যাবার সময় একখানা বই সঙ্গে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট—সে বই বাবুরের আত্মজীবনী। বাবুর কাদাহার গজলী কাবুল হিরাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আজকের আফগানিস্তানের বিশেষ তফাত নেই।

বাবুর ফরগনার রাজা নন, আফগানিস্তানের শাহানশাহ নন, দিল্লীর সম্রাটও নন। আত্মজীবনীর অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পায়, বাবুর এসবের অতীত অত্যন্ত সাধারণ মাটির-গড়া মানুষ। হিন্দুস্থানের নববর্ষার প্রথম দিনে তিনি আনন্দে অস্বীর, জলালাবাদের আখ খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ—সেই আখ আপন দেশ ফরগনায় পৌঁতবার জন্য টবে করে হিন্দুস্থানের ভিতর দিয়ে চালান করেছেন, আর ঠিক তেমনি হিরাতে থেকে গৌহর শাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা টবে করে নিয়ে এসে দিল্লীতে পুঁতে ভাবছেন এর ভবিষ্যৎ কি, এ তরু মঞ্জুরিত হবে তো?

হয়েছিল। তাজমহল।

বাবুর ভারতবর্ষে ভালবাসেননি। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে বুঝতে পেরেছিলেন, ফরগনা কাবুলের লোভে যে বিজয়ী বীর দিল্লীর তথৎ ত্যাগ করে সে মুখ। দিল্লীতে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনা করলেন তিনি আপন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু দেহ কাবুলে পাঠাবার ছুকু মিলেন মরবার সময়।

সমস্ত কাবুল শহরে যদি দেখবার মত কিছু থাকে, তবে সে বাবুরের কবর।

হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, অরঙ্গজেব। নব মৌর্য সাম্রাজ্য।

নাদির উত্তর-ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে ফেরার পথে আফগানিস্তানে নিহত হন। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য আফগান আহমদ শাহ আবদালীর (সাদদোজাহঁ দুররানী) হস্তগত হয়। ১৭৪৭ সালের সমস্ত আফগানিস্তান নিয়ে সর্বপ্রথম নিজস্ব রাজত্বকে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৬১ সালে পানিপথ। ১৭৬৩ সালে শিখদের নবজীবন।

ইতিমধ্যে মহাকাল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ভারতবর্ষে আওবলীলী আরম্ভ করেছেন। ভারত-আফগানের ইতিহাসে এই প্রথম এক জাতের মানুষ দেখা দিল যে এই দুই দেশের কোনো দেশকেই আপন বলে স্বীকার করল না। এ যেন চিরস্থায়ী তৈমুর-নাদির।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে ইংরেজ হয় আফগানিস্তান জয় করে রাজা-সম্রাট করার চেষ্টা

করেছে, আফগান সিংহাসনে আপন পুতুল বসিয়ে রুশের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আফগানিস্তান জয় করা কঠিন না হলেও দখল করা অসম্ভব। বিশেষত, ‘কাফির’ ইংরেজের পক্ষে। আফগান মোবারক অজ্ঞতা তার পাহাড়েরই মত উচ্চ, কিন্তু ইংরেজকে সে বিলক্ষণ চেনে।

ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে, ১৮৫৭ সালে আমীর দোস্ত মুহাম্মদ ইংরেজকে দোস্তী দেখিয়েছিলেন। তার চরম সৌভাগ্য যে, ১৯১৫ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমীর হাবীবউল্লাকে ভারত আক্রমণ উৎসাহিত করতে পারেন নি।

কিন্তু তিন বারের বার বেল টাকে পড়ল। আমানউল্লা ইংরেজকে সামান্য উত্তম-মধ্যম দিয়েই স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন। তাই বোধ হয় কাবুলীরা বলে ‘খুদ-দাদ’ আফগানিস্তান অর্থাৎ ‘বিশুদ্ধ’ আফগানিস্তান।

জিন্দাবাদ খুদ-দাদ আফগানিস্তান!

পনর

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে খাজমোস্তা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম।

অধ্যাক জিয়ার জাতে ফরাসী। কাজেই কায়দামাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘এর নাম আবদুর রহমান। আপনায় সব কাজ করে দেবে—জুতো বুরুশ থেকে খুনখারাবি।’ অর্থাৎ ইনি ‘হরফুন-মৌলা’ বা ‘সকল কাজের কাজী’।

জিয়ার সায়েব কাজের লোক অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনো-না-কোনো মস্তীর দপ্তরে ঝগড়া-বচসা করে কাটান। কাবুলে এরই নাম কাজ। ‘ও রডোয়া, বিকেলে দেখা হবে’ বলে চলে গেলেন।

কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবদুর রহমান—দ্বিতীয়টির কথা সময় এলে হবে।

পর ক্রিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলাম-ছফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম লম্বাশি মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নামে এসে আঙুলগুলো দু’কান্দি বর্তমান করা হয়ে বুলছে। পা দুখানা ভিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হল, আমার বাবুটি আবদুর রহমান কা হয়ে সে যদি আমীর আবদুর রহমান হত, তবে অন্যাসে গোটা আফগানিস্তানের ভার বহতে পারত। এ কান ও কান জোড়া মুখ—হা করলে চওড়াওড়ি কলা গিলতে পারে। এখণ্ডো খেবড়ো নাক—কপাল নেই। পাগড়ি থাকায় মাথার আকার-প্রকার ঠাঠর হল না, তবে আদাড় করলুম বেরি সাইজের হাটও কান অববি পৌছবে।

রঙ ফরমী, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেঁড়ে গিয়ে আফগানিস্তানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে মনে খাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে—কিন্তু কার এমন বুকের পাটা? রাজও তো মাথার কথা নয়।

পরনে শিলওয়ান, কুর্তা আর ওয়াসিকিট।

চোখ দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কাপেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কাপেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড় একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনের দিকে তাকাতো নেই, আফগানিস্তানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ভাবের যেন দুটো পা দ্বারা ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হল। এ লোকটা ভীমসেনের মত রামা তো করবেই, নিপক্ষে-আপক্ষে ভীমসেনেরই মত আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনো একটা হঠাৎসের সম্মানে মগজ আতিপাতি করে ঝুঁজতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল দার্শনিক দ্বিজেন্দ্র নাথকে কুইনিন খেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'কুইনিন ঝর সরাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সরাবে কে? কুইনিন সরাবে কে?'

তিনি কুইনিন খাননি। কিন্তু আমি মুসলমান—হিন্দু যা করে, তার উল্টো করতে হয়। তদুপরেই আবদুর রহমান আমার মেজর ডোমো, শেখদ্যা কুইজিনি, ফাই-ফরমাসা-বরদার তিনে-কুজিনি হয়ে একরারনামা পেয়ে বিভবিড় করে যা বলল, তার অর্থ 'আমার চশম, শির ও জ্ঞান দিয়ে ভজুরকে খুশ করার চেষ্টা করব।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'পূর্বে কোথায় কাজ কত্থে?'
উত্তর দিল, 'কোথাও না, পণ্টনে ছিলুম, মেসের চার্জে।' এক মাস হল খালাস পেয়েছি।
'রাইফেল চালাতে পার?'
একপাল হাসল।

'কি কি রাখতে জানো?'
'পোলাও, কুর্মা, কাবাব, ফালুদা—'
আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফালুদা বানাতো বরফ লাগে। এখানে ঝরফ তৈরী করার কল আছে?'

'কিসের কল?'
আমি বললুম, 'তাহলে বরফ আসে কোথেকে?'
বলল, 'কে, এ পাগমানের পাশাড থেকে।' বলে জানালা দিয়ে পাহাডের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু সবচেয়ে উচ্চ নীল পাহাড়ের গিয়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বরফ আসলে এটুচুতে চলতে হয়?'

বলল, 'না সায়েব, এর অনেক নিচে বড় বড় গর্তে শীতকালে বরফ ভর্তি করে রাখা হয়। এখন তাই খুঁজে তুলে গাধা বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।'
বুললুম, খবর-টবর ও রাখে। বললুম, 'তা আমার ইডিকুড়ি, বাসনকোসন তো কিছু নেই। বাজার থেকে সব কিছু কিনে নিয়ে এসো।' রাজিদের রামা আজ আর বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কাল দুপুরের রামা কোরো। সকালবেলা চা দিয়ে।
চোকা নিয়ে চলে গেল।

টাকা থাকতেই কাবুল রঙ-বা দিলুম। আড়াই মাইল রাস্তা—মুদুমধুর ঠাণ্ডায় গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছল। পথে দেখি এক পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এত বোঝা বইবার কি দরকার ছিল—একটা মুটে জাড়া করলেই তো হত।'

মা বলল, 'তার অর্থ এই, সে যে-মোট বইতে পারে না, সে-মোট কাবুলে বইতে যাবে কে?'

আমি বললুম, 'দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসতে।'
ভাব দেখে বুললুম, 'অতটা তার মাথায় খেলেনি, অথবা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি। বোঝাটা নিয়ে আসছিল জ্বালের প্রকাণ্ড ধলোতে করে। তার ভিতর ভেল-নানী-লকটি

সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আরম্ভ করলে বলল, 'সায়েব রাস্তে বাড়িতেই যাবেন।' যেভাবে বলল, 'তাতে অচিন দেশের নির্জন রাস্তায় গাইগুই করা হুস্তিমুক্ত মনে করলুম না।' 'হা, হবে হবে' বলে কি হবে ভালো করে না বুঝিয়ে হালহাল করে কাবুলের দিকে চললুম।

খুব বেশী দূর যেতে হল না। লব-ই-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পৌঁছতেই না পৌঁছতেই দেখি মসিয়ে জিয়ার টাঙ্কা হাকিয়ে টগবগবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

কলেজের বড়কর্তা বা বস হিসাবে আমাদের তিনি বেশ দু-এক প্রহ ধমক দিয়ে বললেন, 'কাবুল শহরে নিশাচর হতে হলে যে তাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে দুটোর একটাও তোমার নেই।'

বসকে খুশী করবার জন্য যার ঘটে ফর্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানির কাগজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যখন বসের উত্তমার্থ তাঁরই পাশে বসে 'উই-সার্ভেনিমা, এডিনামা, অর্থাৎ অতি অবশ্য, সার্ভেনিমা, এডিনেটলি' বলে তাঁর কথায় সায় দেন। ইংলেও মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া আলবাট আঁতঃ হয়েছিল; শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিতি-নিতি, ঘর ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবদুর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তস্বীতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে ছুঁ করে বেরিয়ে গেল। তখন রোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহিরর সময় অর্থাৎ রাত দুটোয় খাবার জুটলে জুটতে পারে।

ডব্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম তাড়ল। দেখি আবদুর রহমান মোগল তসবিরের গাডু-বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারায়ত্ত নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুললুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে মুখ কিছুদিন ধরে ধুলে আমার মুখও আফাগনিস্থানের রিলিফ ম্যাপের উচ্চনিচর টক্করের সঞ্চে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।

খানা-টোলেদের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে, আমার ভৃত্য আবা অবদুর রহমান এককালে মেসের চার্জে ছিলেন।

ভাবর নয়, ছোটখাটো একটা রামালা ভর্তি মাৎসের কোরোমা বা পেয়াজ-ঘিয়ের ঘন ঝাঞ্চে সেরখানেক মুম্বার মাসে—তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসিসি লুকাচুরি খেলছে, এক কোপে একটা আলু অপাংক্বেয় হওয়ার দুরূহে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক স্পেটে গোটা আঠেতে ফুল বোঁসাই সাইজের শামী-কাবাব। বারাকোশ পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোফত—পোলাও আর তার উপরে বসে আছে একটা আন্ত মুসি-রোস্ট।

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এগিয়ে অভয়বাণী দিল—রামাঘরে আরো আছে।

একজনদের রামা না করে কেউ যদি তিনজনদের রামা করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছ'জনদের রামা পরিবেশন করে বলে রামাঘরে আরো আছে তখন আর কি করার থাকে? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাণ্ডর।

রামা ভালো, আমার ক্ষুধাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে কিছু কম খাইনি। তার উপর আদ্য রজনী প্রথম রজনী এবং আবদুর রহমানও প্রাক্তরী কলেজের ছাত্র যে রকম তম্বয় হয়ে মড়া কাটা দেখে, সেই রকম আমার খাওয়ার রকম-বহর দুই-ই তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম, 'বাস! উৎকৃষ্ট রন্ধেই আবদুর রহমান—'

আবদুর রহমান অস্থায়ী। ফিরে এল এক থালা ফালুদা নিয়ে। আমি সবিনয় জানালুম যে, আমি নিষ্টি পছন্দ করি না।

আবদুর রহমান পুরনাপি অস্থায়ী। আবার ফিরে এল এক ভাবের নিয়ে—পেঁজা বরফের গুঁড়ায় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞাস করলুম, 'এ আবার কি?'

আবদুর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নিচে আঙুর। মুখে বলল, 'বাগেবালায় বরকী আঙুর—তামাম আফগানিস্তানে মশহুর।' বলেই একথানা সসারের কিছু বরফ আর গোট কয়েক আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণে এক-একটা করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি সন্তপণে বলে—মেয়েরা যে রকম আঙ্গুরের জন্য কাগজী নেবু পাথরের শিলে গঁথেন। বুললুম, বরফ-ঢাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মালয়েশিয়ায় কাড়ান। ওলকে তালু আর জিবের মাঝখানে একটা আঙুরে ঢাপ দিওই আমার ব্রহ্মরত্ন পর্যন্ত বিনবিন করে উঠছে। কিন্তু পাছে আবদুর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলী তাই খাবারপাসের হিম্মৎ বুকে সঞ্চয় করে গোট আটেক গিললুম। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, 'যথেষ্ট হয়েছে আবদুর রহমান, এবারে তুমি গিয়ে ভালো করে খাও।'

কফর পোয়াল, কে দেয় ধুঁয়া। এবারে আবদুর রহমান এলেন চায়ের সাজসজ্জাম নিয়ে। কাবুলী সবুজ চা। পোয়ালয় ঢাললে খতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সে চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পোয়ালয় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পোয়ালয় তিও না। তারপর আরেক তৃণ, চতুর্থ—কাবুলীয়া পোয়াল। ছয়কে খায়, অবিশা। পোয়াল সাইজে খুব ছোট, কফির পাত্রের মত।

চা খাওয়া শেষ হলে আবদুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। ভাললুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আন্ত উটের মোস্টো হাতে দিতে তুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবদুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে—ভর্তি বাদাম আর আখরার, অন্য হাতে হাতুড়ি। বীরে সুস্থে ঘরের এককোণে পা মুড়ে বসে বাদাম আখরারের খোসা ছাড়তে লাগল।

এক মুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার রামা ভজুরের পছন্দ হয়নি।'

'কে বলল, পছন্দ হয়নি?'

'তবে ভালো করে খেলেন না কেন?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য, তোমার বপুটির সঙ্গে আমার তনুটা মিলিয়ে দেখা দিকিনি—তার থেকে আন্দাজ করতে পারো না, আমার পক্ষে কি পরিমাণ বাওয়া সম্ভবপর?'

আবদুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ফের সেই কোণে গিয়ে আখরোট বাদামের খোসা ছাড়তে লাগল।

তারপর আপন মনে বলল, 'কাবুলের আবহাওয়া বড়ই ঘরাপ। পানি তো পানি নয়, সে যেন গালাগো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল তবে ভরসা হয় না আর কোনো দিন বেরবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়—আতসবাজির হুঙ্কা। মানুষের ক্ষিদে হবেই বা কি করে।'

আমার দিকে না তাকিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ভজুর কখনো পানশির দিয়েছেন?'

'সে আবার কোথায়?'

'উত্তর-আফগানিস্তান। আমার দেশ—সে কী ভায়ায়! একটা আন্ত দুশ্বা খেয়ে এক ঢোক পানি পানি খান, আবার ক্ষিদে পাবে। আবার ফিরে দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিই, মনে হবে তাজী ঘোড়ার সঙ্গে বাজী রেখে ছুটেতে পারি। পানশিরের মানুষ তো পায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের উপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।'

'শীতকালে সে কী বরফ পড়ে। মার্চ পঞ্চ পাছাড় নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা ঢাচা পড়ে গেছে। কোনো কাজ নেই, মর্য নেই, বাড়ি থেকে বেরনোর কথাই ওঠে না। আয সে কি আরাম! লোহার বারকোশে আঁঠর আলিয়ে তার উপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় ঢাচা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানলার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে—দুর্দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ষ বরাদ্দ—কি রকম বরফ পড়ে।'

আমি বললুম, 'সাত দিন ধরে জানলার কাছে বসে থাকুন?'

আবদুর রহমান আমার দিকে এমন করণ ভাবে তাকালো যে, মনে হল এ রকম বেরসিকের পাতাল্য সে জীবনে আর কখনো এতটা অপস্থ হইনি। শ্রান হেসে বলল, 'একবার আসুন, জানলার পাশে বসুন, দেখুন। পছন্দ না হয়, আবদুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।'

যেই তুলে নিয়ে বসল, 'সে কত রকমের বরফ পড়ে। কখনো সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলার মত, তারি ফাকে ফাকে আসমান জমিন কিছু কিছু দেখা যায়। কখনো ঘুরঘুরি ঘন,—চাদরের মত নেবে এসে চোখের সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনো বয় জোর বাতাস,—প্রচণ্ড বড়। বরফের পাঁজে যেন সে-বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে ঝাঁয়ে উপর নিচে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগায়—হু হু করে কখনো একমুখো হয়ে তাজী ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে। কখনো সব হুটুটে অন্ধকার, শুধু শুনতে পাবেন সো—ও—ও—তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের এঞ্জিনের শিটিং শব্দ। সেই বড়ো ধরা পড়লে রফে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, না হয় বেঁচেই হয়ে পড়বে যাবেন বরফের বিছানায়, তারই জরমে উঠবে হুহুতে উঠে বরফের কম্বল—গাদা গাদা, পাজা পাজা। কিন্তু তখন সে বরফের পাজা সত্যিকার কম্বলের মত ওম দেয়। তার তলায় মানুষকে দুর্দিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।'

'একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে—সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোব মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়, তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন গাতো একরকমি ধুলা নেই, বালু নেই, মরলা নেই। ছুরির মত ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া নাক মগজ ভালো বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভিতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, হাতি এক বিঘৎ ফুলে উঠবে—দম ফেলবেন এক বিঘৎ নেমে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক এক বছর আয়ু বাড়বে—এক একবার দম ফেলতে একশটা বোমারি বেরিয়ে যাবে।'

'তখন ফিরে এসে, ভজুর, একটা আন্ত দুশ্বা যদি না খেতে পারেন, তবে আমি আমার গৌফ কামিয়ে ফেলব। আয জা রামা করেছিলুম তার ভবল দিলেও আপনি ক্ষিনের চোটে আমায় কতল করবেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরই কাটাব।'

আবদুর রহমান গদগল হয়ে বলল, 'সে বাত বুখীর বাত হবে ঝুজুর।'
আমি বললাম, 'তোমার বুখীর জন্য নয়, আমার প্রাণ বাতাবার জন্য।'
আবদুর রহমান ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো।
আমি বুকিয়ে বললাম, 'তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানলার পাশে বসে কাটাও তবে
আমার রান্না করবে কে?'

যোল

শো' কেসে রবারের দস্তানা দেখে এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিল,
জিনিটটা কোন্‌ কাজে লাগে। দ্বিতীয় আইরিশম্যানও সেই রকম, বলল, 'জানিসনে, এ দস্তানা
পরে হাত ঝোয়ার ভারি সুমিখে। হাত জলে ভেজে না, অথচ হাত ঝেঙায়া হল।'

কুঁড়ে লোকের যদি কখনো শখ হয় যে সে ভ্রমণ করবে অথচ ভ্রমণ করার বুকি নিতে সে
নারাজ হয় তবে তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত পদ্ম কাবুলের সর্বকীর উপত্যকায়। কারণ কাবুলে
দেখবার মত কোনো বালাই নেই।

তিন বছর কাবুলে কাটিয়ে দেশে ফেরবার পর যদি কোনো সবজাস্ত্র আপনাকে প্রশ্ন
করেন, 'দেহ-আফগানান যেখানে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে নিচ্ছে তার পিছনের ডাঙা
মসজিদের মেহরাবের বা দিকে টেমপ্লেটকে ঝোলানো মেডালিওনেতে আপনি পদ্মকুলের
প্রভাব দেখেছেন?' তাহলে আপনি অম্মান বদনে বলতে পারেন 'না' কারণ ওরকম পুরোনো
কোনো মসজিদ কাবুলে নেই।

তবু যদি সেই সবজাস্ত্র ফের প্রশ্ন করেন, 'বুখারার আমীর পালিয়ে আসার সময় যে
ইরানী তসবিরের বাণ্ডিল সঙ্গে এনেছিলেন, তাতে হিরাতের জরীন-কলম ওস্তাদ বিহজাদের
আঁকা সমরকন্দেস্ত পোলো খেলার ছবি দেখেছেন?' আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন 'না' কারণ
কাবুল শহরে ওরকম কোনো তসবিরের বাণ্ডিল নেই।

পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না। যে আন্তাবলে সিন্ধুর শাহের খোড়া বাঁধা ছিল, সেখানে এখন
হয়ত বেগুন ফলছে। পণ্ডিতরা কম্পাস নিয়ে তার নিশানা লাগাতে পারলে আনন্দে বিব্বল।
কোথায় এক টুকরো পাথর বুকের কোঁকাতা চুলে আঁচাই গাছা ঘষে ক্ষয়ে প্রায় হাতের তেলের
মত পালিশ হয়ে গিয়েছে; তাই পেয়ে পণ্ডিত পঞ্চমুখ—পাড়া অস্তিত্ব করে তোলেন। এদের
কথা হচ্ছে না। আমি সাধারণ পাঁচজনের কথা বলছি, যারা দিল্লী আগ্রা সেকেন্ডার জেলাই
দেখেছে। তাদের চোখে চটক, বুক চমক লাগবার মত রসবস্তুর কাবুলে নেই।

কাজেই কাবুলে পৌঁছে কাউকে ডুকীনাচের চর্চিবাকি যেতে হয় না। পাথরফাটা রোদ্দুরে
সুধু পায় শান বাঁধানো ছ'ফালোঁঠি চত্বর ঘটাতে হয় না, নাকে মুখে চামচকে বাদুড়ের ধাবড়া
খেয়ে পচা বোটকা গন্ধে আধা ভিরমি গিয়ে মিনার-শিখর চড়তে হয় না।

আইরিশম্যানের মত দিবা হাত ঝেঙায়া হল, অথচ হাত ভিজল না।

তাই কাবুল মানোরম জায়গা। এবং সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে যে, যা কিছু দেখবার তা
বিনা মেহমতে দেখা যায়। বন্ধ-বাঁধাবের কেউ না কেউ যখন একটা বাগানে সমস্ত দিন
কাটাবার জন্য একদিন ধরে নিয়ে যাবেই।

গুলবাগ কাবুলের কাছেই—হেট্টা, টঙ্গায়া, মোটের যে কোনো কৌশলে যাওয়া যায়।

তিন দিকে উঁচুগাল, একদিকে কাবুল নদী; তাতে বাঁধ দিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা
পুকুরের মত শান্ত স্বচ্ছ করা হয়েছে। বাগানে অজস্র আপেল-নাসপাতিরা দল, নরসি ফুলের

চার, আর ঘন সবুজ ঘাস। কাপেট বানাবার অনুশ্রেষণা মানুষ নিশ্চয় এই ঘাসের থেকেই
পেয়েছে। সেই নরম তুলতুলে ঘাসের উপর ইয়ার-বস্ত্রী ভালো ভালো কাপেট পোতে
গান্ধাগান্ধা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সবরেন। পাঁচ মিনিট যেতে না-যেতে সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে
পড়েন।

দীর্ঘ তব্বতী চিনারের ঘন-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন আশ্চর্য ফিরোজা আকান।
গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবেন কাবুল পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘের ছতোপুটি। কিস্বা দেখবেন
ছতোপুটি নয়, এক পাল সাদা মেঘ যেন গৌরীশঙ্কর জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কোমর
বেধে ল্যান্ডমার্ক একজন আরেকজনের পিছনে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চুড়া পেরিয়ে ওদিকে চলে
যাবার তাদের মতলব। বীরে সুখে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটা চড়ার পর কোন্‌ এক অদ্ভুত
ন্দীরি ত্রিশুলে বা খেয়ে গিয়ে, আবার এগুচ্ছে, আবার ধাক্কা খাচ্ছে। তারপর আলো
ট্যাকটিক চালাবার জন্য দু'তিনজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বিলকূল এক হয়ে
গিয়ে নুতন করে পাহাড় বাইতে শুরু করবে। হঠাৎ কখন পাহাড়ের আড়াল থেকে আরেক
দল মেঘের চুড়ায় পৌঁছতে পেরে খানিকটা মাথা দেখিয়ে এসের যেন লজ্জা দিয়ে আড়ালে ডুব
মাঝে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিনারপল্লব, পাহাড় সব কিছু ছাড়িয়ে উর্ধ্বে অতি উর্ধ্বে
আপনারই মত নীল গালচেয়ে শুয়ে একথানা টুকরো মেঘ অতি শান্ত নহলে নিচের মেঘের
গৌরীশঙ্কর-অভিযান দেখছে—আপনারই মত। ওকে 'মেঘসূত' করে হিন্দুস্থান পাঠাবার জো
নেই। ভাবপতিক দেখে মনে হয় যেন বাবুরশাহের আমল থেকে সে এখানে শুয়ে আছে, আর
কোথাও যাবার মতলব নেই। পানিশিরের আবদুর রহমান এরই কাছ থেকে চুপ করে বসে
থাকার কায়দাটা রপ্ত করেছে।

নাকে আসবে নানা অজানা ফুলের মেশা গন্ধ। যদি গ্রীষ্মের অন্তিম নিঃশ্বাস হয়, তবে
তাতে আরো মেশানো আছে পাকা আপেল, অ্যাপ্রিকটের বাসী বাসী গন্ধ। তিন পাঁচিলের বন্ধ
হাওয়াতে সে গন্ধ পকে গিয়ে নিচি নেশার আমেজ লাগায়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে—তখন
শুনতে পারেন উপরের হাওয়ায় দোলে তরুণপল্লবের মর্ম আর নাম-না-জানা পাখির
জান-হানা-দেওয়া ক্লান্ত কূজন।

সব গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে অতি বীরে বীরে ভেসে আসবে বাগানের এক কোণ থেকে
কোন্‌—পোলাও রান্নার ভারী খুশবাহ। চোখ তন্ম্রা, জিহ্বে জল। রন্ধের সমাধান হবে হঠাৎ
ওরুম শব্দে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে মিনিটখানেক ধরে তার ত্রুটিশ্রুতি শুনেন।

কাবুলে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে বেলা ব্যারেটার কামান দাগায় শব্দ। সবাই আপন
আপন ট্যাকটিক বুলে দেখবেন—হাতখড়ির রেওয়াজ কম—ঘড়ি ঠিক চলাছে কিনা। কাবুলে
এ রেওয়াজ অলম্বনীর। ঘড়ি না-বের-করা শব্দের লক্ষণ,—'আহা যেন একমাত্র ওয়ার
ঘড়িরই চেক-আপের দরকার নেই—'

যাদের ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায় ব্যারেটা দেখানো না, তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। কাবুলের
কামান নাকি ইহজন্মে কখনো ঠিক ব্যারেটার সময় বাজেনি। কারো ঘড়ি যদি ঠিক ব্যারেটা
দেখাল তার তবে রক্ষে নেই। সকলেই তখন নিঃসন্দেহ যে, সে ঘড়িটা দাগী-ঘনী-ওদের
ঘড়ির মত বেনিফিট অব ডাউট পেতে পারে না। গান্ধার শিল্পের বুদ্ধমূর্তির চোখেমুখে যে
অপার তিতিক্ষা, তাই নিয়ে সবাই তখন সে ঘড়িটার দিকে করুণ নয়নে তাকাবেন।

বীর আত্মনা আরবী হুদে ফাসী বলতেন অর্থাৎ আমাদের দেশে উভাতায় যা রকম
সংস্কৃতির তেলে ডোবানো পসপসে বাজনা বলে থাকেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাত

‘চহার-মগজ্ শিকনা’ কি বস্তু তস্যা সন্ধান করিয়াছ কি?’

আমি বললুম, ‘চহার’ মানে ‘চারা’ আর ‘মগজ্’ মানে ‘মগজ্’ ‘শিকন্তনা’ মানে ‘টুকরো টুকরো করা।’ অর্থাৎ যা দিয়ে চারটে মগজ্ ভাঙা যায়, এই আখরী ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কিছু হলে আখরী কি?’

মীর আসলম বললেন, ‘‘চহার-মগজ্’’ মানে ‘চতুর্মস্তিক্’ অতি অবশ্য সত্য, কিন্তু যোগ্যব্যুত্থে ঐ বস্তু অফোট অথবা আখরোট। অতএব ‘চহার-মগজ্-শিকনা’ বহির্ভূত শব্দ লোহার হাতুড়ি বোঝায়।’ তারপর দাণীঘড়িওয়াল। প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আয় বরাদরে আজীজে মন, হে আমার প্রিয় ভাতা যোগ্যব্যুত্থে ঘটিকায়ন্ত অর্থ ধর্মত কার্যত যে দ্রব্য ‘চহার-মগজ্-শিকনা’ সে বস্তু তুমি তোমার যাবনিক অঙ্গরকার আন্তরগ মধ্য পরম প্রিয়তমার ন্যায় বক্ষ-সলগ্নু করিয়ে রাখিয়াছ কেন? অশিত পশ্য, পশ্য, অদূরে উদ্যানপ্রান্তে পরিচারকবৃন্দ উপযুক্ত বস্ত্রাভাবে উপলব্ধ ও দ্বারা অক্ষরোতি ভগ্ন করিবার চেষ্টায় গলদধর্ম হইতেছে। তোমার হৃদয় কি ঐ উপলব্ধির ন্যায় কঠিন অথবা বজ্রদণ্ডি কঠোর?’

দাণী ঘড়ি রাখা এমন ভয়ঙ্কর পাপ যে, প্যারিসফের্তা বাকচতুর সইফুল আলম পর্যন্ত জুতসই উত্তর দিতে পারলেন না। সাদামাটি কি একটা বিড় বিড় করলেন যার অর্থ ‘এক মাথে শীত যায় না।’

মীর আসলম বললেন, ‘ঐ সহস্র হস্ত পর্বতশিখর হইতে তথাকথিত দ্বাদশ ঘটিকার সময় এক সনাতন কামান ধুম উদগিরণ করে-কখনো তজ্জনিত শব্দও কাবুল নাগরিকরাজির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শুনিয়াছি, একদা দ্বিপ্রহরে তেপতী লক্ষ্য করিল যে, বিস্ফোরকচূর্ণের আননে। কনিষ্ঠ ভাতাকে আদেশ করিল সে যেন নগরপ্রান্তরে অস্ত্রশলা হইতে প্রয়োজনীয় চূর্ণ আহরণ করিয়া লইয়া আইসে। কনিষ্ঠ ভাতা সেই সহস্র হস্ত পরিমাণ পর্বত অবতরণ করিল, শ্রান্তি দূরার্থে বিপথি মধ্যে প্রবেশ করত অর্থাধিক পাত্র চৈনিক মুখ পান করিল, প্রয়োজনীয় ধুমচূর্ণ আহরণ করত পুনরায় সহস্রাধিক হস্ত পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। বীকার করি, অগ্রস্তু দিবালালিত সেইদিন নাগরিকবৃন্দ কামান ধনি শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু ভাতা সইফুল আলম, সেইদিনও কি তোমার ‘চহার-মগজ্-শিকনা’ কটকে কটকে দ্বাদশ ঘটিকার লঙ্ঘন অঙ্কন করিয়াছিল?’

আমি বললুম, ‘এ রকম ঘড়ি আমাদের দেশেও আছে—তাকে বলা হয়, ‘আব-পাড়ার ঘড়ি।’ সইফুল আলম আর মীর আসলম ছাড়া সবাই জিজ্ঞেস করলেন ‘ঐব’ কি? সইফুল আলম বোঝাই হয়ে প্যারিস যওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু মীর আসলম?

তিনিই বললেন, ‘আম’ অর্থাৎ সুসাল্য ভারতীয় ফলবিশেষ। ব্রাহ্ম আয়ের মধ্যে কাহাকে রাজমুকুট দিব সেই সমস্যা এ যাবৎ সমাধান করিতে পারি নাই।’

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ‘কিন্তু আপনি আম কেনে কোথায়?’

মীর আসলম বললেন, ‘চতুর্দশ বৎসর হিন্দুস্থানের দেওবন্দ রামপুরে শাস্তাধ্যয়ন করিয়া অন্য যোমার নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিতে পাই। কিন্তু শোকাতুর হইব না, লক্ষ্য করিয়াছি তোমার জানতৃষ্ণা প্রবলা। শুভলগ্নে একদিন তোমাকে ভারত-আফগানিস্থানের সংকটগত যোগাযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিব। উপস্থিত পঞ্চাদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে তোমার অনূগত ভৃত্য আবদুর রহমান খান তোমার মুখাবিন্দ দর্শনাকাক্ষায় ব্যাকুল হইয়া দগুয়মান।’

কী আপদ, এ আবার জুটল কোথেকে?

দেখি হাতে লুপ্তি ত্যাগালে নিয়ে দাড়িয়ে। বলল, ‘খানা তৈরী হতে দেবী নেই, যদি পোসল করে নেন।’

হায়ারদোস্তের দুচারজন ততক্ষণে বাঁধে নেমেছে। সবাই কাবুল-বান্দী, সাতার জানেন না, জলে নামলেই পাথরবাতি। মাত্র একজন চতুর্দিক হাত-পা ঝুঁড়ে, বারিমস্তনে পোয়লন্দী জাহাজকে হার মানিয়ে বিপুল কলরবে ওপারে পৌঁছে হা পাচ্ছেন। এপারে অফুরন্ত প্রশংসাধ্বনি, ওপারে বিরতি আত্মপ্রসাদ। কাবুল নদী সেখানটায় চওড়ায় কুড়ি গজও হবে না।

কিন্তু সেদিন গুলবাগে কামাকাটি পড়ে গিয়েছিল। কাবুলীরা কখনো ডুব-সাতার দেখেনি। ঐ এককিয়ারই এপার-ওপার সাতার কেটেছিলুম। ও রকম ঠাণ্ডা জল আমাদের দেশের শীতকালের রাতদুপুরে পানাতসা এঁদো পুকুরেও হয় না। সেই দু’মিনিট সাতার কাটার খোঁসারিই দেখেছিলুম খাড়া একফটা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, দাঁতে দাঁতে কস্তাল বাজিয়ে, সম্মাঞ্চে অশথপাতার কাঁপন জাগিয়ে।

মীর আসলম অভয় দিয়ে বললেন, ‘বরফলা জলে নাইল নিমোয়নিয়ার ভয় নেই।’ আমি সায়ে দিয়ে বললুম, ‘মানসসরোবরে ডুব দিয়ে যখন মানুষ মরে না, তখন আর ভয় কিসের?’ কিন্তু বুঝতে পারলুম বস্তু দিয়ে কাম রাও মেসোজী মানসসরোবরে ডুব দেবার পর কেনে তিন ঘটা ধরে রোদ্দুরে ছুটোছুটি করেছিলেন। মানস বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি কাবুল সাত হাজারও হবে না।

কিন্তু সেদিন মীর আসলম আর সইফুল আলম ছাড়া সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমি মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় তখনো প্রাণের ভয়ে কাঁপছি। ‘শেষায় বিরক্ত হয়ে বললুম, ‘আবার না হয় ডুব-সাতার দেখাখি।’

সবাই ‘হাঁ হাঁ’ কর কি বলে ঠেকালেন। অবশ্য মৃত্যুর হাত থেকে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের জান বাচানো অলঙ্কারী কতব্য।

তিন টুকরো পাথর, বাগান থেকেই কুড়ানো শুকনো ডাল-পাতা আর দুচারটে হাড়িবাগন দিয়ে উত্তম রান্না করণ কায়দায় ভারতীয় আর কাবুলী রাধুনীতে কোনো ভগাত নেই। বিশেষত মীর আসলম উনিবিশ শতাব্দীর ঐতিহ্য গড়ে-ঠাণ্ডা পণ্ডিত। অর্থাৎ গুরুগুর ধাককার সময় ইনি রান্না করতে শিখেছিলেন। তাঁর তদারকিতে সেদিনের রান্না হয়েছিল যেন হাফিজের একখানা উৎকৃষ্ট গজল।

যখন যম ডাঙলো, তখন দেখি সমস্ত বাগান নাক ডাকাচ্ছে—একমাত্র ইঁকোটা ছাড়া। তা আমারো যতক্ষণ জেগেছিলুম, সে একরহমার তরেও নাক ডাকানোতে কামাই দেয়নি। কিন্তু কাবুলী তামাক ভাঙলক্ষর তামাক—সাক্ষাৎ পেপ্পার মারা গুলী। প্রজ্ঞাদকে হাতীর পায়ের তলায়, পাহাড় থেকে ফেলে, পাশা চাপা দিয়ে মারা যাবনি, কিন্তু এ তামাকে তিনি দুটি দম দিলে আর দেখতে হত না। এ তামাক ভাতা ভালো, কিন্তু সে তামাককে ম্যোলালেন কলার জন্য চিটে-গুরের ব্যবহার কাবুলীরা জানেন না, আর মিষ্টি-গরম থিকিথিকি আঙনের জন্য টিকে বালাবার কায়দা তারা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি।

পড়ন্ত রোদে দীর্ঘ তরুর দীর্ঘতর ছায়া বাগান জুড়ে ফালি ফালি দাগ কেটেছে। সবুজ কালোর ডোরাকাটা নাদসুন্দর জেয়ারত বদ বাগাননা নিশিদি মনে ঘুমচ্ছে। নরগিস ফুল ফোটার তখনো অনেক দেবী, কিন্তু চারা-ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা যেন রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাড়া হয়ে উঠেছে। কপ্পনা না সত্যি বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল যেন অল্প অল্প গঙ্গা সে দিক থেকে এসে আসছে। রাহিগে যে খুশায়ীয়ের মজলিস বসবে, তারি মোহভার সেতাবে যেন অল্প অল্প পিডিং পিডিং মিঠা বেল ফুটে উঠছে। জলে ছাওয়ায়, মিটে

হাওয়ায়, সমস্ত বাগান সুশাস্যামলিস, অথচ এই বাগানের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার ফুট উঁচু কানো নেভা পাথরের খাড়া পাথড়। তাতে এক ফোঁটা জল নেই, এক মুঠো ঘাস নেই। বৃকে এককন্ঠি দয়া-মায়ায় চিহ্ন নেই—যেন উল্লগ্ন সাধক মাথায় মেঘের জটা বেঁধে কোনো এক মন্তস্তব্যান্যী কঠোর সাধনায় মগ্ন।

পদপ্রান্তে গুলনাগের সবুজপর্ষী কেঁদে কেঁদে কাবুল নদী ভরে দিয়েছে।

ফকীরের সেদিকে ভ্রুকণ নেই।

বাড়ি ফিরে কোনো কাজে মন পেল না। বিছানায় শুয়ে আবদুর রহমানকে বললুম, জানলা খুলে দিত। দেখি পাহাড়ের ডুড়ায় সপ্তর্ষি। ‘আজ’ বলে চোখ বন্ধ করলুম। সমস্ত দিন দেখেছি আজনা ফুল, আজনা গাছ, আজনো মানুষ, আর অজেনো চেয়েও পীড়াদায়ক অপ্রিয়দর্শন শুষ্ক কঠিন পর্বত। হঠাৎ চেনা সপ্তর্ষি দেখে সমস্ত দেহমন ভুড়ে দেশের চেনা ঘর-বাড়ির জন্য কি এক আবুল আগ্রহের আব্বাবু ছড়িয়ে পড়ল।

স্বপ্নে দেখলুম, মা এয়ার নামাজ পড়ে উত্তরের দাওয়ায় বসে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছেন।

সতর

কাবুলে দুই নম্বরের দ্রষ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশীর পুরানো বাজার যারা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সরু রাস্তা, দুদিকে বুরু—উঁচু ছোট ছোট থোপ। পানের দোকানের দুই বা তিন-ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাজার জালার মত কঙ্কা লাগানো, রাস্তা তুলে দিয়ে দোকানে নিচের আধখানা বন্ধ করা যায়—অনেকটা ইংরাজীতে থাকে বলে ‘পুজি আপ দি শাটার’।

বৃকের নিচ থেকে রাস্তা অবধি কিংবা তারো কিছু নিচে দোকানেরই একতলা গুদাম-ঘর, অথবা মুতীর দোকান। কাবুলের যে কোনো বাজারে শতকরা ত্রিশটা দোকান মুতীর। পেশাওয়ারের পাঠানরা যদি হুগোকেবদিন খুঁতাতো লোহা পোঁতায, তবে কাবুলে তিন দিন। বেশীভাগ লোকেরই কাজ-কর্ম নেই—কোনো একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে বসে দোকানীর সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণ নিচের অথবা সামনের দোকানের একতলায় মুতী পয়জার গোটা কয়েক লোহা ঝুঁকে দেয়।

আপনি হয়ত ভাবছেন যে, দোকানে বসলে কিছু একটা কিনতে হয়। আদেপেই না। জিনিসপত্র বেচার জন্য কাবুলী দোকানদার মাটেই ব্যস্ত নয়। কুইক টার্নওভার নামক পাগলা রেসের রেওয়াজ প্রাচ্যদেশীয় কোনো দোকানে নেই। এমন কি কলকাতা থেকেও এই গদাইলেক্সরী চাল সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। চিংপূরের শালওয়লা, বড় বাজারের আতরওয়লা এখনো এই আরামদায়ক ঐতিহ্যটি বজায় রেখেছে।

সুখদ্রুতের নানা কথা হবে—কিন্তু পলিটিং ছাড়া। তাও হবে, তবে তার জন্য দোস্তি ভালো করে জমিয়ে নিতে হয়। কাবুলের বাজার ভয়ঙ্কর ধূর্ত—তিনিদিন যেতে না যেতেই তামাম বাজার জেনে যাবে আপনি ব্রিটিশ লিগেশনে ঘন ঘন গভায়াত করেন কিনা—ভারতবাসীর পক্ষে রাশিয়ান নৃত্যবাস অথবা আফগান ফরেন আপিসের গোয়েন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। যখন দোকানী জানতে পারে যে, আপনি হাউ—পলিটিং নিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় খেলাখুলা করেন না, তখন অন্যান্যক ‘বাজার গণ’ বলতে তার আর

বাধেব না। আর সে অপর্য গণ—বল—শেভিক তুর্কীস্থানের শত্রী-স্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে, পেশাওয়ারের জানকীবাপক ছাড়িয়ে দিল্লীর বড়লতের বিদিশায়েবের বিনে পয়দায় হীরা-পায়া কেনা পর্যন্ত। সে সব গল্পের কতটা গাঁজা কতটা নীট ঠাঠর হবে কিছুদিন পরে, যদি নাক-কান খোলা রাখেন। তখন বাদ দরকসর টাকায় বারো আনা, চোদ্দ আনা ঠিক ঠিক ধরতে পারবেন।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের পক্ষে এই ‘বাজার গণ’ অতীব অপরিহার্য। মোগল ইতিহাসে, পড়ছি, দিল্লীকে বরসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র করে এককালে সমস্ত ভারতবর্ষ এমন কি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তুর্কীস্থান ইরান পর্যন্ত ভারতীয় ভক্তির তাঁবেতে ছিল। গুণীদের মুখে শুনেছি, বাজনার রাজা জগৎশেঠের হাণ্ড দেখলে বুঝার খান পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে কাঁচা টাকা চলে দিতেন। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ব্যবসা চালু রাখার জন্য ভারতীয় বণিকদের আপন আপন ভাপ পাঠাবার বদোবস্ত ছিল। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। হয়ত দিল্লীর শাহনশাহ আহমদাবাদের সুবেদারের (গভর্নর) উপর বীরতাপ হয়ে তাকে ডিসমিসের ফরমান জারি করলেন—সে ফরমান আহমদাবাদ পৌঁছেতে অশ্রুত দিন সাতকে লাগার কথা। ওদিকে সুবেদার হয়ত দু’হাজার ঘোড়া কেনার জন্য আহমদাবাদী বেনেদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছে—ফরমান পৌঁছেলে সুবেদার প্রত্যাষ্ট দিল্লী রওনা করেন। সে টাকটা বের করতে বেনেদের তখন ভয়ঙ্কর বেগ পেতে হত—সুবেদার বাদশাহকে খুশী করে নুতন সুবা, নিদেনপক্ষে নুতন জায়গীর না পেলে সে টাকটা একেবারেই মারা যেত।

তাই যে সন্ধ্যায় বাদশা ফরমানে মোহর বসালেন, সেই সন্ধ্যাই বেনেদের দিল্লীর হৌস থেকে আপন ডাকের মোড়সওয়ার ছুটতে আহমদাবাদে। সেখানকার বিচ্ছন্ন বেনে বাদশাহী ফরমান পৌঁছবার পূর্বেই সুবেদারের হিসেবে ঢেরা কেটে দিত—পাওনা টাকা যতটা পারত উত্তল করত—নুতন ওভারড্রাফট কিছুতেই দিত না ও দরকার হলে দেবার দায় ওড়াবার জন্য হঠাৎ পালিতাযার ‘তীর্থফ্রাফ’ চলে যেত। তিনিদিন পর ফরমান পৌঁছেলে পর সুবেদারের চোখ খুলত। তখন বুঝতে পারতেন বেনে হঠাৎ ধর্মানুরাগী হয়ে পালিতাযার কেন্দ্র তীর্থ ফ্রাফে চলে গিয়েছিল।

আফগানিস্তানে এখনো সেই অবস্থা। বাদশা কাবুলে বসে কখন হিরাত অথবা বদখশান সুবার কোন্ কর্ণধারের কর্ণ কর্তন করলেন, তার খবর না জেনে বড় ব্যবসা করার উপায় নেই। তাই ‘বাজার গণের’ ধারা কখন কোন্‌দিকে চলে, তার দিকে কড়া নজর রাখতে হয়, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফিল্টার বদী আপনার থাকে, তবে সেই মোলটে ‘গণ’ থেকে খাঁটি-তত্ত্ব বের করে আর দলজনের চেয়ে বেশী মূল্যাক করতে পারবেন।

আফগানিস্তানের ব্যাটিকং এখনো বেশীভাগ ভারতীয় হিন্দুদের হাতে। ভারতীয় বলা হয়ত ভুল, কারণ এদেশে প্রায় সকলেই আফগানিস্তানের প্রজা। এদের জীবনযাত্রার প্রণালী, সামাজিক সংগঠন, পালাপত্তর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো গবেষণা করেননি। আশ্চর্য বোধ হয়। মরা বারোবোদুর নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়ে, একই ফোটাগ্রাফের সম্মুখো হাজা-ভোঁতা প্রিন্ট দেখে সহের সীমা পেরিয়ে যায়, কিন্তু এই জায়ন্ত ভারতীয় উপনিবেশ বিশ্বকে বৃহত্তর ভারতের পাণ্ডুরে কোনো অনুসন্ধান কোনা আত্মীয়তাবোধ নেই।

মৃত বারোবোদুর গোত্রভুক্ত, জীবন্ত ভারতীয় উপনিবেশ অপাত্যৎক, ব্যাট। ভারতবর্ষের সধবারা তাজা মাছ না খেয়ে ষ্টিকি মাছের কাঁটা দাঁতে লাগিয়ে একাদশীর দিনে সিথির সিঁদুর অক্ষয় রাখেন।

কাবুলের বাজার পেশাওয়ারের চেয়ে অনেক গরীব, কিন্তু অনেক বেশী রতীন। কম করে

অন্ততঃ পঁচিশটা জাতের লোক, আপন আপন বেশভূষা চালচলন বজায় রেখে কাবুলের বাজারে বেচাকেনা করে। হাজার, উজবেগ (বাঙলা উজবুক), কাফিরিস্থানী, কিজিলবাস (ভারতভ্রম্যে কিজিলবাসের উল্লেখ আছে, আর টাকাকার তার অর্থ করেছেন 'একরকম পদ')! মল্লোগা, কুর্দ এদের পাগড়ি, টুপি, পুস্তিনের জোশা, রাইডিং বুট দেখে কাবুলের লোকান্দার এক মুহূর্তে এদের দেশ, বাবসা, মুনাফার হার, কল্লুশ না দরাজ-হাত চট করে বলে দিতে পারে।

এই সব পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তারা নিরীকার চিত্তে রাস্তা দিয়ে চলে। আমরা মাড়োয়ারী কিংবা পাঞ্জাবীর সঙ্গে লেনদেন করার সময় কিছুতই ভুলতে পারি না যে, তারা বাঙালী নয়—দুপশা ন্যাত করার পর কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, হোটেল ভেঙে নেওয়ার নেওয়ায় পর্যন্ত নেই। এখানে ব্যবসা—বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত।

স্বপ্নময় লোকঘাটা। খাস কাবুলের বাসিন্দারা চিৎকার করে একে অন্যকে আল্লারসুলের ডরতয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশীরা খতর গাধা ঘোড়ার পোকে সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ফাসীতে দরকসর করছে, বুখারায় বড় কারাবারী ধীরে গভীরে দোকানে ঢুকে এমনভাবে আসন নিচ্ছে যে, মনে হয় বাকী নিন্তা ঐখানেই বেচাকেনা, চা-ভামাক-পান আর আহরাদি করে রাস্তে সরাইয়ে কিরবে—তার পিছনে চাকর ঝুঁকলকি সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে। তারও পিছনে খচর—বোআই বিদেশী কার্পেট। আপনি উঠি উঠি চকিচ্ছিনে, দোকানদার কিছুতেই ছাড়বে না। হয়ত মোটা রকমের ব্যবসা হবে, বুদা মেহেরবান, ব্যবসা—বাণিজ্যের উপর রসুলেরও আশীর্বাদ রয়েছে, আপনারও যখন ভয়কর তড়া নেই, তখন দাওয়াতা খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তায় অনেককে একেজো ছেলে—মেয়ে ঘোরাবুরি করছে—তাদেরই একটাকে ভেঁকে বলবে, ও বাচ্চা, চাওয়ালাকে বলতো আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে যেতে।

তারপর সেই সব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ, কত চিত্রবিচিত্র নয়া কী মোলায়েম স্পর্শসুখ। কার্পেট—শাওজ আগাধ শাস্তা—তার কুল—কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অন্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রি হয়, তাদের আবার নিজের জাতের ভিতরে বহু গোত্র, বহু বর্ণ। জম্মুভূমি, রঙ, নয়া, মিলিয়ে সরেস সরেস মালের বাহ—বিচার হয়। বিশেষ রঙের নয়া বিশেষ উৎকৃষ্ট পশম দিয়ে তৈরি হয়—সে মালের সস্তা জিনিস হয় না। এককালে বেনারসী শাড়িতে এই ঐতিহ্য ছিল—আভিবলি শাড়ির বিশেষ নয়া উৎকৃষ্ট রেশমেই হত—সে নয়ায় নিরেস মাল দিয়ে ঠেকবার চেষ্টা ছিল না।

আজকের দিনে কাবুলের বাজারে কেনবার মত তিনটে ভালো জিনিস আছে—কাপেট, পুস্তিন আর সিদ্ধ। ছোটখাটো জিনিসের ভিতর হাতুর সমোভার আর জড়োয়া পয়জার। বাদবাকী বিলাতী আর জাপানী কলের তৈরি সস্তা মাল, ভারতবর্ষ হয়ে আফগানিস্তানে ঢুকছে।

কাবুলের বাজার ক্রমেই গরীব হয়ে আসছে। তার প্রধান কারাগ ইরান ও রুশের নবজাগরণ। আমদুরিয়ার ওপারের মালে বাধ দিয়ে রাশানরা তার স্রোত মস্কোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, ইরানীরা তাদের মাল সোজাসুজি ইরাজে অথবা রাশানকে বিক্রি করে। কাবুলের পয়শা কমে গিয়েছে বলে সে ভারতের মাল আসে সে পরিমাণে কিনতে পারে না—আমাদের শ্রেয় মলমল মসলিন শিল্পেরও কিছু মরমর, বেশীরাধা জি ইরাজে সাত হাত মাটির নিচে কবর দিয়ে শ্রাদ্ধশাস্তি করে চুকিয়ে দিয়েছে।

mone-prane-bangali.blogspot.com

বাবুর বাদশা কাবুলের বাজার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বস্ত্র জাতের ভিড়ে কান পেতে যে-সব ভাষা শুনেছিলেন, তার একটা ফিরিস্তিও তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন;—

আরবী, ফার্সী, তুর্কী, মেগলী, হিন্দী, আফগানী, পশাদ, প্রাচী, গেবেরী, বেরেকী ও লাগমানী।

‘প্রাচী’ হল পূর্ব—ভারতবর্ষের ভাষা, আমোখা অঞ্চলের পূর্ববীয়া—বাঙলা ভাষা তারই আওতায় পড়ে।

সে সব দিন গেছে; তামাম কাবুলে এখন যুক্তপ্রদেশের তিনজন লোকও আছে কিনা সন্দেহ।

নবু প্রাণ আছে, আনন্দ আছে। বাজারের শেষপ্রান্তে প্রকাণ্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নবজাগের পর সমস্ত মধ্যাহ্ন্য কাজকর্মে ইত্তাফা দিয়ে বেঁচে থাকার মূল চৈতন্যবোধকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ দিয়ে চাফা করে তোলে। মল্লোগার পিঠে কন্দুক ধুলিয়ে, ভারি রাইডিং বুট পরে, বাবরী চুলে ডেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সরাই-চতুর নাচতে আরম্ভ করে। বুটের ধমক, তালে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কল্লু শহরের চতুর্দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত করে তীব্র করে আনন্দকর ভাষা। পারের মল্লোগাল সমীত। থেকে থেকে নাচের তালের সঙ্গে কাঁকনি দিয়ে মাথা নিচু করে দেয়, আর কানের দুপাশের বাবরী চুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয় তিন হাত উৎসর্গে উঠে শূন্য দুপা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে, আর দুহাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনের দিকে ঠেলে বাবরী চুল দিয়ে জামা ঢেকে দেয়। কখনো কোমর দু’ভাজ করে নিচু হয়ে বিনশিত করে আস্তে আস্তে হাততালি, কখনো দুহাত শূন্য উৎক্লিণ করে ঘূর্ণি হাওয়ার চর্চিবাজী। সমস্তরূপ চকুর ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার এই সমস্ত হটগোল উপেক্ষা করে দেখবেন, সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরানী কানের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজনার সঙ্গে হাকিজের গজল গাইছে। আর পাঁচজন চোখ বন্ধ করে বৃন্দ হয়ে দূর ইরানের গুল বুলবুল আর নিদ্রীয়া নিদ্রা প্রিয়ার ছবি মনে মনে ঝাঁক নিচ্ছে।

আরেক কোণে গীর-দরবেশ চায়ের মজলিসের মাঝখানে দেশ-বিদেশের ভ্রমণকাহিনী, মেশেদ—কারাগার, মক্কা—মদিনার তীর্থের গল্প বলে যাচ্ছেন। কান পেতে সবাই শুনাচ্ছে, বুড়োরা ভাবছে কবে তাদের উপর আল্লার করুণা হবে, মৌলা থেকে তাদের মদিনায় ডেকে নিয়ে যাবেন, প্রাণ তো ওষ্ঠাগত,—

নাহৌ পর হৈ দম আয় মুহম্মদ সমহালে,
মেয়ে মৌলা মুখে মলিনে বোলা লো!

ঠোঁটের উপর দম এসে গেছে বাঁচাও, মুহম্মদ,
হে প্রভু আমার ডাকো মদিনায়, ধরেছি তোমার পদ।

পুস্তিন ব্যবসায়ীর কুঠরিতে কবির মজলিস। অজতশমশু সুনীল গুফর, কাজল-চোখে, তরুণ কবি মোমবাতির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তুলোটা কাগজে লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। তাঁর এক পদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তামাম মজলিস একগাল পদের পুরাবৃত্তি করছে—মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে মরহাবা, আফগানী, শাব্বা বলে উত্কটকণ্ঠে কবির তারিফ করছে।

চার সদরজীতে মিলে একটা পুরানো গ্রামোফোনে নাখের মতো পাঁচশ তিনখানা রেকর্ড
ঘুরিয়ে বাজাচ্ছে—

হরদী বোতলী
ভরদী বোতলী
পাঞ্জাবী বোতলী
লাল বোতলী

হায়, কাবুলে বোতল বারণ। কে জানত, শ্রবণেও অর্ধপান!
আর আসল মজলিস বসেছে কুহিন্থানের তাজিকদের আড্ডায়। হেঁড়ে গলায়
আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, দেয়াল-পাথর ফাটিয়ে কোরাস গান,

আয় ফতু, জানে মা—
ফতুজান,
ফতুজান,
বর তু শওম কুরবান—।।।।

কুরবানের 'আ' দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব, অবস্থা ভেদে—সম মেলাবার জন্য। উচ্চারণের কাবাস্টি
নয়, তবু দরদ আছে,

ওগো ফতুজান,
তুঁহার লাগিয়া দিল-জান দিয়া
হব আমি কুরবান!

উত্তরে ফতুজান যেন অবিশ্বাসের সুরে বলছেন,

—চেরা রফতী
হীচ নু ওফতী
দুর হিন্দুস্থান?

অর্থাৎ—

কেন গেলে
আমায় ফেলে
দুর হিন্দুস্থান?

সহস্রপাদ বৈষ্ণব পদাবলীতে যখন এ-প্রশ্নের উত্তর নেই, তখন তাজিক ছোকরার
লোক-সঙ্গীতে তার উত্তরের আশা করেন কোন অভিনব মশ্‌মট? মধুরার সিংহাসন জয়
হিন্দুস্থানে রাইফেল ক্রয়, দুটোই বদখশ বেতলা উত্তর। হাজারো যুক্তি দিয়ে গীতা বাণিয়ে
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু মধুরাজয়ের যুক্তির হাল যমুনায়ে পানি
পাবে না বলেই তিনি সেটা ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধার দরবারে পেশ করেননি।

বল্‌হীকের বল্লাভও তাই নীরব।

আঠার

কাবুলের সামাজিক জীবন তিন হিস্যায় বিভক্ত। তিন শরিকে মুখ দেখাশোদি নেই।

পয়লা শরিক খাস কাবুলী; সে-ও আবার দু'ভাগে বিভক্ত—জানানা, মর্দনা। কাবুলী
মেয়েরা কটর পর্দার আড়ালে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে নিকট-আত্মীয় ছাড়া, দেশী-বিদেশী
কারো আলাপ হওয়ার জো নেই। পুরুষের ভিতরে আবার দু'ভাগ। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের
মোস্তা সশ্রদ্ধায়, আর অন্যদিকে প্যারিস-বার্লিন-মস্কো ফের্তা এবং তাঁদের ইয়ার-বরীতে
মেশানো ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা ভরুগ সম্প্রদায়। একে অন্যকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু মুখ
দেখাশোদি বন্ধ নয়। কারণ অনেক পরিবারেই বাপ মশাই, বেটা মসিয়ো।

দুসরা শরিক ভারতীয় অর্থাৎ পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ারের মুসলমান ও ১৯২১ সনের খেলাফৎ
আন্দোলনের ভারতত্যাগী মুহাজিরগণ। এঁদের কেউ কেউ কাবুলী মেয়ে বিয়ে করেছেন বলে
শ্বশুরবাড়ির সমাজের সঙ্গে এরা কিছু কিছু যোগাযোগ ধাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিসরা শরিক ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুশ ইত্যাদি রাজদূতবাস। আফগানিস্তান ক্ষুদ্রে
গরীব দেশ। সেখানে এতগুলো রাজদূতের ভিড় লাগবার কোনো অর্থনৈতিক কারণ নেই,
কিন্তু রাজনৈতিক কারণ বিস্তর। ফরাসী জার্মান ইতালী তুর্ক সব সরকারের দূতবাসাস,
ইংরেজ-রুশের মোয়ের লড়াই একদিন না একদিন হয় খাবারপাসে, নয় হিন্দুক্বে লাগবেই
লাগবে। তাই দুদলের পায়তারা কবার খবর সরজমিনে রাখার জন্য একগাধা রাজদূতবাস।

তবু পয়লা শরিক আর দুসরা শরিকে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়। দুসরা শরিকের
অধিকাংশই হয় কারবারী, নয় মাস্টার প্রোফেসর। দুদলের সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকা
অসম্ভব। কিন্তু পয়লা ও তেসরা ও দুসরা-তেসরাতে কখনো কোনো অবস্থাতেই যোগাযোগ
হতে পারে না।

যদি কেউ করার চেষ্টা করে, তবে সে স্পাহী।

মাত্র একটি লোক নির্ভয়ে কাবুলের সব সমাজে অব্যাহত গতায়ত করতেন। বগদাদফ
সায়েরের বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম লোভ মুহম্মদ খান—জাতে খাস
পাঠান।

প্রথম দিনের পরিচয় শেকহাও করে ইরিরজী কায়দায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হাও ডু ইয়ু ডু?'
দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রাত্তায়। দুয়ের থেকে কাবুলী কায়দায় সেই প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে
গেলেন, 'খুব হাতী, জোর হাতী, ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভালো আছেন তো, মস্তাল তো, সব ঠিক
তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?'

তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁর বাড়িরই সামনে। আমাকে দেখা মাত্র চিৎকার করে বললেন,
'বফরমাইদ, বফরমাইদ' (আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক), কদমে তান মবারক
(আপনার পদদ্বয় পূতপত্রি হোক), চশমে তান রওশন (আপনার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বলতর
হোক), শানায় তান দরাজ (আপনার বক্ষস্ফন্দ বিশালতর হোক)—

তারপর আমার জন্য যা প্রার্থনা করলেন সেটা ছাপালে এদেশের পুলিশ আমাকে জেলে
দেবে।

আমি একটু ধতমত খেয়ে বললুম, 'কি যা তা সব বলছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ ঢোখ পাকিয়ে তৃপ্তী লাগালেন, 'কেন বলব না? আলবত বলব, এক শ'
বার বলব। আমি কি কাবুলের ইরানী যে ভদ্রতা করে সব কিছু বলব, সত্যি কথাটি ছাড়া?
আমি পাঠান—আমার ঘোড়ার লাগাম নেই, আমার জিভেরও লাগাম নেই!'

mone-prane-bangali.blogspot.com

ঘরে বসিয়ে কাননের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'বাড়িঘরদোর গুড়িয়ে নিয়েছেন তো? চাকরবাকর? বুটি-গোস্ত? কিছু যদি দরকার হয় আমাকে বললেন। সব যোগাড় করে দিতে পারি—কাবুলের তখৎটি ছাড়া। তাও পারি—কিন্তু মাত্র একটা কিনা, খোজ খোজ পড়ে যাবে। কিন্তু গুটার নজর দিয়ে কোনো লাভ নেই। বড্ড শক্ত; আমি বসে দেখছি।'

আমি বললুম, 'কাবুলের সিংহাসনে বসা যে শক্ত, সে তো আর গোপন কথা নয়।' দোস্ত মুহাম্মদ আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয় পেয়ে ভাবলুম বোধ হয় বেফাঁস রসিকতা করে ফেলেছি। কিন্তু দোস্ত মুহাম্মদের উত্তর শুনে অভয় পেলুম। বললেন, 'আহা—হা—হা। ব্যাচলে দাদা। তোমার তাহলে রসিকতা আছে। তোমার দেশের লোকগুলোর সঙ্গে আলাপ করে দেখছি, বড্ড বেথুলাড়, বে—আজা, বেরসিক। কী গম্ভীর মুখ! দেখে মনে হয় হিন্দুস্তান স্বাধীন করার দুর্ভাবনা যেন ওদেরই ঘাড়ের।'

অজুত লোক! অশ্রীল কথা বললেন রাস্তায় চৌচিরে, চাকরবাকর বদোবস্ত করে দেবেন বললেন ঘরের ভিতর বসিয়ে ফিসফিস করে, রসিকতা শুনে যখন খুশী তখন মুখ হল গম্ভীর। ভাবলুম এবার যদি দুটি একটা কটুবাক্য বলি তবে বোধ হয় অটুথ্য করে উঠবেন। ততক্ষণ তিনি একটা কুশানে মাথা দিয়ে কাপটের উপর শুয়ে পড়লেন। কোথ বন্ধ করে বললেন, 'কি খাবে? চা—ফ্রুটি, পোলাও—গোস্ত, আন্ধুর—নাসপাতি? যা খুশী। বাজারে সব পাওয়া যায়। বাড়িতে কিছু নেই।'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'না, না, আছে, আছে। সিগারেট আছে। দাঁড়াও।'

বলে দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে গভীর সন্ধিষ্ণু দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে সোফার পিছনে হাঁটু গেড়ে সেলা আর দেয়ালের মাঝখানেই কাপেট তুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলেন।

আমি তো অবাক। সামান্য সিগারেট; মদের বোতল নয়, প্যারিসের ছবি নয়, যে এত লুকিয়ে রাখতেন। আর কার কাছ থেকেই বা এত লুকানো।

শুনি দোস্ত মুহাম্মদ করুণ কণ্ঠে আতঁদান করে উঠেছেন, ওরে ও হারামজাদা আগা আহমদ, তোকে আমি আজ খুন করব। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে আয় ব্যাটা। ওরে নেকসহরাম, তোকে খুন করে, আজ আমি গাভী হব, ফাঁসি গিয়ে শহিদ হব।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঃ, কী পাশও! দরজা বন্ধ করে, জুড়কো মেরে সিগারেট বের করি, লুকিয়ে রাখি যেন আলাউদ্দিনের পিদিম। তবু ব্যাটা সন্ধান পেয়েছে। আর কী বেহায়া বেশরাম! দশটা সিগারেটই মেরে দিয়েছে। ওঃ!'

ততক্ষণে আগা আহমদ দরজা খুলে ঘরে ঢুকছে। কারো দিকে না তাকিয়ে, দোস্ত মুহাম্মদের কোনো কথায় সাড়া না দিয়ে সেজা সোফার পিছনে গিয়ে কাপেটের তলায় আরো বেশীদূর হাত চালিয়ে আরেক প্যাকেট পুরো সিগারেট বের করে আমার হাতে দিল।

বেরবার সময় সোরের পোড়ানো একবার দাঁড়াল। এক ঝলকের তরে দোস্ত মুহাম্মদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খালি প্যাকেটটা আমার। লুকিয়ে রেখেছিলুম।'

দোস্ত মুহাম্মদের চোখের পাতা প্যাছে না। অসমকণ্ঠ পরে বললেন, 'কী অসম্ভব বদমায়েশ! আর আমাকে বেকুব বানাবার কায়দাটা দেখলেন গভসবটারা! শুণ্ডু ভাই, নিত্য নিত্য আমাকে বেকুব বানায়।'

তারপর মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আপন মনেই বললেন, 'কিন্তু দাঁড়াও বাচ্চা, স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক যা।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর গাঁব বছরের মাইনে তিন শ'

টাকা আমার কাছে জমা আছে। সেই টাকাটা লোপাট মেরে রাইফেল কাঁধে করে একদিন পাহাড়ে উঠাও হয়ে যাব; তখন যাদু টেরটি পাবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কলেজ যাবার সময় ঘরে তলা লাগান?' তিনি বললেন, 'একদিন লাগিয়েছিলুম। কলেজ থেকে ফিরে দেখি সে তলা নেই, আরেকটা পর্বতপ্রমাণ তলা তার জায়গায় লাগানো। ভাঙবার চেষ্টা করে হার মানলুম। ততক্ষণে পড়ার লোক জমে গিয়েছে—আগা আহমদের দর্শন নেই। কি আর করি, বসে রইলুম হী হী শীতে বারাদায়। হেলে দুলে আগা আহমদ এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। পাশও কি বলল জানো? 'ও তলাটা ভালো নয় বলে একটা ভালো দেখে লাগিয়েছি।' আমি যখন মার মার করে ছুটে গেলাম তখন ঝুপ বুললো, কারো উপকার করবে মেলেরি মার খেতে হয়।'

আমি বললুম, তলা তাহলে আর লাগাচ্ছেন না বলুন। 'কি হবে? আগা আহমদ আফ্রিদী, ওরা সব তলা খুলতে পারে। জানো, এক আফ্রিদী বাজী ফেলে আমীর হরীবউল্লার নিচের থেকে বিছানার চাদর চুরি করেছিল।'

আমি বললুম, 'তলা যদি না লাগান তবে একদিন দেখবেন আগা আহমদ আপনার দামী রাইফেল নিয়ে পারিয়েছে।'

দোস্ত মুহাম্মদ খুশী হয়ে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিগুণ আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তত কাঁচা ছেলে নই। আগা আহমদের দাদা আমাকে আর বছরে ছশ' টাকা গিয়েছিল ওর জন্য দাঁও মত একটা ভালো রাইফেল কেনার জন্য। এটা সেই টাকায় কেনা কিন্তু আগা আহমদ জানে না। ও যদি রাইফেল নিয়ে উবে যায় তবে আমি তার ভাইকে তক্ষুনি চিঠি লিখে পাঠাব, 'তোমার ভ্রাতৃহন্ত রাইফেল পাঠাইলাম, প্রাপ্তি-সেবান অতি অশ্রদ্ধ জানাই।' তারপর দুই ভাইয়েতে—'

আমি বললুম, 'সুদ-উপসুদের লড়াই।' দোস্ত মুহাম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাইফেলের জন্য তারা লড়েছিল?'

আমি বললুম, 'না, সুন্দরীর জন্য।' দোস্ত মুহাম্মদ বললেন, 'তওরা। তওবা! স্ত্রীলোকের তন্য কথাগুলো জব্বার লড়াই হয়? মোক্ষম লড়াই হয় রাইফেলের জন্য। রাইফেল থাকলে সুন্দরীর স্বামীকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করা যায়। উত্তম বদোবস্ত। সে বেহেস্তে গিয়ে হরী পেল তুমিও সুন্দরী পেলে।'

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ভেবো না, লক্ষ্য করিনি যে, তুমি আমাকে আপনি বলছে আর আমি 'তুমি' বলে যাচ্ছি। কিন্তু বেশী শি চালাতে পারবে না। সমস্ত আফগানিস্তানে আমাকে কেউ 'আপনি' বলে না। ইন্তক আগা আহমদ পর্যন্ত না।'

টাগশায় চড়বার সময় 'দাঁড়াও' বলে ছুটে গিয়ে একখানা বই নিয়ে এসে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'ভালো বই, কিস্বা আর আফগানিস্তানে একই রকম প্রতিশোধের ব্যবস্থা।' চেয়ে দেখি 'কল্লাব'।

উনিশ

দিন দশেক পরে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দোস্ত মুহাম্মদ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কাবুলী কায়ানায় 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো' বলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, দোস্ত মুহাম্মদ কোনো সাড়া-শব্দ না দিয়ে আপন মনে কি সব বিড়-বিড় করে

আঙুর ফুলকি নিয়ে চাক বসোপায়ায় আব্দান করছেন।

বলে যাচ্ছে। কাছে এসে কান পেতে যা শুনলুম তাতে আমার দম বন্ধ হয়ে উপদ্রম। বলছেন, 'কমরত ব শিকন্দ, বুদা তোরার কোর সাজব, ব পুন্নি, ব তরকী' ইত্যাদি।

সরল বাঙাল্যর তজমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'তোরা কোমর ভেঙে দুটুকরো হোক, বুদা তোর দুটোখা কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা।'।

আমি কোনো গতিকে সামলে নিয়ে বললুম 'দোস্ত মুহাম্মদ, কি সব আবোল-তাবোল বকছেন?'।

দোস্ত মুহাম্মদ আমাকে আলিঙ্গন করে দুখালে দুটো বম্শেল চুমো লাগালেন। বললেন, 'আমি কখনো আবোল-তাবোল বকিনি।'।

আমি বললুম 'তবে এসব কি?'

বললেন, 'এসব তোর বাংলাই কাটাবার জন্য। লক্ষ্য করিসনি, এদেশে বাচ্চাদের সাজিয়ে-গুঁজিয়ে কপালের একপাশে খানিকটো ভুসো মাখিয়ে দেয়। তোর কপালে তো আর ভুসো মাখাতে পারিনে—তাই কথা দিয়ে সেরে নিলুম। যাকে এত গালাগল দিচ্ছি, যম তাকে নেবে কেন? পরমায়ু বেড়ে যাবে। বুকলি?'

লক্ষ্য করলুম গেল বার দোস্ত মুহাম্মদ আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিলেন এবার সেটা 'তুই'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফাসী ভাষায় 'আপনি, তুমি, তুই' তিন বাক্যে নেই—আছে শুধু 'শোমা' আর 'তো'। কিন্তু এ 'তো' দিয়ে 'তুমি তুই দুই-ই বোঝানো যায়—যে রকম ইংরাজীতে যখন বলি, 'ড্যাম ইউ', তখন তার অর্থ 'আপনি চুলোয় যান।' নয়, অর্থ তখন 'তুই চুলোয় যা।' খাঁটি পঠান আবার 'শোমা' কথাটাও ব্যবহার করে না, ইংরেজের মত শুধু এঁ এক 'ইউই জানে। বেদুইনের আরবীতেও মাত্র এক 'আনতা'। বোধ হয় পঠান, ইংরেজ বেদুইনের ডিমাক্র্যাসি তার সম্প্রদায়ের সমতায় প্রকাশ পেয়েছে।

দোস্ত মুহাম্মদ স্মরণ করিয়ে দিলেন প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের ছোট ভাইয়ের বিয়ের নেমুস্তা। সইফুল আলম তাঁকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। গাড়ি তৈরী।

সিগারেট দিয়ে বললুম, 'খান।'

বললেন 'না। আবদুর রহমানকে বসো তামাক দিতে।'।

আমি বললুম 'আবদুর রহমানকে চেনেন তাহলে।'।

বললেন, 'তোমাকে কে চেনে বাপু, তুমি তো দুদিনের চিড়িয়া, আমাকে কে চেনে বাপু, আমিও তিন দিনের পাখি—যে পাহাড় থেকে নেমে এসেছি, সে-পাহাড়ের গর্ভে আবার ঢুক যাব, আগা আহমদের টাকটা মেরো। আমি কে? মকতবে আমানিয়ার অ্যাপ্যাক অরিফি বটি, কিন্তু কটা লোক জানে। অথচ বাজারে গিয়ে পুছো, দেখবে সবাই জানে, আমি হাফি় সেই দুর্খ, যার কাঁধে বন্ধু রেখে আগা আহমদ শিকার করে; অর্থাৎ আগা আহমদের মনিব। তুমি কে? যার কাঁধে আদুর রহমান বন্ধু রেখেছে—শিকার করে কি না—করে পরে দেখা যাবে। ঢাকর দিয়ে মনিব চিনতে হয়।'।

আমি বললুম, 'বেশক, বেশক।'। তারপর বাঙাল্য বললুম, 'গোপের আমি, গোপের তুমি, তাই দিয়ে যান চেনা।'।

বললেন, 'বুঝিয়ে বল।'।

তজমা শুনে দোস্ত মুহাম্মদ আনন্দে আত্মহারা। শুধু বলেন, 'আফরীন, আফরীন, গালাশ, শালাশ, উম্ দা কবিতা, জরির কলম।' তারপর মুখে মুখে শেষ লাইনের একটা

অনুবাদও করে ফেললেন,—

'মনে বুকং, তনে বুকং, বুকং সনাতদরদ।'

তারপর বললেন, 'আমি আবরী, ফাসী, আর তুফী নিয়ে কিছু কিছু নান্না-চান্না করেছি, কিন্তু ভাল রসিকতা কোথাও বিশেষ দেখিনি। পেনো তো প্রায় নেই-ই। বাঙাল্যর বুঝি এরকম অনেক মাল আছে?'

আমি বললুম, 'না, মাত্র দুখানা কি আড়াইখানা বই।'।

দোস্ত মুহাম্মদ নিরাস হয়ে বললেন, 'তাহলে বাঙলা শিখে কি হবে।'।

পেশাওয়ারের আহমদ আলী আর কাবুলের দোস্ত মুহাম্মদে একটা মিল দেখতে পেলুম—দুজনই অল্প রসিকতায় খুব মুগ্ধ হন। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, আহমদ আলীর জীবনের ধারা বয়ে চলেছে আর পাচতরুর মত, আর দোস্ত মুহাম্মদের জীবন যেন নিকরের স্বপ্নভঙ্গ। এক পাখর থেকে আরেক পাখর লাফ দিয়ে গিয়ে এগিয়ে চলেছে, মাঝখানে রসিকতার সূচকিরণ পড়লেই রামধনুর রঙ মেখে নিচ্ছে। দু-একবার মামুলি দুঃখকাষ্টের কথা বলতে গিয়ে দেখলুম সে সব কথা তার কানে যেন পৌছচ্ছেই না। বিলাসব্যাসনেও শখ নেই। তিনি যেন সমস্তক্ষণ বৈশ্যপাণ্ডের সন্ধানে যেখানে রাজার পিসি পাউরুটিতে পরেক ঠোঁকেন, যেখানে পণ্ডিতেরা টাকের উপর ডাকের চিঠি আটকেন।

তাই যখন আমরা বিয়ের মজলিসে গিয়ে কাবুল শহরের গণ্যমান্য বাড়িদের মাঝখানে আসন পেলাম, তখন দোস্ত মুহাম্মদের জন্য মুগ্ধ হলাম। খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে কি যেন বলে যাচ্ছেন। তাঁর দিকে একে একে ঝুঁকতে তিনি বললেন, 'ফয়েজ মুহাম্মদের গুণে শিক্ষামস্ত্রীর নামে, না শিক্ষামস্ত্রীর পদের জোর ফয়েজ মুহাম্মদের নাম—মুহাম্মদ তজীর গুণে বিদেশী সচিবের নাম, না বিদেশী সচিবের পদের জোর মুহাম্মদ তজীর নাম? বাঙালী কি বলি লাখ কবার এক কথা বলেছে,

'গোপের আমি, গোপের তুমি, তাই দিয়ে যান চেনা'।

আমি বললুম, 'তুপ, মস্ত্রীরা সব আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন, গুনতে পেলো আপনাকে জ্যাস্ত পুতে ফেলবেন।'।

বললেন, 'হ্যাঁ তা বটে, বিশেষ করে ঐ ফয়েজটা'।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফয়েজ মুহাম্মদ খান, মিনিষ্টার অব পাবলিকইনস্ট্রাকশন?'

উত্তর দিলেন, 'না, মিনিষ্টার অব পাবলিক ডিস্ট্রাকশন।'। কত হেলের মগজ ডেস্ট্রয় করছে। আমাকে মারবে তার আর নুতন কি?'

আমি ভয় পেয়ে 'চুপ চুপ' বলে উজীর সায়েবদের 'জানগর্ভ' কথাবার্তা কান দেবার চেষ্টা করলুম।

দোস্ত মুহাম্মদকে দেখ দেওয়া অন্যায্য। অনেক ভেবেও কুল-কিনার পাওয়া যায় না যে, ঐরা সব কোন গুণে মস্ত্রী হয়েছেন। লেখাপড়ায় এক-একজন যেন রিদাসাগর। দুনিয়ার কোনো খবর রাখার চাওও কানো নেই। বেশীরভাগই একবার দুবার ইয়ায়োগ্য হয়ে এসেছেন, কিন্তু সেখান থেকে দু'একটা শব্দ ব্যাধি ছাড়া যে কিছু সংগো এনেছেন, তা তো কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে না। জোকসদের মধ্যে যারা গালাগল্পে যোগ দিল তারা তবু দু-একটা পাশ দিয়ে এসেছে, বুজুদের যারা অবজ্ঞা অবহেলা স্তব্ধ মুখ খুললেন, তাঁদের কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে যে, আর কিছু না হোক তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এই উজীরদের দল না পারে উড়তে, না পারে সাঁতার কাটতে—চলন যেন ব্যাঙের মত, এলোপাতাড়ি, ধ্বপপপ। কাবুলের বড় জিনিস, বড় প্রতিষ্ঠান সেখে মনে দুলু হয়, কিন্তু এই মস্ত্রীমণ্ডলীকে সেখে কনফুসিয়াসের মত বলতে হয়,

‘আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র, সপসারে প্রাণিপাত।’

সইফুল আলম এসে কানে কানে বললেন ‘একটু বাদে দক্ষিণের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন; আমি দোরের গোড়ায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।’ দোস্ত মুহম্মদ না শুনেও মাথা নাড়িয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনিও আসছেন।

মজলিস থেকে বরিয়ে যেন দম ফেলো বাচলুম। দোস্ত মুহম্মদ বললেন, ‘তা’ ব গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, গরগলা শুদম—আমার ফাঁস হয়ে গিয়েছে।’

সত্যিকার বিয়ের মজলিসে তখন প্রবেশ পেলুম। সেখানে দেখি, জনবিশেক ছোকড়া, কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে আচ্ছা জমাচ্ছে। একজন বামুন্ডা দিয়ে গ্রুমোফোনটার মুখ গুঁজে সাউণ্ড-বরগে পাশে কান পেতে গলা শুনছে। জন-তিনকে তাস খেলে। বিদগ্ধ মোহাা মীর আসলম এক কোণে কি একখানা ওই পড়ছে। আরেক কোণে এক বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, অথবা ঘুমচ্ছেন—মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, বরফের মত সাদা দাড়ি আর কালো মিশমিশে জোকাবা। শান্ত মুখছবি—একপাশে ছোট একখানা সেতার। সব ছেলে-ছোকরার গাল, ঐ মীর আসলম আর সেতারওয়াল বন্ধ ছাড়া। মজলিসে আসবাবপত্র কিছু নেই, শুধু দামী গালচে আর রঙীন তাকিয়া।

কেউ কেউ ‘বফরমাইল, আসতে আজ্ঞা হোক’ বলে অভ্যর্থনা করলেন।

আমি দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘এইখানে সোজা এলেই তো হত।’

তিনি বললেন, সেটি হবার জো নেই, আসল মজলিসে বসে নাভিস্বাস না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্রোমোশন নদারম। তা তুমি তো বাপু বেশ চাঁদপানা মুখ করে বসেছিলে। তোমাকে সেখানে উসখুস না করে বসে থাকতে দেখে আমার মনে তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বড় ভয় জেগেছে। এদেশে উজীর হবার আসল গুণ তোমার আছে—To sit among bores Without being bored. কিন্তু খবরদার, সারথানে পা ফেলে চলো দাদা, নইলে রফে নেই—দেখবে একদিন বলা নেই কণ্ডা নেই কাঁক করে ধরে নিয়ে উজীর বানিয়ে দিয়েছে।’

সইফুল আলম আমাকে অদর কর বসালেন।

তরুণদের আচ্ছা যে উজীরদের মজলিসের চেয়ে অনেক বেশী মনোরঞ্জন তা নয়, তবে এখানে লৌকিকতার তরঙ্গী নেই বলে যা-খুশী করার অনুমতি আছে। এরা নিজস্ব পলিটির পর্যন্ত আলোচনা করে এবং যৌবনের প্রধান ধর্ম সম্পর্কে কথা বলতে গেলে কারো মুখে আর কোনো লাগাম থাকে না। কণ্ঠব্যতীত ভারতীয় তরুণদের সঙ্গে এখানে আসল তলাত এই যে, এদের জীবনে নৈরাশ্যের কোনো চিহ্ন নেই, বর্তমান থেকে পালিয়ে গিয়ে অতীতে আশ্রয় জো এরা খোঁজেই না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা আশা-ভরসা, তাও স্বন্দগড়া পরীস্থান নয়। শারীরিক ক্রেশ সম্পর্কে অচেতন এরকম জোয়ান আমি আর কোথাও দেখিনি। এদেরই একজন আর বার বসন্ত কি করে ট্রান্সফার হয়ে বদশখান থেকে হিন্দুস্তান পার হয়ে কাবুল এসেছিল তার খবর দিচ্ছিল। সমস্ত দিন হিফে মায় তিন মাইল রাস্তা এগোতে পেরেছিল, কারণ একই নদীকে ছবার পার হতে হয়েছিল, কিছুটা সাঁতারে, কিছুটা পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে। দুটো খবর ভেসে গেল জেলের তোড়ে, সন্ধ্যা নিয়ে গেল খাবার-দাবার সবকিছু। দলের সাতজনদের মধ্যে দুজন অনাহারে মারা যান।

এবং বর্ণনা আমি যে জীবনে প্রথম শুনলাম তা নয়, কিন্তু এর বর্ণনাতে কোনো রোমাঞ্চ মাখানো ছিল না, পর্যটকদের গতানুগতিক দস্ত ছিল না আর আফগান সরকারের নিরর্থক অসময়ে ট্রান্সফার করার ব্যতিক্রম বিরুদ্ধে কণামাত্র নালিশ-ফরিয়াদ ছিল না। ভাবখানা

‘অনেকটা ছাড়া ছিল না তাই বিগিটে ভিত্তে বাড়ি ফিরলুম। কাল আবার বেগতে পারি দরকার হলো—ছাড়া যে সঙ্গে নেবই সে রকম কথাও দিচ্ছিলে।’ অখাৎ আধামী বসন্তে যদি তাকে ফের বদশখান বেতে হয় তবে সে আপত্তি জানাবো না।

অখাৎ যখন বালিনে পড়াশুনা করত তখন তিন বছর ধরে মাসে চার শ’ মার্শ খাটা করে আরামে দিন কাটিয়েছে।

অনেক রাতে খাবার ডাক পড়ত। গরম বাঙলা দেশেই যখন বিয়ের রাসা ঠাণ্ডা হয় তখন ঠাণ্ডা কাবুলে যে বেশীভরতগা গিলিসই হিম হবে তাতে আস্চর্য কি?

মীর আসলম তাই খানিকটো মাসে এদিয়ে দিয়ে বললেন, ‘কিন্তু শূল্যপত্র অজ্ঞামৎ তরুণ কর। আভ্যন্তরিক উম্মার জন্য ইহাই প্রশস্ততম।’

তারপর দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোনো জিনিসের অপ্ৰাচর্য হয় নাই তো?’ দোস্ত মুহম্মদ বললেন, ‘তা’ ব গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে—গরগলা শুদম—আমার ফাঁস হয়ে গিয়েছে।’

কোনো জিনিসে আকষ্ট নিমজ্জিত হওয়ার এই হল ফাসী সংস্করণ।

আফগান বিয়ের ভোজ যে বিস্তর লোক প্রচুর পরিমাণে খাবে সেকথা কাবুলে না এসেও বলা যায়, কিন্তু তাকে চেয়ে বড় তরুণরা এই যে, যত খাবে তার চেয়ে বেশী ফেলবে, বাঙলা দেশের এই সুসভ্য বর্ষভরার সন্ধান আফগানরা এখনো পায়নি।

খাওয়া-নাওয়ার পর গলগলপ জরমো ডালো করে। শুধু দোস্ত মুহম্মদ কাউকে কিছু না বলে তিনটে কুশনে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আবহাওয়া থেকে অনুমান করলুম যে রেওয়াজ হচ্ছে, হয় মজলিসের পাঁচজনের সঙ্গে গুপ্তিস্থ অনুভব করা, নয় নির্বিকারচিত্তে অকাহরে ঘুমিয়ে পড়া। বিয়ে বাড়ির হৈ-হল্লা, কড়া বিজলি বাতি আফগানের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত জন্মাতো পারে না।

রাত ঘনিষে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন একজন করে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সইফুল আলম আমাদের আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে গেলেন। মীর আসলমের ভাষা বিদগ্ধ হতে বিদগ্ধতর হয়ে যখন প্রণয় ব্যক্তব্যস্তের মত পূতপবিত্র হাবা উপক্রম করেছে, তখন তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। চেয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেতারখানা কোলে তুলে নিয়েছেন।

মীর আসলম আমাকে কানে কানে বললেন, ‘তোমার অদৃষ্ট অন্য রজনীব তৃতীয় যামে সুপ্রসন্ন হইল।’

সমস্ত সন্ধ্যা বৃদ্ধ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। ‘পিড়িত’ করে প্রথম আওয়াজ বেরুতেই মনে হল, এর কিন্তু বলবার মত অনেক কিছু আছে।

প্রথম মৃদু টককারের সঙ্গে সন্ধ্যাই দোস্ত মুহম্মদও সোজা হয়ে উঠে বসলেন—যেন এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় শুয়ে শুয়ে প্রব্রের গুণগিলেন।

সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যবার পূর্বই বুড়ার গলা থেকে গুঞ্জরগ ধ্বনি বেরল—কিন্তু ভুল বললুম—গলা থেকে নয়, কণ্ঠ থেকে, তার প্রতি লোমকূপ ছিন্ন করে যেন শব্দ বেরল। সেতার বাঁধা হয়েছিল কেন সন্ধ্যায় জানিনে কিন্তু তার গলার আওয়াজ শুনে মনে হল, ঐর সর্বশরীর যেন আর কোনো ওস্তাদের গুপ্তদম বহকাল ধরে বেঁধে বেঁধে আজ যামিনীর শেষমাঝে এই প্রথম পরিপূর্ণতা পৌঁছালেন।

ওস্তাদী বাজনা নয়—বুড়োর গলা থেকে যেন পরী হঠাৎ ডানা মেলে বেরল, সেতারের আওয়াজ যেন তার ছায়া হয়ে গিয়ে তারই নাচে যোগ দিল।

ফাসী গজল। বুড়ার চেহারা বন্ধ; শান্ত-প্রশান্ত মুখছবি, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপছে না,

ওষ্ঠ-অধরের মৃদু স্পর্শের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গভীর নিশ্বাস গুঞ্জন। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আওয়াজ যেন বলকলম আতরের মত সভাস্থল ভরে দিল।

গানের কথা শুনব কি, সেতাকে গলায় মিশে গিয়েছে যেন সন্ধ্যা বেলাকার নীল আকাশ সূর্যাস্তের লাল আবার মেখে নিয়ে ঘন বেগুনী থেকে আস্তে আস্তে গোলাপীর দিকে এগিয়ে চলেছে। আর প্যাজনের কথা বলতে পারিনে—এরকমের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। ক্রমাক্রমে যেন চোখ মেলল সূর্যাস্তের মাঝখানে। আমি তখন রঙের মাঝখানে ডুবে গিয়েছি—সমুদ্র, বেলোভুনি, তরুণলব্ব কিছুই চোখে পড়ছে না।

ধনীর ইন্দ্রজালে মোহাচ্ছন্ন করে বন্ধ যেন একমাত্র আমারই কানে কানে তাঁর গোপন মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

‘শবি আগর, শবি আগর, শবি আগর—’

‘যদি এক রাতের তরে, মাত্র এক রাতের তরে, একবারের তরে—’
আমি যেন চোঁটয়ে জিজ্ঞেস করতে যাইছি, ‘কি? কি? কি? এক রাতের তরে, একবারের তরে কি?’ কিন্তু বলার উপায় নেই—দরকারও নেই, গুণী কি জানেন না?

‘আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম’

‘প্রিয়ার অধর থেকে একটি চুম্বন পাই’

প্রথমবার বললেন অতি শাস্তকণ্ঠে, কিন্তু যেন নৈরাশ-ভরা সুরে, তারপর নৈরাশ্য যেন কেঁটে যেতে লাগল, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল, সাহস বাড়তে লাগল, সবশেষে রইল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাষা, ‘পাবোই পাবো, নিশ্চয় পাবো’।

গুণী গাইছেন, ‘লবে ইয়ার’, ‘প্রিয়ার অধর’ আর আমার বন্ধু চোখের সামনে কালোর মাঝখানে ফুটে ওঠে টকটকে লাল দুটি চোঁট, যখন শুনি ‘বোসয়ে তলবম’—যদি একটি চুম্বন পাই, তখন চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যায়, বুকের মাঝখানে যেন তখন শুনতে পাই সেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আতুর হিয়ার আকুলি-বিকুলি, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়প্রত্যয়।

হৃৎকার দিয়ে পেয়ে উঠলেন, ‘জোয়ান শওম’

‘তাহলে আমি জোয়ান হব—একটি মাত্র চুম্বন পেলে লুপ্ত যৌবন ফিরে পাব।’

সভাস্থল যেন তাগুব—নৃত্যে ভরে উঠল—যেই শব্দকর যেন উপসর্গাশ্রমে পার্বতীকে নিয়ে উন্মত্ত নৃত্যে, মেতে উঠেছেন। হৃৎকারের পর হৃৎকার—‘জোয়ান শওম’, ‘জোয়ান শওম’। কোথায় বৃদ্ধ সেতারের গুস্তাদ—দেবি সেই জোয়ান মজ্জাল। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শব্দে দু-পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাঁছে, আর দু-হাত মেলে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনে হুঁড়ে ঢালো বাবরী বুলের আবর্তের ঘূর্ণি লাগিয়েছে।

দেখি তাজমহলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন শাহজাহান আর মমতাজ। হাত ধরাধরি করে। নবীন প্রাণ, নূতন যৌবন ফিরে পেয়েছেন, শতাব্দীর বিচ্ছেদ শেষ হয়েছে।

শুনি সঙ্কীত তরঙ্গের কলকল্লাল জাহ্নবী। সগররাজের সহস্র সন্তান-নবীন প্রাণ নবীন যৌবন ফিরে পেয়ে উল্লাসধ্বনি করে উঠেছে।

কিন্তু গুণী, যৌবন পেয়েছে, প্রিয়ার প্রসাদ পেয়েছে, চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে—অবচ কবিতার পদ যে এখনো অগ্রগামী—

‘শবি আগর, আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম’

জোয়ান শওম—

আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই

জোয়ান হইব—

তারপর, তারপর কি?

শুনি অবিচল দৃঢ়কণ্ঠে অদ্ভুত শব্দ গুঞ্জন—

‘জসেরো জিদেগী দুবারা কুনম’

‘এই জীবন তাহলে আবার দোহারাতে, দুবার করতে রাজী আছি। একটি চুম্বন দাও, তাহলে আবার সেই অসীম বিরহের তপ্ত দীর্ঘ অন্তর্বিহীন পথ ক্ষতিবিহীন রক্তসিক্ত পদে অতিশয় করবার শক্তি পাব। আসুক না আবার সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদ, তোমার অবহেলায় কঠোর কর্তন দাও।’

‘আমি প্রস্তুত, আমি শপথ করছি,

—‘জসেরো জিদেগী দুবারা কুনম।’

‘গোড়া হতে তবে এ—জীবন দোহরাই।’

আমি মনে মনে মাথা নিচু করে বললুম ‘ক্ষমা করো গুণী, ক্ষমা করো কবি। শিখরে পৌঁছে উক্ত প্রশ্ন করেছিলুম, পদ এখনো অগ্রগামী, যাবো কোথায়। তুমি যে আমাকে হঠাৎ সন্ধান থেকে শুনো তুলে নিতে পারো, তোমার গানের পরী যে আমাকেও নীলাম্বরের মর্মমাঝে উধাও করে নিয়ে যেতে পারে, তার কম্পনাও যে করতে পারিনি।’

বারে বারে ঘুরে ফিরে গুণীর আকৃতি-কাকৃতি ‘শবি আগর’, ‘যদি এক রাতের তরে’ আর সেই দৃঢ় শব্দ ‘জিদেগী দুবারা কুনম’, ‘এ—জীবন দোহরাই’—গানের বাদ্যবাকী এই দুই বাক্যেই বারে বারে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে ব্রহ্মকর হচ্ছে। কখনো শুনি ‘শবি আগর কখনো শুধু ‘দুবারা কুনম’—‘শবি আগর’, দুবারা কুনম।

পশ্চিমের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও পূর্বের আকাশ অনেকদূর ধরে লাল রঙ ছাড়ে না—কখন গান বন্ধ হয়েছিল বলতে পারিনি। হঠাৎ ভোরে আর আজান কানে গেল, ‘আল্লাহ আকবর’, ‘বুলাতলা মহান’ মাইতে, মাইতে, ভয় নেই, ভয় নেই, তোমার সব কামনা পূর্ণ হবে।

‘গুয়া লালা আখিরাউ খাইজন লাকা মিনালে উলা

‘অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে তো ভবিষ্যৎ।

কবে মেলে দেখি কবি নেই। মোস্তা মীর আসলাম পাথরের মত বসে আছেন, আর দোস্ত মুহম্মদ দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছেন।

বিশ

দরজা ঝা ঝা করছে। ঘরে ঢুকেই ধমকে দাঁড়ালুম। আসবাবপত্র সব অন্তর্ধান। কার্পেটের উপর অ্যাটচিকেসে মাথা রেখে দোস্ত মুহম্মদ শুয়ে। আমাকে দেখেই চোঁটয়ে বললেন, ‘বোয়ো, গুমশো’—‘বেরিয়ে যা, পালা এখন থেকে।’

দোস্ত মুহম্মদের রকমারি অভ্যর্থনা সম্ভাষণে ততদিন আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কাছে গিয়ে বললুম, ‘জিনিসপত্র সব কি হল? আগা আহমদ যে ভারী ভারী টেবিল চোয়ার, কোচ সোফা পর্যন্ত সরাতে ততোটা আঁচ করতে পারিনি।’

দোস্ত মুহম্মদ বিড় বিড় করে বললেন, ‘সব ব্যাটা চোর, সব শালা চোর, কোনো ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই, কবুল থেকে প্যারিস পর্যন্ত।’

আমি বললুম, ‘বড় অন্যায় কথা। চুরি করল আগা আহমদ, দেখে ছড়ালো প্যারিস পর্যন্ত।’

• কুরান শরীফ ৯৩, ৪।

বললেন, 'কী মুশকিল, আগা আহমদ চুরি করলে তার পিছনে আমি রাইফেল কাধে করে বেরতুম না? না বেরলে আফ্রিনী সমাজে আমার জাত-ইজ্জত থাকত? নিষেছে ব্যাটা লাক্যো?'

সে আবার কে?'

'পশু' এসে পৌঁছেছে, ফরাসীর অধ্যাপক। লব-ই-দরিয়ায় বাসা বেঁধেছে—বেশ বাড়িখানা। আফগান সরকারের যত আধিক্যেতা-আস্তি সব বিদেশীদের জন্য।'

আমি বললুম, 'চোর কে, তার সাকিন-টিকানা সব যখন জানেন তখন মাল উদ্ধার—'

বললেন, 'আইনে দেয় না—বেচারী দুখ করছিল কোথাও আসবাবপত্র পাচ্ছে না। আমি বললুম আমার বাড়িতে বিস্তার আছে—ফরাসী জানে তো, বুক দ্য মোবল, ফুল দ্য মোবল, তা দ্য মোবল, ব্যাটিকে দেখিয়ে দিলুম 'বিস্তার' কত বিচিত্র কায়দায় ফরাসীতে বলা যায়। শুনে ব্যাটা দুষরা আফগান লড়াইয়ের গোরা সেপাইয়ের মত কচুকুতা হয়ে শুয়ে পড়ল।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'শুয়ে পড়ল কোথায়, এসে তো দিবি সব কিছু বোটিয়ে নিয়ে গেল।'

দোস্ত মুহম্মদ আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তওবা তওবা, নিজে এলে কি আর সব নিয়ে যেত—দেখত না ভিত্তিতে কবুতর চরার মত অবস্থা হয়ে উঠেছে। আমিই সব পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বেশ করেছে, এখন মরো হিমে শুয়ে—'

এক লাফ দিয়ে দোস্ত মুহম্মদ আমার গলা জড়িয়ে ধরিয়ে বললেন, 'বলিনি বলিনি, তখন বলিনি, পারবিনি রে, পারবিনি—তোকে 'আপনি' বলা ছাড়াতেই হবে।' কিন্তু তুই ভাই রেকর্ড ব্রেক করেছিস—ঝাড় পানোরো দিন আপনি চালিয়েছিস।'

আমি বললুম, 'বেশ বেশ। কিন্তু যেচ্ছায় যখন সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছে তখন দুনিয়াসুদ্ধ লোককে চোর চামার বলে কটু-কাটাবা করছিল কেন?'

'কান্ডিকে বলবিনে, শুনেই ভুলে যাবি? তবু বেশ শান। তুই যখন ঘরে ঢুকলি তখন দেখলুম তোর মুখ রক্ত ভরা। হয়ত দেশের কথা ভাবছিলি, নয় কাল রাতিরে গানের খোয়ারি কাটিয়ে উঠতে পারিসনি—কেন যে ফ্যাপারা এরকম ভুতুড়ে গান গায়? তা সে থাকবে। কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হল তুই বড় বেজার। তাই যা-তা সব বানিয়ে, তোকে চটিয়ে সব কথা ভুলিয়ে দিলুম। দেখলি কায়দাখানা।'

আমি বললুম, 'খুব দেখলুম, আমাকে বেকুব বানালে। তোমাকে বেকুব বানায় আগা আহমদ, আলু তুমি বেকুব বানালে আমাকে। তা নূতন কিছু নয়—আমাদের দেশে একটা দোহা আছে—

শমনাদমন রাবণ আর রাবণমমন রাম,
শ্বরশরদমন শাশুড়ী আর শাশুড়ীদামন হাম।'

টিলে গল্প, কাঁচা রসিকতা। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদ নবীনের মত, 'বাহা পায় তাহাই যায়,' মুখে হাসি লেগেই আছে।

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু একটা খাটো তে অস্তত কোনো, মায়িত শোবে নাকি?'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তবে আসল কথাটা এই বেলা শোনো: বিলিটী আসবাবপত্রে আমি কখনো আরাম বোধ করিনি—দশ বৎসর চেষ্টা করার পরও। অথচ পয়সা দিয়ে কিনেছি, ফেলতে গেলে লাগে। এতদিনে যখন সুযোগ মিলল তখন নূতন করে জঙ্গল জুটোব

কেন? এইবার আরাম করে পাঠানী কায়দায় গরময় মি চয়ে বেড়াব—খাট থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙবার আর ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'কমরত ন শিকলেন', তোমার কোমর ভেঙে দুটুকরো না হোক।'

কথা ছিল দুজনে একসঙ্গে বগদানফ সায়েবের বাড়ি যাব।

পূর্বেই বলেছি ফরাসী দূতবাসে বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানা ছিল বিদেশী মহলের কেন্দ্রভূমি। বাগান থেকেই শব্দ শুনে তার আভাস পেলুম। ঘরে ঢুকে দেখি একপাল সায়েব মেম। আমাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বগদানফ সায়েব চোস্ত ফরাসী ভাষায় দুকুস্ত ফরাসী কায়দায় বললেন, 'পেরতেতে মওয়া লা জেলিরি দা ডু প্রজাঁতে—অনুমতি যদি দেন তবে আপনাদের সান্নে অমুককে নিবেদন করে বিমলাদন উপভোগ করি।'

তারপর এক-একজন করে সকলের নাম বলে যেতে লাগলেন। আমি বলি, 'হাডুডু', তাঁদের কেউ বলেন, 'আঁশাতে', কেউ বলেন, 'শায়ে', কেউ বলেন 'রাভি'। অর্থাৎ আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেউ হয়েছেন enchanted, কেউ charmed কেউ বা ravished! একেই বলে ফরাসী ভদ্রতা। এরা যখন গুণ্ডা গার্বো বা মার্লেনে দীতরিশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি সত্যি enchanted হন তখন কী বলেন তার সম্ভান এখানে পাইনি।

মসিয়ো লাক্যো গম্পের ছেঁড়া সূতোর খেঁই তুলে নিয়ে বললেন, 'তারপর বাদশা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসী শিখতে ছমাসের বেশী সময় লাগার কথা নয়।' আমি বললুম 'না হজুর, অস্তত দুবছর লাগার কথা'।

বাগদানফ সায়েব বললেন, 'করেছেন কি? বাদশাহের কোনো কথায় না বলতে আছে? দিবা দ্বিগ্রহের, প্রথার রৌদ্রালোকে যদি হজুর বলেন 'পশা, পশা, নীলাশ্বরের ললাটদেশে চন্দ্রমা কি প্রকারে শেষতচন্দন প্রলেপ করেছেন।' আপনি তখন প্রথম বললেন, 'হজুরের যে পুতপবিত্র পদদ্বয় আনন্দি কাল থেকে অসীম কাল পর্যন্ত মণিমাণিক্য বিজড়িত সিংহাসনে বিরাজমান এ—গোলাম এই পদরজ্জ্বশর্প লাভের আশায় কুরবানী হতে প্রস্তুত।' তারপর বললেন—

বাধা দিয়ে মাদাম লাক্যো বললেন, 'সম্পূর্ণ মস্তোচ্চারণের যদি ভুলচুক হয়ে যায়? দৈর্ঘ্য তো কিছু কম নয়।'

বগদানফ সায়েব সদয় হাসি হেসে বললেন, 'সম্প-সম্প রদবদল হলে আপত্তি নেই। 'মনি-মাণিক্যের বদলে 'হীরা-জওহর' বলতে পারেন, 'পদরজ্জের' পরিবর্তে 'পদদ্বী' বললেও বাধবে না।

'তারপর বলবেন, 'হজুরের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—চন্দ্রমা সত্যই কি অপরূপ বেশ ধারণ করেছেন এবং নক্ষত্রমণ্ডলী কতই না নয়নাভিরাম।'

ইতালির সিয়েরো দিগালে জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি ভদ্রতা বজায় রেখে হজুরকে সত্যি কথা জানাবার কোনো উপায়ই নেই? এই মনে করুন মসিয়ো লাক্যো যদি সত্যি সত্যি জানতে চান যে, ফরাসী শিখতে দুবছর লাগে?'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে, 'বাদশা যখন বললেন ছমাস আপনি তখন বললেন, 'নিশ্চয়, হজুর, ছমাসই হয়। দু'ঘরের আরো ভালো হয়।' হজুরেরও তো কাণ্ডগোল আছে। আপনার ভদ্রতাসৌজন্যের আতর তিনি শুকবেন, গায়ে মাখবেন, তাই বলে তো আর গিলবেন না।'

মসিয়ো লাক্যো বললেন, 'এ সব বাড়বাড়ি।'

বগদানফ বললেন, নিশ্চয়ই। বাড়বাড়িরই আরেক নাম আর superfluity। আর পোয়েট

টেগোর—আমাদের তিনি গুরুদেব—' বলেই তিনি প্রোফেসর বেনওয়া ও আমার দিকে একবার বাও করলেন—'তিনি বলেন, 'আটের সৃষ্টি হয়েছে সুপারন্যূমিট থেকে।' আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, কথটা বোঝাতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রী মশায়কে কি একটা চমৎকার তুলনা দিয়েছিলেন না?'

'আমি বললুম, 'কার্টের ডাঙা লাগানো টিনের কেনোস্তায় করে রাধু মালীর নাইবার জল আনার মধ্যে আর নন্দলাল কর্তৃক চিত্রবিচিত্রিত মৃৎপাত্র ভরে ঘোড়ী সন্ধ্যায় সূন্দরীর জল আনার মধ্যে যে সুপারন্যূমিটির তফাত তাই আট!'

বগদানফ সায়েব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'শুধু আট? দর্শন, বিজ্ঞান, সব কিছু—কলচার বলতে যা কিছু বুঝি। সবই সুপারন্যূমিট থেকে, বাড়বাড়ি থেকে।'

অধ্যাপক ভ্যাসা বললেন, 'কিন্তু এই কলচার যখন চরমে পৌঁছায় তখন গুরুচণ্ডালে এত পার্থক্য হয়ে যায় যে, বাইরের শত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন সে দেশের সব শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে স্বাধীনতা হয়রায়। যেমন ইরান।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষ।'

পোলিশ মহিলা মাদাম ভরতচরিয়েভিচি বললেন, 'কিন্তু ইংরেজ? তারা তো সভ্য, তাদের গুরুচণ্ডালেরও তফাত অনেক কিন্তু তারা তো সব সময় এক হয়ে লড়তে পারে।'

বগদানফ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাদের কথা বললেন, মাদাম?'

'ইংরেজের।'

'ঐ যারা ইয়োরোপের পশ্চিমে একটা ছোট দ্বীপে থাকে?'

মজলিসে ইংরেজ কেউ ছিল না। সবাই ভারি খুশী। আমি মনে মনে বললুম, আমাদের দেশেও বলে 'চক্রা'।'

অধ্যাপক ভ্যাসা বললেন, 'বগদানফ ঠিকই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের ভিতর অনেক স্বানদানী বংশ আছে সত্যি কিন্তু গুরুচণ্ডালে যে বৈদ্যুত্য়র পার্থক্য হবে, সে কোথায়? ওদের তো থাকার মধ্যে আছে এক সাহিত্য। সম্বীত নেই, চিত্রকলা নেই, ভাস্কর্য নেই, স্থাপত্য নেই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে পার্থক্য হবে তার অনুভূতিগত উপকরণ কোথায়? অথচ ফ্রান্সে এসব উপকরণ প্রচুর; তাই দেশদু ফরাসীরা এক হয়ে লড়তে জানে না, শান্তির সময় রাজ্য পর্বত চালাতে পারে না। যে দেশে আছি তার নিদে করতে নেই, কিন্তু দেখুন, এক ফৌজা দেশ অথচ স্বাধীন।'

মাদাম ভরতচরিয়েভিচি বললেন, 'এ দেশেও তো মোল্লা আছে।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিন্তু ভয় নেই মাদাম। মোল্লাদের আমি বিলক্ষণ চিনি। ওদের বেশীরভাগ যেটুকু শাস্ত্র জানে আপনাকে সেটুকু আমি চিনি দিনেই শিখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু মেয়েদের মোল্লা হওয়ার রেওয়াজ নেই।'

মাদাম চটে গিয়ে বললেন, 'কেন নেই?'

দোস্ত মুহম্মদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাড়ি গজায় না বলে।'

ভ্যাসা সাহুনা দিয়ে বললেন, 'মোল্লাই হন আর যাই হন, এ দেশের মেয়ে হয়ে জন্মালে যে আপনাকে বোরকার আড়ালে থাকতে হত। আমাদের কেতিসি বিবেচনা করুন।'

সবাই একাকো

'Oui, Madame,
Si, si, Madame,
Cernement, Madame.'

কোরাস সমাপ্ত হল দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিন্তু পদ—প্রথা ভালো।'

যেন আটখানা অদৃশ্য তলায়ার খোলার শব্দ শুনতে পেলুম; চোখ বন্ধ করে দেখি দোস্ত মুহম্মদের মুখটা গড়িয়ে গড়িয়ে আঙ্গুরী মুখের দিকে চলেছে।

নাঃ! কম্পনা। শুনি দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'ধমত বলুন তো মশায়রা, মাদাম ভরতচরিয়েভিচি, মাদাম লাকো, সিমোরা দিগাদোর মত সুন্দরী সংসারে কয়টি? বেশীরভাগই তো কুছিত? পাইকরী পদা চালালে তাহলে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশী নয় কি?'

মহিলারা কথঞ্চিৎ শান্ত হলেন।

কিন্তু মাদাম ভরতচরিয়েভিচি পোলিশ,—উম্ম রক্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর পুরুষদের সবাই বুঝি খাপসুরত এ্যাডমিনস? তারাও বো বোরকা পরে না কেন, শুনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তাই তো পুরুষদের দিকে মেয়েদের তাকানো বায়ন।'

মজলিসে হট্টগোল পড়ে গেল। মেয়েরা খুশী হলেন না ব্যাজার হলেন ঠিক বোঝা গেল না। কুয়াশা কাটিয়ে সিমোরা দিগাদো দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরীর অপ্রাচুর্য বলেই কি আপনি বিয়ে করেননি?'

দোস্ত মুহম্মদ একটুখানি হাঁ করে বা হাত দিয়ে ডান দিকের গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তা নয়। আল কথা হচ্ছে, কোনো একটি সুন্দরীকে বেছে নিয়ে যদি তাকে বিয়ে করি তবে তার মানে কি এই নয় যে, আমার মতে দুনিয়ার আর সব মেয়ে তার তুলনায় কুছিত। একটি সুন্দরীর জন্য দুনিয়ার সব মেয়েকে এর কম বে-ইজ্জৎ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

সবাই খুশী। আমি বিশেষ করে। পাহাড়ী আফগান বিদ্রুদ্ধ ভ্যাসাকে শিভালয়িতে ঘায়েল করে দিল বলে।

ইরানী রাজদুত্তবাসের আগা আদিত একফণ চুপ করে বসেছিলেন, বললেন, 'তবেই আফগানিস্থানের হায়েল। ইরানী কায়দার নবল করে আফগানিস্থানেরও কপাল ভাঙবে। ইরান কিন্তু ইতিমধ্যে কুছিয়র হয়ে গিয়েছে। শাহ—বাদশাহের সঙ্গে কথা বলবার যে সব কায়দা বগদানফ সায়েবকে বললেন সেগুলো তিনি দশ বছর আগে ইরানে শিখেছিলেন। এখন আর সেদিন নেই। সব রকম এটি কেটের বিরুদ্ধে সেখানে এখন জোর আন্দোলন আর ট্রায়ামফেরা চলছে। ঘরে ঢোকার সময় যে সামান্য ভজতা একে অন্যকে দেখায় তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত এখন কর্তাব লেখা হয়। শুনে শুনে একটা তো আমারই মুখস্থ হয়ে গিয়েছে; আপনারা শোনেন তো বলি।'

সবাই উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন।

আগা আদিত বেশ রসিয়ে রসিয়ে আবৃত্তি করে গেলেন—

'খুদা তুমি দিলি বহৎ জ্ঞান,

শেব রহস্য এই ব্যারেতে কর সমাধান।

ইরান দেশের লোক

কসম খেয়ে বলতে পারি নয় এরা উজবোক।

বিদো আছে, বৃত্তি আছে, সাহস আছে ঢের

সিঁড়ি লাড়ে, মোকাবেলা করে ইংরেজের।

তবে কেন ঢুকতে গেলেই ঘরে

সবাই এমন হেলটেলি করে?'

দোরের গোড়ায় থমকে দাঁড়ায় ভিতর পানে চায়,



‘আপনি চলুন’, ‘আপনি ঢুকুন’ দাঁড়িয়ে কিন্তু ঠায়।

হাসি-খুশী বন্ধ হঠাৎ গম্প সে যায় থেমে
ঠেলাঠেলির মধ্যখানে উঠেছে সবাই থেমে।

অবাক হয়ে ভাবি সবাই কেন এমন করে,
দিবা-দ্বিপ্রহরে

কি করে হয় ঘরের মাঝে ভূত?

তবে কি যমদূত?

সলমনের জিন?

কিন্ধা গিলটিন?

ঢুকলে পরেই কপাহ করে কেটে দেবে চলা।

তাই দেখে কি দোরে এসে বন্ধ সরার চলা?’

একুশ

কাবুলের রাস্তাঘাট, বাজারহাট, উজীরনাজির, গুরুচণ্ডালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হল বটে, কিন্তু গোটা দেশের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আশা দেখলুম কম, আর নগর জনপদ উভয় ক্ষেত্রে যে-সব অদৃশ্য শক্তি শাস্তির সময় মদ গতিতে এবং বিদ্রোহিবল্লবের সময় দুর্বীর বেগে চলে সেগুলোর ভাল ধরা বুঝলুম আরো শক্ত, প্রায় অসম্ভব।

আফগানিস্তানের মেরুদণ্ড তৈরী হয়েচে জনপদবাসী আফগান উপজাতিদের নিয়ে, অথচ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা, আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী, আচারব্যবহারের স্ববন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো কেতাব লেখা হয়নি; কাবুলে এমন কোনো গুণীরও সন্ধান পাইনি যিনি সে স্ববন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করুন আর নাই করুন অন্তত একটা মোটামুটি বর্ণনাও দিতে পারেন। ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কাবুলীরা প্রায়ই বলেন, ‘তারপর শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করল’, কিন্তু যদি তখন প্রশ্ন করেন, বিদ্রোহ করল কেন, তবে উত্তর পাবেন, ‘মোল্লারা তাদের খ্যাপালো বলে’, কিন্তু তারপরও যদি প্রশ্ন শুধান যে, উপজাতিদের ভিতরে এমন কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উচ্চ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মোল্লাদের ফুলকি দেশময় আগুন ধরাতে পারল, তাহলে আর কোনো উত্তর পাবেন না। মাত্র একজন লোক—তিনিও ভর্তুকী—(আমাকে বলেছিলেন ‘মোদা কথা হচ্ছে এই যে বিদেশের পণ্যবাহিনী লুটতরাজ’ না করলে গরীব আফগানের দলে না বলে সভ্যদেশের ট্রেড-সাইক্লের মত তাদেরও বিলাব আর শাস্তির চেলাই-ওতরাই নিয়ে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়।’

গ্রামের অবস্থা যেটুকু শুনতে পেলুম তার থেকে মনে হল শাস্তির সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে শহরবাসীর মাত্র এইটুকু যোগাযোগ যে, গ্রামের লোক শহরে এসে তাদের ফসল, ডরকারী, দুগ্ধা, ভেড়া বিক্রয় করে সস্তা দরে, আর সামান্য যে দু-একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য না কিনলেই নয়, তাই কেনে আত্রা দরে। সভ্যদেশের শহরবাসীরা বাদকাবীর বদলে গ্রামের জন্য ইন্সকুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেয়। কাবুলের গ্রামে সরকারী কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বললেই হয়। কতকগুলো ছোট সকাপলেনো গায়ের মসজিদে জড়ো হয়ে গলা ফাটিয়ে আমাপারা (কোরানের শেষ অধ্যায়) মুখস্থ করে—এই হল বিদ্যাচর্চা। তাদের তলারক করনেওয়ালো মোল্লাই গায়ের ডাক্তার। অসুখ-বিসুখে তাবিজ-কবর তিরাই লিখে নেন। বায়ো শক্ত হল পানি-পড়ার বদোবস্ত, আর মরে গেলে তিনিই তাকে নাইয়ে ধুয়ে গোর দেন।

মোল্লাকে পোষে গায়ের লোক।

যাকনা দিয়ে তার বদলে আফগান গ্রাম যখন কিছুই ফেরত পায় না তখন যে সে বড় খনিদ্বায় সরকারকে টাকাটা দেয় এ কথাটা সকলেই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

দেশময় অশান্তি হলে আফগান-গায়ের সিকি পয়সার ক্ষতি হয় না—বরঞ্চ তার লাভ। রাইফেল কাঁধে করে জেয়ানারা তখন লুটে বেয়ো—‘বিধিদন্ত’ আফগানিস্তানের অশান্তিও বিধিদন্ত, সেই হিড়িকে দুপয়সা কামাতে আস্তি কি? ফ্রান্স-জর্মনিতে লড়াই লাগলে যে রকম জর্মনরা মাচ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠেঁচিয়ে বলে, ‘নাথ্ পারিঙ্ক, নাথ্ পারিঙ্ক’, ‘প্যারিস চলে, প্যারিস চলে’, আফগানরা তেমনি বলে, ‘বি আ ব কাবুল, ব রওম ব কাবুল’, ‘কাবুল চলে, কাবুল চলে।’

শহরে বসে আছেন বাদশা। তাঁর প্রধান কর্ম আফগান উপজাতির লুটন—লিপাকে দমন করে রাখা। তার জন্য সৈন্য দরকার, সৈন্যকে মাইনে দিতে হয়, গোলাগুলীর খরচা জো আছেই। শহরের লোক তার খানিকটা যোগায় বটে কিন্তু মোটা টাকাটা আসে গা থেকে।

তাই এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হয়। খাজনা তোলায় জন্য সেপাই দরকার, সেপাই পোষার জন্য খাজনাদার দরকার। এ-চক্র যিনি ভেদ করতে পারেন তিনিই যোগীবর, তিনিই আফগানিস্তানের বাদশা। তিনি মহাপুরুষ সন্দেহ নেই; যে আফগানের দাঁতের গোড়া জড়াবর জন্য তিনি শিলিনোড়া কিনতে চান সেই আফগানের কাছ থেকেই তিনি সে পয়সা আদায় করে নেন।

যানি থেকে যে তেল বেয়ো, যানি সচল রাখার জন্য সৌকু এই যানিতেই চলে দিতে হয়।

সামান্য যেটুকু বাড়ে তাই দিয়ে কাবুল শহরের জেলুশ।
কিন্তু সে এতই বলে যে, তা দিয়ে নুতান নুতান শিশু গড়ে তোলা যায় না, শিক্ষাদীকার জন্য ব্যাপক কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায় না। কাজেই কাবুলে শিক্ষিত সম্প্রদায় নেই বললেও চলে।

কিন্তু তাই বলে কাবুল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বর্বর একথা বলা ভুল। কাবুলের মোল্লা সম্প্রদায় ভারতবর্ষে আফগানিস্তানের যোগাযোগের ভগ্নাবশেষ।
কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

কাবুলের দরবারী ভাষা ফার্সী, কাজেই সাধারণ বিদেশীর মনে এই বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক যে, কাবুলের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক ইরানের সঙ্গে। কিন্তু ইরান শীঘ্র মতবাদের অনুরাগী হয়ে পড়ায় সুদূর আফগানিস্তান শিক্ষাদীকার পাওয়ার জন্য ইরান যাওয়া বন্ধ করে দিল। অথচ দেশ গরীব, আপন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মত সামর্থ্যও তার কোনো কালে ছিল না।

এদিকে পাঠান, বিশেষ করে মোগল যুগে ভারতবর্ষের এশ্বর্ষ দিল্লী লাহোরে ইসলাম ধর্মের সুদী শাখা নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। শিক্ষাদানের মাধ্যম ফার্সী; কাজেই দলে দলে কাবুল কদাছারের ধর্মজ্ঞানপিপাসু ছাত্র ভারতবর্ষে এসে এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; পূর্ববর্তী যুগে কাবুলীরা বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য তকশিলায় আসত—আফগানিস্তানে যে সব প্রাচীন প্রাচীর-চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অজস্তর্যে এতিহ্যে আঁকা, চাঁপ বা ইরানের প্রভাব তাতে নগণ্য।

এই ঐতিহ্য এখনো লোপ পাওয়া। কাবুলের উচ্চশিক্ষিত বৌদ্ধব্রাহ্মণ ইরানে শিক্ষিত ও যদিও ছাত্রবৃত্তায় ফার্সীর মাধ্যমে এদেশে জনার্চ্য করে গিয়েছেন, তবু সঙ্গে সঙ্গে দেশজ

উর্দু ভাষাও শিখে নিয়ে গিয়েছেন। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের উপর এঁদের প্রভাব অসীম এবং গ্রামের মোল্লাই আফগান জাতির দৈনন্দিন জীবনের চক্রবর্তী।

বিশেষ শতাব্দীর শিক্ষিত জগৎ ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিদায় পঞ্চমুখ। এরা নাকি সর্বপ্রকার প্রকৃতির শত্রু, এঁদের দৃষ্টি নাকি সব সময় অতীতের দিকে ফেরানো এবং সে অতীতও নাকি মানুষের সুখদুখে মেশানো, পতনঅভ্যুদয়ে গড়া অতীত নয়, সে অতীত নাকি আকাশকুসুমজাত সত্যযুগের শাস্ত্রীর অচল্যয়তনের অঙ্ক-প্রাচীর নিরুদ্ভক।

তুলনাাত্মক ধর্মশাস্ত্রের পুস্তক লিখতে বসিনি, কাজেই পৃথিবীর সর্ব ধর্ম-যাজক সম্প্রদায়ের নিদা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়। কিন্তু আফগান মোল্লার একটি সাফাই না গাছলে অনায়াস করা হবে।

সে-সাফাই তুলনা দিয়ে পেশ করলে আমার বক্তব্য খোলাসা হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কর্ণধার ছিলেন মৌলবী-মোল্লা, শাস্ত্রী-ভট্টাচার্য। কিন্তু এরা দেশের লোককে উত্তেজিত করে ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেননি অর্থাৎ আফগান মোল্লার কট্টর দূশমনও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইংরেজকে তিন-তিনবার আফগানিস্থান থেকে কান ধরে বের করবার জন্য প্রধানত দায়ী আফগান মোল্লা।

আহা, আহা! এর পর আর কি বলা যেতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না। এর পর আর আফগান মোল্লার কেন লোম ক্ষমা না করে থাকা যায়? কমজোর কলম আফগান মোল্লার তারিফ গাইবার মত ভাষা খুঁজে পায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছেন এমন লোক আফগানিস্থানে দু'ডজন হবেন কিনা সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি থাকে তখন এঁদের দেখে মনে হয়, এঁরাই বুঝি সমস্ত দেশটা চালাচ্ছেন, অশান্তি দেখা গেলেই এঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের সঙ্গে আলাপচারি হল; দেখলুম প্যারিসে তিন বৎসর কাটিয়ে এসে এঁরা মার্শেল প্রুস্ত, আল্ফ্রে জিদের বই পড়েন নি, বার্লিন-ফের্টা ডুরারের নাম শোনেননি, রিলকের কবিতা পড়েননি। মিস্টন বাম্বীকি মিলিয়ে মধুসূদন যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তারই মত গ্যেট ফিরদৌসী মিলিয়ে কাব্য রচনা করার মত লোক কাবুলে জন্মাতো এখনো ঢের বাকী।

তাহলে দাঁড়ানো এইঃ—বিদেশফের্তা জ্ঞান পল্লবগ্রাহী, এবং দেশের নাজীর সঙ্গে এঁদের যোগ নেই। মোল্লাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত,—যারা পণ্ডিত তাঁদের সাতখুন মাফ করলেও প্রশ্ন থেকে যায়, ইংরেজ রুশকে ঠেকিয়ে রাখাই কি আফগানিস্থানের চরম মোক্ষ? দেশের ধনদৌলত বাড়িয়ে শিক্ষাসভ্যতার জন্য যে প্রচেষ্টা, যে আন্দোলনের প্রয়োজন মৌলবী-সম্প্রদায় কি কোনদিন তার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারবেন? মনে তো হয় না। তবে কি বাধা দেবেন? বলা যায় না।

পৃথিবীর সব জাত বিশ্বাস করে যে, তার মত ভূবনবরণ্য জাত আর দুটো নেই; গরীব জাতের তার উপর আরেকটা বিশ্বাস যে, তার দেশের মাটি খুঁড়লে সোনা রূপো তেল শেরাব তার জেরে সে বাকী দুনিয়া, ইন্তেক চরসুয় কিনে ফেলতে পারবে। নিরপেক্ষ বিচারে জোর করে কিছু বলা শক্ত কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কিছু না বোঝায় তবে আফগানিস্থানের পক্ষে ধনী হয়ে শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার করার অন্য কোনো সামর্থ্য নেই।

সত্যযুগ মহাপুরুষরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, কলিযুগে গণকণ্ঠস্বর করে। পাকাপাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস আমার নেই তবু অনুমান করি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে শক্তিশালী হওয়া মাত্র আবার আফগানিস্থান ভারতবর্ষে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাবুল

কন্দাহারের বিন্দাখারী আবার লাহোর দিল্লীতে পাড়াশুনা করতে আসবে।

প্রমাণ? প্রমাণ আর কি? প্যারিস-বাসিন্দা ইংরাজী বলে না, ভিয়েনার লোক ফরাসী বলে না, কিন্তু বুড়াপেন্সের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনো জর্মনি বলেন, জ্ঞানান্বেষণে এখনো ভিয়েনা যান—ভিন্ন রাষ্ট্র নির্মিত হলেই তো আর ঐতিহ্য-সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলা যায় না। কাবুলের মৌলবী-সম্প্রদায় এখনো উর্দু বলেন, ভারতবর্ষ বর্জন করে এঁদের উপায় নেই। কণ্ঠ্য যদি করেন তবে সে তিনদিনের তরে।

উর্দু যে এদেশে একদিন কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পেলুম হাতেনাতে।

বাইশ

আগেই বলেছি, আমার বাসা ছিল কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে—সেখান থেকে আরো মাইল দুই দূরে নূতন শহরের পশ্চিম ছিল। সেখানে যাবার চওড়া রাস্তা ছিন্ন বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। অনেক পরিসা খরচ করে অতি যত্নে তৈরী রাস্তা। দুদিকে সারি-বাঁধা সাইপ্রেস গাছ, স্বচ্ছ জলের নালা, পায়ে চলার আলাদা পথ, ঘোড়সোয়ারদের জন্যও পৃথক বন্দোবস্ত।

এ রাস্তা কাবুলীদের বলভার। বিকেল হতে না হতেই মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, বাইসিকেল, ঘোড়া চড়ে বিস্তর লোক এ রাস্তা ধরে নূতন শহরে যাওয়া যেতে যায়। হেঁটে বেড়ানো কাবুলীরা পছন্দ করে না। প্রথম বিদেশী ডাক্তার যখন এক কাবুলী রোগীকে হজমের জন্য বেড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন তখন কাবুলী নাকি প্রশ্ন করেছিল যে, পায়ের পেশীকে হায়রান করে পেটের অন্ন হজম হবে কি করে?

বিকেলবেলা কাবুল না গেলে আমি সাইপ্রেস সারির গা ধেঁবে ধেঁবে পায়চারি করতুম। এসব জায়গা সম্ভার পর নিরাপদ নয় বলে রাস্তায় লোক চলাচল তখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

এক সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছি তখন একখানা দামী মোটর ঠিক আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ান। স্টিয়ারিংকে এক বিরাট বপু কাবুলী অভ্যলোক, তাঁর পাশে মেমসাহেবের পোষাকে এক ভদ্রমহিলা—হাটের সামনে খুলানো পাড়লা পর্দার ভিতর দিয়ে যৌকু দেখা গেল তার থেকে অনুমান করলুম, ভদ্রমহিলা সাধারণ সুন্দরী না।

নমস্কার অভিধান কিছু না, ভদ্রলোক সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফাসী বলতে পারেন?'

'আমি বললুম, 'অপ্প-স্বাপ্প।'

'দেশ কোথায়?'

'হিন্দুস্থান।'

তখন ফাসী ছেড়ে ভদ্রলোক ভুল উর্দুতে, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রায়ই আপনাকে অবৈলয় এখনো দেখতে পাই। আপনি বিদেশী বলে হয়ত জানেন না যে, এ জায়গায় সম্ভার পর চলাফেরা করতে বিপদ আছে।'

আমি বললুম, 'আমার বাসা কাছেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি করে হয়?' এখানে তো অজ পাড়াগা—চাষাভূষার থাকে।' আমি বললুম, 'বাদশা এখানে কৃষিবিভাগ খুলেছেন—আমরা জনতিনেক বিদেশী এক সঙ্গে এখানেই থাকি।'

আমার কথা ভ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ফাসীতে তক্তমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি হ্যাঁ, না, কিছুই বলছিলেন না।

তারপর জিজ্ঞাস করলেন, কবুল শহরে দোস্ত-আশনা নেই? একা একা বেড়ানোতে দিল হারান হয় না? আমার বিবি বলছিলেন, 'বাচ্চা গম্ব মীখুদ-ছেলোটার মনে সুখ নেই।' তাহলে আপনার সঙ্গে আলাপ করলুম।' বুললুম, ভদ্র মহিয়ার সৌন্দর্য মাতৃদেহের সৌন্দর্য। নিতু হয়ে আবদবতলিমাতে জানালুম।

ভ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেনিস খেলতে পারেন?'

'হ্যাঁ।'

'তবে কবুলে এলেই আমার সঙ্গে টেনিস খেলে যাবেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক ধনাবাদ-কিন্তু আপনার কোট কোথায়, আপনার পরিচয়ও তো পেলুম না।'

ভ্রলোক প্রথম একটু অবাক হলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, আমি? ওঃ, 'আমি? আমি মুইন-উস-সুলতানে। আমার টেনিস-কোর্ট ফরেনে অফিসের কাছে। কাল আসবেন। বলে আমাকে ভালো করে ধনাবাদ দেবার ফুর্তি না দিয়েই মোটার হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, মোটারের প্রায় বিশ গজ পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ভৃত্য আবদুর রহমান আরোলেরের প্রপেনারের বেগে দু'হাত নেড়ে আমাকে কি বুঝাবার চেষ্টা করছে। মোটার চলে যেতেই এঞ্জিনের মত ছুটে এসে বলল, 'মুইন-উস-সুলতানে, মুইন-উস-সুলতানে!'

'আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'লোকটি কে বটেন?'

আবদুর রহমান উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হয় আর কি। আমি যতই জিজ্ঞাসা করি মুইন-উস-সুলতানে কে, সে ততই মস্তোক্তারণের মত শুধু বলে, মুইন-উস-সুলতানে, মুইন-উস-সুলতানে। শেষটায় নৈরাশ্য, অনুযোগ, ভর্তসনা মিশিয়ে বলল, 'চেনেন না বরাদের-আলা-হজরত, বাদশার ভাই-বড় ভাই। আপনি করেছেন কি? রাজবাড়ির সঙ্কলের হাতে চুম্মা খেতে হয়।'

আমি বললুম, 'রাজবাড়িতে লোক সবসুদ্ধ ক'জন না জেনে তো আর চুম্মা খেতে আরম্ভ করতে পারিনে। সকলের পোষাবার আগে আমার ঠোঁট ক্ষয়ে যাবে না তো?'

আবদুর রহমান শুধু ব্রলে, 'হ্যাঁ আল্লা, ইয়া রসুল, করেছেন কি, করেছেন কি?'

আমি জিজ্ঞাস করলুম, 'তা উনি যদি রাজার বড় ভাই-ই হবেন তবে উনি রাজা হলেন না কেন?'

আবদুর রহমান প্রথম মুখ বন্ধ করে তার উপর হাত রাখল, তারপর ফিসফিস করে বলল, আমি গ্রহণ্য তার কি জানি; কিন্তু, এসব কথা শুধোতে নেই।'

সে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আবদুর রহমান যখন ঘরের এক কোণে বাদামের খোসা ছাড়তে বসল তখন তার মুখেই এক মুইন-উস-সুলতানের কথা ছাড়া অন্য কিছু নেই। দু'তিনবার ধমক দিয়ে হার মানলুম। বুললুম, সরল আবদুর রহমান মনে করেছি, অকথ্যগানিনা যখন কাকামালাপালার শেখ, অর্থাৎ বড়লোকের কেন্দ্রলকে পেলে সব কিছু হাসিল হয়ে যায় তখন আমি রাতারাতি উজীরনাজির কেউ-কোটা, কিছু না-কিছু একটা হয়ে যাই যাব।

ততক্ষণে অভিধান খুলে দেখে নিয়েছি মুইন-উস-সুলতানে সমাসের অর্থ 'যুবরাজ।'

যুবরাজ রাজা হলেন না, হলেন ছোট ভাই। সমস্যটার সমাধান করতে হয়।

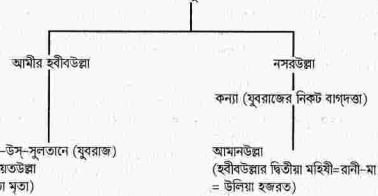
তেইশ

মুইন-উস-সুলতানে বা যুবরাজ রাজা না হয়ে ছোট ছেলে কেন রাজা হলেন সে-সমস্যার সমাধান করতে হলে খানিকটা পিছিয়ে এ-শতকের গোড়ায় পৌঁছতে হয়।

বাঙালী পাঠক এখানে একটু বিপদগ্রস্ত হবেন। আমি জানি, বাঙালী—তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন—আরবী ফাসী মুসলমানী নাম মনে রাখতে বা বানান করতে অল্পবিস্তর কাতর হয়ে পড়েন। একথা জানি বলেই এতক্ষণ যতদূর সম্ভব কম নাম দিয়েই নাড়াছাড়া করেছি—বিশেষতঃ আনাতোল ফ্রান্সের মত গুণী যখন বলেছেন, 'পাঠকের কাছ থেকে বাক্য বেশী মনোযোগ আশা করো না, আর যদি মনস্কপানাই এই হয় যে, তোমার লেখা শত শত বছর পরেই গিয়ে পরবর্তী যুগে পৌঁছুক তাহলে হাফ্ফা হয়ে ভ্রমণ করো।' আমার সে-বাসনা নেই, কারণ ভাষা এবং শৈলী বাবে আমার অক্ষমতা সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন। কাজেই যখন ক্ষমতা নেই, বাসনাও নেই তখন পাঠকের নিকট দৃষ্টি মনোযোগ প্রত্যাশা করতে পারি। মৌসুমী ফুলই মনোযোগ চায় বেশী; দু'দিনের অতিথিকে তোয়াজ করতে মহা কল্পস্রুও রাজী হয়।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন আফগানিস্তানের কর্তা বা আমীর ছিলেন হবীবউল্লা। তাঁর ভাই নসরউল্লা মোল্লাদের এমনি খাস-পেয়ারা ছিলেন যে, বড় ছেলে মুইন-উস-সুলতানে তাঁর মরার পর আমীর হবেন এ-যোষণা হবীবউল্লা বুকে হিম্মৎ বেধে করতে পারেননি। বরঞ্চ দুই ভায়ে এই নিশ্পত্তিই হয়েছিল যে, হবীবউল্লা মরার পর নসরউল্লা আমীর হবেন, আর তিনি মরে গেলে আমীর হবেন মুইন-উস-সুলতানে। এই নিশ্পত্তি পাকা-পোক্ত করার মতলবে হবীবউল্লা নসরউল্লা দুই ভাইয়ে মীমাংসা করলেন যে,

আমীর আবদুর রহমান



মুইন-উস-সুলতানে নসরউল্লার মেয়েকে বিয়ে করবেন। হবীবউল্লা মনে মনে বিচার করলেন, আর যাই হোক, নসরউল্লা, জামাইকে বুন করে 'দামাদ-কুশ' (জামাতাহতা) আখ্যায় কলঙ্কিত হইতে চাইবেন না। ঐতিহাসিকদের স্বন্দর থাকতে পারে যোধপুরের রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে জামাই দিল্লীর বাদশাহ ফররুখ সিয়াকের নিহত করেন তখন দিল্লীর ছেলে-বুড়ার 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ' টিঁককরে

অজিত হয়ে শেষটায় তিনি দিল্লী ছাড়তে বাধ্য হন। রাস্তার ডোপো ছোঁয়ারা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিং-এর পাঙ্কির দুশপাশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলত আর সেপাই-বরকদাজের তপশী-তপস্বাকে বিলকুল পরোয়া না করে তারপরে একতানে 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ' বলে অজিত সিংহকে ক্ষেপিয়ে তুলত।

হবীবউল্লা, নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতানে তিনজনই এই চুক্তিতে অস্বপ্নবিস্তার সঙ্কট হলেন। একদম নারাজ হলেন মাতৃহীন মুইন-উস-সুলতানের বিমাতা। হা নি আমানউল্লার মা হবীবউল্লার দ্বিতীয়া মহিবি। আফগানিস্তানের লোক একে রানী-মা বা উলিয়া হুজুরত নামে ডিত। এর দামটে আমীর হবীবউল্লার মত বাগধরু কুরবানির বকরি অর্থাৎ বলির পাঠার মত কাঁপতেন। একবার গোসা করে রানী-মা যখন নদীর ওপারে গিয়ে তাঁবু বাটান তখন হবীবউল্লা কোনো কৌশলে তাঁর বিনার না লাগাতে পেরে শেষটায় এপারে বসে পাগলের মত সর্বান্তে ধুলো-কাদা মেখে তাঁর সংগ-দিল বা পাখা হুময় গলাতে সমর্থ হয়েছিলেন। রানী-মা স্থির করলেন, এই সংসারকে যখন ওমর খৈয়াম দাবাখেলার হকের সঙ্গে তুলনা করেছেন তখন নসরউল্লা এবং মুইন-উস-সুলতানের মত দুই জঙ্ঘর বুটিকে বায়েল করা আমানউল্লার মত নগণ্য বড়ের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। তাঁর পক্ষেই বা রাজা হওয়া অসম্ভব হবে কেন?

এমন সময় কাবুলের সেয়া খানদানী বংশের মুহম্মদ তজী সিরিয়া নির্বাসন থেকে দেশে ফিরলেন। সঙ্গে পরীর মত তিন কন্যা, কাওবাব, সুরাইয়া আর বিবি খুর্দ। এরা দেশবিশেষ লেখেছেন, লেখাপড়া জানেন, রাজ-পাউডার ব্যবহারে ওকিবহাল; এঁদের উদয়ে কাবুল কুমারীদের চেহারা অত্যন্ত স্পান, বেজীলুস, 'অমাজিত' বা 'অনকলচরী' (অজ জঙ্ঘল বর আমদেহ = যেন জঙ্ঘলী) মানে হতে লাগল।

হবীবউল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমানউল্লা মা-য়দিও আসলে চিত্রায়া মহিবি, কিন্তু মুইন-উস-সুলতানের মামর মৃত্যুতে প্রধান মহিবি হয়েছেন—এক বিরাট ভোজের বন্দোস্ত করলেন। অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে পই পই করে বুঝিয়ে দিলেন, যে করেই হোক মুইন-উস-সুলতানকে তজীর বড় মেয়ে কাওবাবের দিকে আকৃষ্ট করতেই হবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনচে কন্যাতে দু-একটা কমরা বিশেষ করে খালি রাখা হল। সেখানে কেউ যেন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হয়।

খামাশিনা চলল, গানাবাজনায় রাজবাড়ি সরগরম। রানী-মা নিজে মুইন-উস-সুলতানকে কাওবাবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর কাওবাবকে ফিস ফিস করে কান কান বলেলন, 'হিনহী' বুরাজ, আফগানিস্তানের তখৎ একদিন এরই হবে। কাওবাব বুজিমতী মেয়ে, ক'সের গমে ক'সের ময়দা হয় জানতেন, আর না জানলেই বা কি, শব্দকরাচার্য তরুণতরুণীর প্রধান বৃত্তি সম্পক্ষে যে মোক্ষম তত্ত্ব বলেছেন সেটা রাজপ্রাসাদের ওঠে।

'ল্যানট' ঠিক উতরে গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ধুরতে ধুরতে মুইন-উস-সুলতানে কাওবাবের সঙ্গে পুরী এক নিভৃত কক্ষে বিশ্রুলাপে মশগুল হলেন। মুইন ভাবলেন, শূশ-এখতেয়ারে নিভৃত কক্ষে ঢুকছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে ক্রীডম অব উইল), রানী-মা জানতেন, শিকার জালে পরছে (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে ক্যান্ডন ডেসটিন)।

'ল্যানমাফিকি' রানী-মা হঠাৎ যেন বেখখোলে সেই কামরায় ঢুক পড়লেন। তরুণতরুণী একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালেন। রানী-মা সোহাগ মেখে অমিয়া ছেনে সতীনপোকে বললেন, 'বাচ্চা তোমার না নেই, আমিই তোমার মা। তোমার মুখদুগ্ধের তখা আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে? তোমার বিয়ের তার তো আমার কাঁধেই। কাওবাবকে

যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তবে এত লজ্জা পাছ কেন? তজীর মেয়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়ে তো কাবুলে আর নেই। তোমার দিল কি বলে?'

দিল আর কি বলবে? মুইন তখন ফাটা ধাঁশের মাঝখানে।

দিল যা বাবে বলুক। মুখে কি বলেছিলেন, সে সম্পক্ষে কাবুল চারপায়া পক্ষমুখ। কেউ বলেন, নীরবতা দিয়ে সম্পক্ষে দেখিয়েছিলেন; কেউ বলেন, মদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ, জানতেন; নসরউল্লার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে; কেউ বলেন, মিনমিন করে সম্মতি জানিয়েছিলেন, কারণ ঠিক তার এক লহমা আগে ভালোমন্দ না ভেবে একওকাকে প্রেম-নিবেদন করে বসেছিলেন—হয়ত ভেবেছিলেন, প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া—এখন এভাবে কি করে? কেউ বলেন, শুধু 'উ ই উ ই' করেছিলেন, তার থেকে হস্ত-নীত ('ই-না',—যে কথা থেকে বাঙলা 'হেস্তনেছ' বেরিয়েছে) কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না; কেউ বলেন, তিনি রামাঙ্গলা ভালো করে কিছু প্রকাশ করার আগেই রানী-মা কামরা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ কাবুল চারপায়ে পক্ষমুখ পক্ষতন্ত্রের কাহিনী বলে।

মোক্ষা কথা এই, সে অবস্থায় আমীর হোক, ফকীর হোক, ঘুঘু হোক, কবুতর হোক, আর পাঁচজন গুরুজনের সামনে পড়লে যা করে থাকে বা বলে থাকে মুইন-উস-সুলতানে তাই করেছিলেন।

কিন্তু কি করে বলেছিলেন সে কথা জানার যত না দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী জানা দরকার, রানী-মা মজলিসে ফিরে গিয়ে সে-বলা বা না-বলার কি অর্থ প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকসটবুক কি-বলে না-বলে সেটা অবাস্তব, জীবনে কাজে লাগে বাজারের গাইড-বুক।

রানী-মা পর্দার আড়ালে থাকা সহ্যও যখন তামাম আফগানিস্তান তাঁর কষ্টধর স্তনতে পেত তখন মজলিসের হয়েল্যোনে যে তাঁর গলার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাতে আর কি সম্ভব? রানী-মা বললেন, 'আজ বড় আনন্দে দিন। আমার চোখের জ্যোতি (মুর-ই-চশম) ইনায়েতউল্লা খান, মুইন-উস-সুলতানে তজীকন্যা কাওবাবকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন। খান-মজলিস মদুরে সমার ভাঙার কথা ছিল, সে বন্দোবস্ত বাতিল। ফজরের নামাজ (সূর্যোদয়) পর্যন্ত আজকের উৎসব চলেবে। আজ রাতেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাইছি'।

মজলিসের আড়বাতি ঘিণ্ডণ আভায় ছলে উঠল। চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছাস, হর্ষধ্বনি। দান্দশাদী ছুটলো বিয়ের তরুর তত্তবাসন করতে। সব কিছু সেই দুপুর রাতে রাজবাড়িতেই পাওয়া গেল। আশ্চর্য হওয়ার সাহস কার?

তজী হাতে স্বর্গ পেলেন। কাওবাব স্বল্পে স্বর্গ পেয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা হবীবউল্লার কাছে 'সুসংবাদ' জানিয়ে দুত পাঠালেন। মা ও রাজমহিষীরূপে তিনি মুইন-উস-সুলতানের হৃদয়ের গতি কোন দিকে জানতে পেরে তজীকন্যা কাওবাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির করেছেন। 'প্রগতিশীল' আফগানিস্তানের তাঁর রাজমহিষী সুশিক্ষিতা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন কুমারী নেই যিনি কাওবাবের কাছে দাঁড়াতে পারেন। প্রথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান বুদাতালায় মেয়েহবনীতে সুসম্পন্ন হয়েছে। মহারাজ অতিসহর রাজধানীতে ফিরে এসে 'আকদ-রসুমানের' (আইনতত্ত্ব পূর্ণ বিবাহ) দিন ঠিক করে পৌরজনের হর্ষবর্ধন করল।

হবীবউল্লা তো রেগে উঃ। কিন্তু কাওজ্ঞান হারালেন না। আর কেউ বুঝুক না-বুঝুক, তিনি বিলকণ টের পেলেন যে, মূর্খ মুইন-উস-সুলতানে কাওবাবের প্রেমে পড়ে নসরউল্লার

মেয়েকে হারায়নি, হারাতে বসেছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবীবউল্লা মদিও সাধারণত পঞ্চ মদকার নিয়ে মত্ত থাকতেন তবুও তাঁর বৃদ্ধিতে বিলম্ব হল না যে, সমস্ত যুঁয়ুস্বের পিছনে রয়েছেন মহিষী। সংসার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না।

সতী নারী কথা গুলি

মধুরসের বাণী

তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন

উপর থেকে পানি।

পানি-ঢালা দেখেই হবীবউল্লা বৃদ্ধতে পারলেন, গুঁড়িটা নিচয়ই কাটা হয়েছে।

রাগ সামলে নিয়ে হবীবউল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন—

‘যুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেবে, মহিষী শুভবুদ্ধি প্রদানিতা হয়ে এই বিয়ে স্থির করেছেন। তজীকন্যা কাওকাব যে সব দিক দিয়ে মুহীন-উস-সুলতানের উপযুক্ত তাতে আর কি সন্দেহ? কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, তজীর মেজো মেয়ে সুরাইয়াও তো সুশিক্ষিতা সুরূপা; সুমাজিরা। দ্বিতীয় পুত্র আমানউল্লাহ যা খাস কাবুলী জব্বলী মেয়ে বিয়ে করবেন কেন? তাই তিনি মহিষীর মহন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুরাইয়ার সঙ্গে আমানউল্লার বিয়ে স্থির করে এই চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তজীর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান্ছেন। সত্তর রক্তদানীতে ফিরে এসে তিনি স্বপ্ন’ ইত্যাদি।

হবীবউল্লা বৃদ্ধতে পেরেছিলেন, রানী-মার মতলব মুহীন-উস-সুলতানের স্বক্কে কাওকাবকে চাপিয়ে দিয়ে, আপন ছেলে আমানউল্লার সঙ্গে নসরউল্লার মেয়ের বিয়ে দেবার। তাহলে নসরউল্লার মরার পর আমানউল্লার আমীর হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। হবীবউল্লা সে পথ বন্ধ করার জন্য আমানউল্লার স্বক্কে সুরাইয়াকে চাপিয়ে দিলেন। যে রানী-মা কাওকাবের বিদেশী শিক্ষাদানীয় প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি সুরাইয়াকে ঠেকিয়ে রাখবেন কোন লজায়? বিশেষ করে যখন চিত্রসজ্জা থেকে বাগ-ই-বাল পথস্ত্র সুবে কাবুল জানে, সুরাইয়া কাওকাবের চেয়ে দেখতে সুনতে পড়াশোনার অনেক ভালো।

রানী-মার মন্তকে বজ্রঘাত। বড়ের কিত্তিতে রাজাকে মাত করতে গিয়ে তিনি যে প্রায় চাল-মাতের কাহাফাছি। হবীবউল্লাকে প্রাণঘণে অভিসপাত দিলেন, ‘নসরউল্লার মেয়েকে তুই পেলিনি, আমিও পেলুম না। তবু মন্দের ভালো। নসরউল্লার কাছে এখন মুহীন-উস-সুলতানে আর আমানউল্লা দুজনই বরাবর। মুহীন-উস-সুলতানের পাশা এখন আর নসর-কন্যার সীসায় ভারী হবে না তো।—সেই মন্দের ভালো।’

দাবা খেলায় ইংরাজীতে যাকে বলে ‘গ্রেটিঙ মুড’ রানী-মা সেই পথ অবলম্বন করলেন।

চবিশ

এর পূর্বের অধ্যায় আরম্ভ হয় ভারতবর্ষের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে নিয়ে।

১৯১৫ সালের মাঘামাসি জন্মন পররাষ্ট্র বিভাগ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের উপদেশ মত হিয়ার করলেন যে, কোনো গতিকে যদি আমীর হবীবউল্লাকে বিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করানো যায় তাহলে ইংরেজের এক ঠাণ্ড খোঁজ করার মতই হবে। ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা পাবার লোভে বিদ্রোহ করুক আর নাই করুক, ইংরেজকে অন্তত একটা পুরো বাহিনী পাঞ্জাবে রাখতে হবে—তা’হলে তুক্রা মধ্য-প্রান্তে ইংরেজকে কাবু করে আনতে পারবে। ফলে যদি সুয়েজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইংরেজের দুপাশীই খোঁড়া হয়ে যাবে।

মহেন্দ্রপ্রতাপ অবশ্য আশা করেছিলেন যে, আর কিছু হোক না হোক ভারতবর্ষ যদি ফাঁকতালে স্বাধীনতা পেয়ে যায় তাহলেই যথেষ্ট।

কাইজার রাজাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, স্বর্ণ-পিপল মেডেল পরিবে একদল জর্মনি কুটনৈতিকের সঙ্গে আফগানিস্তান রওয়ানা করিয়ে দিলেন। পথে রাজা তুক্রীর সুলতানের কাছ থেকেও অনেক আদর-আপ্যায়ন পেলেন।

কিন্তু পূর্ব-ইরান ও পশ্চিম আফগানিস্তানে রাজা ও জর্মনিদলকে নানা বিপদ-আপদ, ফাঁড়া-গদিশ কাটিয়ে এগতে হল। ইংরেজ ও রুশ উভয়েই রাজার দৌতোর খবর পেয়ে উত্তর দক্ষিণ দুদিক থেকে হানা দেয়। অসম্ভব দুঃখকষ্ট সহ্য করে, বেশীরাভাগ জিনিসপত্র পথে ফেলে দিয়ে তারা ১৯১৫ সালের শীতের শুরুতে কাবুল পৌঁছান।

আমীর হবীবউল্লা বাদশাহী কাযদায় রাজাকে অভ্যর্থনা করলেন—তামাম কাবুল শহর রাস্তার দুপাশে ভিড় লাগিয়ে রাজাকে তাহলের আনন্দ-অভিবাদন জানালো। বাবুর বাদশাহত্বের কবরের কাছে রাজাকে হবীবউল্লার এক খাস-প্রাসাদে রাখা হল।

কাবুলের লোক সহজে কাউকে অভ্যর্থনন করে না। রাজার জন্য তারা যে ঘটনার পর ঘণ্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তার প্রথম কারণ, কাবুলের জনসাধারণ ইংরেজের নষ্টামি ও হবীবউল্লার ইংরেজ-প্রীতিতে বিরক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; নব্য-তুক্রী নব্য-মিশরের জাতীয়তাবাদের ঠুঁটি-জাগরিত বিহুৎপাকাকলী কাবুলের গুলিতান-বেশমানকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় কারণ, রাজা ভারতবর্ষের লোক, জর্মণীর শেষ মতবল কি সে সম্পক্ষে কাবুলীদের মনে নানা সন্দেহ থাকলেও ভারতবর্ষের নিঃস্বার্থপরতা সম্পক্ষে তাদের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। এ-অনুমান কাইজার বার্লিনে বসে করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতীয় মহেন্দ্রকে জর্মনি কুটনৈতিকদের মাঝখানে ইন্ডের আসনে বসিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ইংরেজ অবশ্য হবীবউল্লাকে তত্বী করে তরুম দিল, পত্রপাঠ যেন রাজা আর তার দলকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু ধৃত হবীবউল্লা ইংরেজকে নানা অকম টালবাহানা দিয়ে ঠাণ্ডি করে রাখলেন। এককথা অবশ্য তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজের তখন দুঃস্থত ভাণ্ডি, আফগানিস্তান আক্রমণ করবার মত সৈন্যবলও তার কোষের নেই।

কিন্তু হবীবউল্লা রাজার প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কেন না এবং না হয়ে ভালো করেছিলেন কি মদ করেছিলেন সে সম্পক্ষে আমি অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক কারণ, অনেক আলোচনা শুনেছি। সে-সব কারণের কটা খাঁটি, কটা খুঁট বলা অসম্ভব কিন্তু এ-বিষয় দেখলুম কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, হবীবউল্লা তখন ভারত আক্রমণ করলে সমস্ত আফগানিস্তান তাতে সড়া দিত। অর্থাৎ আমীর জনমত্ত উপেক্ষা করলেন; জর্মণী, তুক্রী, ভারতবর্ষকেও নিরাশ করলেন।

জর্মণরা এক বৎসর চেষ্টা করে দেশে ফিরে গেল কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপ তখনকার মত আশা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতের জন্য আবাদ করতে কসুর করলেন না। রাজা জানতেন, হবীবউল্লার মৃত্যুর পর আমীর হবেন নসরউল্লা নয় মুহীন-উস-সুলতানে। কিন্তু দুটো টিকাই যে মেকি রাজা দুচারবার বাজিয়ে বেশ বৃষ্টি নিয়েছিলেন। আমানউল্লার কথা কেউ শুধন হিসেবে নিত না কিন্তু রাজা যে তাতে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার পরখ করে নিয়েছিলেন সে কথা কাবুলের সকলেই জানে। কিন্তু তাঁকে কি কানমস্ত নিয়েছিলেন সে কথা কেউ জানে না; রাজাও মুখ ফুটে কিছু বলেননি।

১৯১৭ সালের রশ-বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে রাজা কাবুল ছাড়েন। অরপর যুদ্ধ শেষ হল।

mone-prane-bangali.blogspot.com

শেষ আশায় নিরাশ হয়ে কাবুলের প্রগতিপন্থীরা নিজীব হয়ে পড়লেন। পদার আড়াল থেকে তখন এক অদ্ভুত হাত আফগানিস্তানের ঘূটি চালাতে লাগলো। সে হাত আমানউল্লাহ মাতা রানী-মা উলিয়া হজরতের।

বহু বৎসর ধরে রানী-মা প্রহর গুণছিলেন এই সুযোগের প্রত্যাশায়। তিনি জানতেন প্রগতিপন্থীরা হবীবউল্লা, নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতানে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত আমানউল্লাহ কথা হিসেবেই আনবেন না। পদার আড়াল থেকেই রানী-মা প্রগতিপন্থী যুবকদের বৃষ্টিয়ে দিলেন যে, হবীবউল্লা কাবুলের বেকের উপর জগদল পাথর, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও যখন সে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তখন তাঁরা বসে আছেন কিসের আশায়? নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতানে দুজনই ভাবেন সিংহাসন তাঁদের হকের মাল—সে মালের জন্য তাঁরা কোনো দাম দিতে মারজ।

কিন্তু আমানউল্লাহ দাম দিতে তৈরী। সে দাম কি? বৃকের খুন্ দিয়ে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়ে দেশকে স্বাধীন করতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমানউল্লাহকে আমীর করা যায় কি প্রকারে? রানী-মা বোরকার ভিতর থেকে তারও নীলছাপ বের করলেন। আসছে শীতে হবীবউল্লা যখন নসরউল্লা আর মুইন-উস-সুলতানকে সঙ্গে নিয়ে জলালাবাদ যাবেন তখন আমানউল্লাহ কাবুলের গভর্নর হবেন। তখন যদি হবীবউল্লা জলালাবাদে মারা যান তবে কাবুলের অস্ত্রশালা আর কোষাধ্যক্ষের জিম্মাদার গভর্নর আমানউল্লাহ তার ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারবেন। রাজা হতে হলে এই দুটো জিনিষই যথেষ্ট।

কিন্তু মানুষ ঘরে ভগবানের ইচ্ছায়। নীলছাপের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে যে হবীবউল্লা ঠিক তখনই মরবেন তার কি স্থিতি? অসহিষ্ণু রানী-মা বৃষ্টিয়ে দিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা মানুষের হাত দিয়েই সফল হয়—বিশেষত যদি তার হাতে তখন একটি নগণ্য পিস্তল মাত্র থাকে।

স্বামী হত্যা? ঐ্যা? হ্যাঁ। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা হচ্ছে না—যেখানে সমস্ত দেশের আশাভরসা, ভবিষ্যৎ যুগল-অমূল্যল ভাগ্যানির্ভরণের প্রশ্ন সেখানে কে স্বামী, স্ত্রীই বা কে?

শব্দকরাচার্য বলেছেন, 'কা ভব কান্তা?' কিন্তু ঠিক তার পরেই 'সংসার অতীত বিচিত্র' কেন বলেছেন সে তত্ত্বটা এতদিন পর অমর কাছে খোলাস।

আর্বাচীনরা তবু শুধুলো, 'কিন্তু আমীর হবীবউল্লাহ সেদাদল আর জলালাবাদ অঞ্চলের লোকজন নসরউল্লা বা মুইন-উস-সুলতানের পক্ষ নেবে না?'

রাজা দুইয়ে রানী-মার নাকি কঠোর হবার উপক্রম হয়েছিল। উম্মা চেপে শেষতায় বলেছিলেন, 'গুরু মূর্খের দল, জলালাবাদে যে-ই রাজা হোক না কেন, আমরা রাত্রি না যে, সিংহাসনের লোভে অসহিষ্ণু হয়ে সেই গুপ্তই নিরীহ হবীবউল্লাকে খুন করেছ? মূর্খেরা এক্ষণে বুঝল, এতলে 'রানীর কি মত?' নয়। এখানে 'রানীর মতই সকল মতের রানী'।

এসব আমার শোনা কথা—কতটা ঠিক কতটা ভুল হলপ করে বলতে পারব না, তবে এরকমেরই কিছু এটো যে হয়েছিল সে বিষয়ে কাবুল চারপাশের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথামালার গল্প ভুল। বিভ্রালের গলায় ঘটা বিঘার জন্য লোকও ভুলল।

আপন অলসতাই হবীবউল্লাহর মৃত্যুর অনেক কারণ। জলালাবাদে এতদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার থেকে ফিরে আসতেই তাঁর গুপ্তচর নিবেদন করল যে, গোপনে হজুরের সঙ্গে সে অত্যন্ত জল্পনী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায়। সে নাকি কি করে শেষ মুহূর্তে এই যজ্ঞবস্ত্রের

খবর পেয়ে গিয়েছিল। 'কাল হবে, কাল হবে' বলে নাকি হবীবউল্লা প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে গেলেন। সন্ধ্যার সময়ে গুপ্তচর কিছু খুলে বলতে পারল না—আমীরও শুধু বললেন, 'কাল হবে, কাল হবে'।

সে কাল আর কখনো হয় নি। সে-রাতেই গুপ্তচরটকের হাতে হবীবউল্লা প্রাণ দেন।

সকালবেলা জলালাবাদে যে কী তুমুল কাণ্ড হয়েছিল তার বর্ণনার আশা করা অনায়াস। কেউ শুধায়, 'আমীরকে মারল কে?' কেউ শুধায়, 'রাজা হবেন কে?' একদল বলল, 'শহীদ আমীরের ইচ্ছা ছিল নসরউল্লা রাজা হবেন', আরেক দল বলল, 'মৃত আমীরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই; রাজা হবেন বড় ছেলে, যুবরাজ মুইন-উস-সুলতানে ইনায়তেউল্লা। তখনই হক হক রানী!'

বেশীরভাগ গিয়েছিল ইনায়তেউল্লাহর কাছে। তিনি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। লোকজন যতই জিজ্ঞেস করে 'রাজা হবেন কে?' তিনি হয় উত্তর দেন না, না হয় ঈপ্সিয়ে ঈপ্সিয়ে বলেন, 'ব কাকায়েম বোরো' অর্থাৎ বুড়ার কাছে যাও, আমি কি জানি।' কেন সিংহাসনের লোভ করেননি বলা শক্ত; হয়ত পিতৃশাকে অত্যধিক কাতর হয়ে পড়েছিলেন, হয়ত পিতার ইচ্ছার শাসনা রাখতে চেয়েছিলেন, হয়ত অলম্ব্য করেছিলেন যে, যারা তাঁর পিতাকে খুন করেছে তাদের লোকই শেষ পর্যন্ত তাকে দলন করবে। তিনি যদি সে-পথে কটা হয়ে মাথা ঝাড়া করেন তবে সে-মাথা বেশীদিন ঘাড়ে থাকবে না। অত্যন্ত কাঁচা কাঁচা-লম্বাও পাঠার বলি দেখে খুশী হয় না। জানে এবার তাকে পেয়ার লগু আসন্ন। নসরউল্লা আমীর হলেন।

এদিকে রানী-মা কাবুলে বসে তড়িৎ গতিতে কাবুল কান্দাহার জলালাবাদ হিরাতো খবর চালিয়ে রাজাগুপ্তা অসহিষ্ণু নসরউল্লা ভ্রাতা হবীবউল্লাকে খুন করেছেন। তাঁর আমীর হওয়ায় এমনিতেই কোনো হক ছিল না—এখন তো আর কোনো কথাই উঠতে পারে না। হক ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ মুইন-উস-সুলতানের। তিনি যখন স্বৈচ্ছায়, খুশ-এখতওয়ার নসরউল্লাহর বশতা স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থাৎ সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেছেন, তখন হক বর্তালো আমানউল্লাহর উপর।

আকট্য মুক্তি। তবু কাবুল চিকরার করলো, 'জিন্দাবাদ আমানউল্লাহ খান—ঈশ্বরকণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা আমানউল্লাহর তখৎ লাভে খুশী হয়ে সেপাইদের বিস্তার বখশিশ দিলেন; নূতন বাদশা আমানউল্লাহ সেপাইদের তনখা অত্যন্ত কম বলে নিতান্ত 'কর্তব্য' পালনার্থে, সে তনখা ডবল করে দিলেন। উভয় টাকার রাজকোষ থেকে বেরলো। কাবুল হজরার দিয়ে বলল, 'জিন্দাবাদ আমানউল্লাহ খান'।

ভলতওয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মস্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মারা যায় কিনা। ভলতওয়ার বলেছিলেন, 'যায়; কিন্তু গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে পৈকো বিখ খাইয়ে দিলে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না।'

আফগান সেপাইদের কাছে মুক্তিতর মস্ত্রোচ্চারণের ন্যায়—টাকাটাই পৈকো। আমানউল্লাহ কাবুল বাজারের মাথখানে দাঁড়িয়ে পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন। সজল নয়নে, বলদুর্গ কণ্ঠে পিতৃঘাতকের রক্তপাত করবেন বলে শপথ গ্রহণ করলেন, 'যে পাশও আমার জান—দিলের পিতাকে হত্যা করেছে তার রক্ত না দেখা পর্যন্ত আমার কাছে জল পর্যন্ত শরাবের মত হারাম, তার মাংস টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত সব মাংস আমার কাছে শুরুরের মাংসের মত হারাম।'

আমানউল্লাহর শত্রুপক্ষ বলে আমানউল্লাহ খিঁয়েটারে ঢুকলে নাম করতে পারতেন; মিত্রপক্ষ

মূল, সমস্ত যজ্ঞযজ্ঞা রানী-মা সর্দারদের সঙ্গে তৈরী করেছিলেন—আমান উল্লাকে বাইরে রেখে। হাজার হোক ‘পিদর-কুশ’ বা পিতৃহত্যা হস্ত কুশন করতে অনেক লোকই যুগা বোধ করতে পারে। বিশেষত রানী-মা যখন একাই একলক্ষ তখন তরুণ আমানউল্লাকে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নামিয়ে লাভ কি? অফগানিস্থানে শ্বাশুড়ের আর্মীর হওয়ার রেওয়াজ থাকলে তাঁকে হয়ত সারাজীবনই যবনিকা-অস্ত্রাঙ্গে থাকতে হত।

আমানউল্লার সৈন্যদল জলালাবাদ পৌছল। নসরউল্লা, ইনায়তউল্লা দু’জনই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন। নসরউল্লা মোজাদদের কুতুব-মিনার স্বরূপ ছিলেন; সে মিনার থেকে যাজক সম্প্রদায়ের গম্ভীর নিনাদ বহির্গত হয়ে কেন যে সেপাই সন্ত্রাসী জড়ো করতে পারল না সেও এক সমস্যা।

কাবুল ফেরার পথে যুবরাজ নাকি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কঁদে ফেলেছিলেন। জলালাবাদের যেসব সেপাই তাঁকে আর্মীরের তথ্যে বসাবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল তারা ততক্ষণে আমানউল্লার দলে যোগ দিয়ে কাবুল যাচ্ছে। কান্না দেখে তারা নাকি মুইন-উস-সুলতানের কাছে এসে বারবার বিদ্রূপ করে বলেছিল, ‘বেলা না এখন, ‘ব কাবোয়েম বোরো—খুড়োর কাছে যাও, তিনি সব জানেন।’ যাও এখন খুড়োর কাছে? এখন দেখি, কাবুল পৌছলে খুড়ো তোমাকে ঘাঁচন কি করে।’

কাবুলের আর্ক দুর্গে ‘দুনকেই বকী’ করে রাখা হল। কিছুদিন পর নসরউল্লা ‘কলারায়’ মারা যান। কাকি খোয়ে নাকি তাঁর কলসী হয়েছিল। কফিত অনাকিছু মেশানো ছিল কিনা সে বিষয়ে দেখলুম অধিকাংশ কাবুল চারপাের স্মৃতিস্তম্ভি বড়ই কীৰ্ণ।

এর পর মুইন-উস-সুলতানের মনের অবস্থা কি হয়েছিল ভাবতে গেলে আমার মত নিরীহ বাঙালীর মাথা ঘুরে যায়। কল্পনা সেখানে পৌছানো না, মৃত্যুভয়ের তুলনায় নাকি নেই।

এখানে পৌছে সমস্ত দুনিয়ার উচিত অমানউল্লাকে বারবার সন্তোষ প্রণাম করা। প্রাচ্যের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি আমানউল্লা তাই করলেন। মাঝরা হাত থেকে যেতুমু ক্রমতা তিনি ততদিনে অধিকার করতে পেরেছিলেন তারই জোরে বিচক্ষণ কূটনৈতিকদের শত উপদেশ গ্রাহ্য না করে তিনি বৈমাত্র্যে প্রোতী ভাবকে মুক্তি দিলেন।

এ যে কত বড় সাহসের পরিচয় তা শুধু তাঁরই বুঝতে পারবেন যারা মেগলপাতানের ইতিহাস পড়েন। এত বড় দরাজ-দিল আর হিম্মত-জিগেরে নিশান আফগানিস্থানের ইতিহাসে আর নেই।

পঁচিশ

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কাননস্ট দিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে আমানউল্লা আরো ভালো রকমেই বুঝতে পারলেন যে, চোরের যদি তিনি দিন হয় তবে সাধুর মাত্র একদিন। সেই একদিনের হস্তে জোরে তিনি লড়াই জিতেছেন।—এখন আবার দুশমনের পালা। আমানউল্লা তার জন্য তৈরী হয়ে লাগলেন।

জামখরচের খাতা খুলে দেখলেন, জমায় লেখা, আমানউল্লা খান দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন, তিনি আর আর্মীর আমানউল্লা নন—তিনি ‘গাজী’ ‘বাদশাহ’ আমানউল্লা খান।

খরচে লেখা, নসরউল্লার মোজার দল যদিও আসর থেকে সরে গিয়েছে তবু তাদের বিশ্বাস নেই। আমানউল্লা ফরাসী জানতেন—‘রকুলের পুর মিয়া সোতের,’ অর্থাৎ ‘ভালো

করে লাফ দেওয়ার জন্য পিছিয়ে যাওয়া’ প্রবাদটা তাঁর অজানা ছিল না।

কিন্তু আমানউল্লা মনে মনে স্থির করলেন, মোজার সারকারী রাস্তার কোনখানে খানখান বানিয়ে রাখবে সে ভয় অহরহ বুকের ভিতর পুখে রাখলে দেশস্বাক্ষরে মোটার টপ গিয়ারে চালানো অসম্ভব। অথচ যুগা স্পীডে মোটার না চালিয়ে উপায় নেই—সাধুর মাত্র একদিন।

কাবুলে পৌছে যে দিকে তাকাই সেখানেই দেখি হরেকরকম সারকারী উর্দিপরা স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরা যোগাযুগির করছে। খবর নিয়ে শুনি কোনোটা উর্দি ফরাসী স্কুলের, কোনোটা জর্মন, কোনোটা ইংরেজী আর কোনোটা মিলিটারি স্কুলের। শুধু তাই নয় গাঁয়ের পাঠশালা পাশ করে মারা শহরে এসেছে তাদের জন্য ফ্রি বোর্ডিং, লজিং, জামাকাপড়, কেতাবপত্র, ইন্সট্রুমেন্ট-বয়, ডিক্‌সনরি, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্য খচরের ডাড়া, এক কথায় ‘অল ক্যাথ’।

ভারতবর্ষের হয়ে আমি বললুম, ‘নাথিং লস্ট’।

প্যারিসফের্তা সাইলুম আলম বুঝিয়ে বললেন, ‘আপনি ভেবেছেন ‘অল ফাউণ্ড’ হলে বিদ্রোহ বুঝি সঙ্গে সঙ্গে জুটে যায়। মোটেই না। হস্টল থেকে ছেলেরা প্রায়ই পালায়।’

আমি বললুম, ‘ধরে আনার বদোস্ত নেই?’

সহফুল আলম বললেন, ‘গাঁয়ের ছেলেরা শক্ত হাড়ে তৈরী। পালিয়ে বাড়ি না গিয়ে যেখানে সেখানে দিন কাটাতো পারে। তারও দাওয়াই আমানউল্লা বের করেছেন। হস্টল থেকে পালানো মাইই আশার সারকারকে খবর দিন। সারকারের তরফ থেকে তখন দু’জন সেপাইই ছোকরার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসে, তিন বেলা খায় দায় এবং যদিও হুকুম নেই তবু সকলের জানা কথা যে, কোর্মা-কালিয়া না গেলে বদুকের কুঁদা দিয়ে ছেলের বাপকে তিন বেলা মার লাগায়। বাপ তখন ছেলেকে খুঁজতে রেগেয়ে। সে এসে হস্টলে হাজিরা দেবে, হেডমাষ্টারের চিঠি গায়ে পৌছবে যে আসামী ধরা দিয়েছে তখন সেপাইরা বাপের ভালো দুশখাটি বেটে বিদায়-ভোজ খেয়ে তাকে গুঁশিয়ার না করে শহরে ফিরবে। প্রযুক্তিবিদ্যার পূনরাবিষ্কারে তাদের কোনো আপত্তি নেই।’

আমি বললুম, ‘কিন্তু পড়াশোনা যদি কেউ নিছাড়াই গর্ভ হয তবে?’

‘পর পর তিনবার যদি ফেল মারে তবে হেডমাষ্টার বিবেচনা করে দেখবেন তাকে ডিসমিস করা যায় কিনা? বুদ্ধিগুণ্ডি আছে অথচ পড়াশোনা গিলেমি করছে জানলে তার তখনো ছুটি নেই।’

এর পর কোন দেশের রাজা আর কি করতে পারেন?

মিলিটারি স্কুলের ভার তুর্কমের হাতে। তুর্কী জেনারেলদের ঐতিহ্য বার্লিনের পংস্‌দাম সমরবিদ্যায়তনের সঙ্গে জড়ানো; তাই শুনলুম স্কুলটা জর্মন কায়দায় গড়া। সেখানে কি রকম উন্নতি হচ্ছে তার খবর কেউ দিতে পারলেন না। শুধু অধ্যাপক বেনওগা বললেন, ‘ইস্কুলটা তুলে দিলে আফগানিস্থানের কিছু ক্ষতি হবে না।’

মোয়েদের শিক্ষার জন্য আমানউল্লা আর তাঁর বেগম বিবি সুরাইয়া উঠে পড়ে লেগেছেন। বোরক পর এক কাবুল শহরেই প্রায় দু’হাজার মেয়ে ইস্কুলে যায়, উঁচু পাঁচলিফেরা আটিনার বাল্কেট-বল, সলি-বল খেলে। সলি-বল আলম বললেন, ‘লিখতে পড়তে, আঁক করতে শেখে, সেই যথেষ্ট। আর তাও যদি না শেখে আমার অন্তত কোনো আপত্তি নেই। হারোমের বদ হওয়ার বাইরে এসে লাফলাফি করছে এই কি যথেষ্ট নয়?’

আমি সর্বান্তঃকরণে সাহা দিলুম। সাইফুল আলম কানে কানে বললেন, ‘কিন্তু একজন লোক একদম সায় দিচ্ছেন না। রানী-মা।’

শুনে একটু ধাবড়ে গেলুম। দুই শত্রু নিপাত করে, তৃতীয় শত্রুকে ঠাণ্ডা রেখে ঘনি আমানউল্লাকে বাদশা বনাতো পেরেছো তার রাতের একটা মূল্য আছে খৈ কি? তার মতে নাকি এত শিক্ষার খোরাক আফগানিস্তান হজম করতে পারে না। এই নিয়ে নাকি মাতাপুত্রে মনোমালিন্যও হয়েছে—মাতা অভিমানেদের পুত্রকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ করেছেন। বধু সুরাইয়াও নাকি শাস্ত্রীকে অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু কাবুল শহর তখন আমানউল্লার চাবুক খেয়ে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে—‘দেরেশি’ পরে। ‘দেরেশি’ কথাটা ইংরেজী ‘ড্রেস’ থেকে এসেছে—অর্থাৎ হ্যাট, কোট, টাই পাতলুন। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, সরকারী কর্মচারী হলেই তাকে দেরেশি পরতে হয় তা সে শিশু টাকার কেরানীই হোক আর শিল্পী টাকার সিপাহী-ই হোক। শুধু তাঁই নয়, দেরেশি পরা না থাকলে কাবুল নাগরিক সরকারী বাগানে পর্যন্ত ঢুকতে পায় না। একদিকে সরকারী দাপ, অন্যদিকে বাইরের চাকচিক্যের প্রতি অনুরত জাতির মোহ, মাঝখানে সিনেমার উল্ফানি, তিনে মিলে কাবুল দেরেশি-পাগল হয়ে উঠেছে।

ইস্কুত আবদুর রহমানের মনে ডেইজ লেগেছে। আমি বাড়িতে শিলওয়্যার পরে বসে থাকলে সে খুঁতখুঁত করে; আটপোরে সূট পরে বেরতে গেলে নীলকন্ঠ দেরেশি পরার উপদেশ দেয়।

মেয়েরাও তাল রেখে চলেছেন। আর্মীয়া হবীবউল্লা হারোমেন মেয়েদের ফ্রক ব্লাউজ পরাতো। আমানউল্লার আমলে দেখি ভদ্রমহিলা মাঠেই উঁচু হিলের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, আঙ্গছ সিন্ধের মোজা, লম্বাঘাতার আঁটসাঁট ব্লাউজ, দস্তানা আর হ্যাট পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। হ্যাটের সামনে একখানা অতি পাতলা নেট ঝুলছে বলে চেয়ারাখানা পট্টাপট্টি দেখা যায় না। যে মহিলার যত সাহস তাঁর নেটের বুননি তত ঢিলে।

Figure কথাটার ফরাসী উচ্চারণ ফিগুর, অর্থ—মুখের চেহারা। ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলতেন, ‘কাবুলী মেয়েদের ফিগার দেখা যায় বটে, কিন্তু ফিগুর দেখবার উপায় নেই।’

কিন্তু দেশের ধনদৌলত না বাড়িয়ে তো নিত্য নিন্দা নূতন স্কুল-কলেজ খোলা যায় না, দেরেশি দেখানো যায় না, ফিগার ফেলানো যায় না। ধনীলোক ভাড়াতে হলে আজকের দিনে কলকরখানা বানিয়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার করতে হয়। তার জন্য প্রচুর পুঞ্জির দরকার। আফগানিস্তানের গাটে সে কড়ি নেই—বিদেশীদের হাতে দেশের শিল্পবাণিজ্য ছেড়ে দিতও ‘আফগানি নারাজ। আমানউল্লার পিতাহাং দোর্দণ্ডপ্রতাপ আবদুর রহমান বলতেন, ‘আফগানিস্তান সেইদিনই রেলগাড়ি চালাবে যেদিন সে নিজের হাতে রেলগাড়ি তৈরী করতে পারবে।’ পিতা হবীবউল্লা সে আইন ঠিক ঠিক মেনে চলেননি—তবে কাবুলের বিজলী বাড়ির জন্য যে কলকর কিনিছিলেন সেটা কাবুলী টাকায়। আমানউল্লা কি করবেন ঠিক মনস্তির করতে পারছিলেন না—নাশানলা লেনে ফেলার উপদেশ কেউ কেউ তাঁকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাহলে সবাইকে সুদ দিতে হয় এবং সুদ দেওয়া-নেওয়া ইসলামে বাধন।

হয়ত আমানউল্লা ভেবেছিলেন যে, দেশের গুরুভারের খানিকটো নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে দেশের আর পাঁচজনকে কাঁধে যদি ভাগবাতীয়াকার করে দেওয়া যায় তাহলে প্রগতির পথে চলার সুবিধে হবে। আমানউল্লা বললেন, ‘পার্লিমেণ্ট তৈরী করে।’

সে পার্লিমেণ্টের স্বরূপ দেখতে গেলুম পাগমান গিয়ে।

কাবুল থেকে পাগমান কুজিমানী রাস্তা। বাস চালাচল আছে। সমস্ত শহরটা গড়ে তোলা হয়েছে পাথরের থাকে বলে। দুখ থেকে মনে হয় এনে একটা শাখ কা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার ভাঁজে ভাঁজে ছোট ছোট বাঙলো; অনেকটা ইতালিয়ান ভিলার মত। সমস্ত

পাগমান শহর জুড়ে আপেল নাসপাতীর গাছ বাঙলোগুলোকে ঘিরে রেখেছে আর চুড়ার বরফলা বরনা রাস্তার এক পাশের নালা দিয়ে থাকে থাকে নেমে এসেছে। পিচ ঢালা পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে উঠছি আর দেখছি দুদিকে ঘন সবুজের নির্বিড় তৃণ্ড সুসুপ্তি। কোনো দিকে কোনো প্রকার জীবনযাত্রার চঞ্চলতা নেই, কঠিন পাথরের খাড়া দেয়াল নেই, ঘিনঘিনে হলদে রঙের বাড়িরদোর নেই। কিছুতেই মনে হয় না যে, নীরস কণ্ঠ আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে চলেছি, থেকে থেকে ভুল লাগে আর চোখ চেয়ে থাকে সামনের মোড় ফিরতেই নেবুর কুড়ি-কাঁখে বাসিয়া মেয়েগুলোকে দেখাব চলে।

বালশা আর্মীয়া-ওররাহ নিয়ে গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটান। এক সপ্তাহের জন্য তামাম আফগানিস্তান এখানে জড়ো হয় ‘জশন’ বা স্বাধীনতা দিবসের আমোদ আনন্দ করার জন্য। দল বেধে আপল আপল তাঁবু স্বেচ্ছা নিয়ে এসে তারা রাস্তার দুদিকে যেখানে সেখানে গুলো লাগানো খাটায়। সমস্ত দিন কাটায়ে চাঁদমারি, মজ্জোল নাচ, পল্টনের কুচকাওয়াজ দেখে, না হয় চায়ের দোকানে আড্ডা জমিয়ে; রাতে তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয় গানের মজলিস। ‘আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরতে চুসুন যদি পাই; জোয়ান হইব গোড়া হতে তবে এ জীবন দেখারাই’—ধরনের গুস্তাদী গানের রেওয়াজ প্রায় নেই, হেরেকরকম ‘কতুজানকে’ অনেকরকম সাধ-সাধনা করে ডাকাডাকি করা হচ্ছে—এ-সব গানের আসল ঝোঁক। মাঝে মাঝে একজন অতিরিক্ত উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে দুচার চক্র নাচ ভী দেখিয়ে দেয়। আর সবাই গানের ফাঁকে ফাঁকে ‘শাবাশ শাবাশ’ বলে নানানওয়ালাকে উৎসাহ দেয়।

এ-রকম মজলিসে বেশীকণ্ঠ বসা কঠিন। বন্ধ ঘরে যদি সবাই সিগারেট ফাঁকে তবে নিজেকেও সিগারেট ধরতে হয়—না হলে চোখ জ্বালা করে, গলা খুসখুস করতে থাকে। এ-সব মজলিসে আপনিক যদি মনের ভিতর কোনো ‘কতুজান’ বা কদম্ববন-বিহারিণী ছবি একে গলা মিলিয়ে—না মিললেও আপসি নেই টিংকার করে গান না গোড়েন তবে বেদেহনে ক্রমেই কানে তাল লাগে আসছে; শেষটায় ফাঁটার উপক্রম। রাগবি খেলার স্বেচ্ছা এ-সব গানের অনেক দিক দিয়ে মিল আছে—তাই এর রসভোগ করতে হয় বেশ একটু তত্বাতে আলগায়ে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আমার বার বার মনে হল পাগমান হৈ-হল্লার জায়গা নয়। নির্বরের সরবর, পত্র-পত্রের মৃদু মর্মর, অচেনা পাখির একটানা কুলন, প্যা পাইনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সবসুখ মিলে গিয়ে এখানে বেলা দ্বিধহরও মানুষের চোখে তন্দ্ৰা আসে। ভর গ্রীষ্মকাল, গাছের তলায় বসলে তবুও শীত শীত করে—গোটেই কলারটা তুলে দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় পেয়লা, প্রিয়া, কবিতার বই কিছুই প্রয়োজন নেই, একখানা র্যাপার পেলে ওমটা ঠিক জমত।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চোখ মেলে দেখি এক অপরাগ মূর্তি। কাঁচাপাকা লম্বা দাঁড়িওয়াল, ঘামে-ভেজা, আঙ্গম অস্মাত অর্ধোত, পীতমস্তকৌমুদীবকিত এক আফগান সামনে দাড়িয়ে। এরপ আফগান অনেক দেখেছি, কিন্তু এরা পরনে ধারালো ক্রীজওয়াল। সদ্য নূতন কোনো পাতলুন, কালো ওয়েস্টকোট, শ্টাট করা শরৎ শাট, কোণ-ভাড়া স্ট্রিক কলার, কালো টাই, দুবোতামওয়াল। নব্য-তম কোটার মণি—কোট আর একমাথা বাবরি চুলের উপর দেহফট উঁচু চকো সিন্ধের অপরা-হ্যাট। সবকিছু আনকোর কাঁচা-চকচকে নূতন; দেহে মনে হল যেন এই মাত্র দর্জির কার্ত-বোর্ডের বার থেকে বের করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পরা হয়েছে। যা তা ‘দেরেশি’ নয়, যোল আনা মণি-সুট। প্যারেডের দিনে ল্যাট-বেলোটি এই রকম সুট পরে সেলুট নেন।

বেস্টের অভাবে পাজমার নাথোরা নেওয়ার দিয়ে পাতলুন বাঁধা, কালো ওয়েস্টকোট আর

পাতলুনের সঙ্গমস্থল থেকে একমুঠো ধবধে শাট বেরিয়ে এসেছে, টাঙ্গটাও ওয়েস্টকোন্টের উপরে ঝুলছে।

বা হাতে পাগড়ির কাপড় দিয়ে বানালো ধোঁচকা, ডান হাতে ফিড়েয় বাঁধা একজোড়া নুতন কালো বুট। তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি পায়ে জুতো-মোজা নেই!

আমাকে পশতু ভাষায় অভিবাদন করে বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে, লম্বা হাতে বুট জোড়া দেলাতে দেলাতে ওরাও গুঁটাগুঁটা মত বড় রাস্তার দিকে রওয়ানা হল।

আমি তো ভেবে ভেবে কোনো কুলকিনারো পেলুম না যে, এর কন্মের আফগান এ-ধরনের সুট পেলেই বা কেখায়, আর এর প্রয়োজনই বা তার কি। কিন্তু এ এক মূর্তি নয়। বন থেকে বেরবার আগে ছবত্ব, এক দ্বিতীয় মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে দেখি এক মূর্তির মামনে উবু হয়ে বসে গম্প জুড়েছে আর মূর্তি তার বুটের তলায় লোথ ঠুকে আন্দানা একে দিচ্ছে।

পরের দিন আমানউল্লাহ বক্কা। সভায় যাবার আগে এরকম আরো ডজনখানেক মূর্তির সঙ্গে দেখা হল। সেখানে গিয়ে দেখি সভার সবচেয়ে ভালো জায়গায়, প্ল্যাটফর্মের মুখেমুখি প্রায় শ'দেড়েক লোক এ-রকম মণিৎ-সুটের ইউনিফর্ম পরে বসে আছে। এরাই প্রথম যেখানে তালিকামের সদস্য।

যে ঢাকি, হাজারা, মফেলান, পাঠান আপন আপন জাতীয় পোষাক পরে এতকাল স্বচ্ছন্দ ঘরে-বাইরে ঘোরাফেরা করেছে, বিদেশীর মুখদুর্গি আকর্ষণ করেছে, আজ তারা বিকট বিভাজনীয় বেশভূষা ধারণ করে সভাস্থলে কাঠের মত বসে আছে। শুনেছি অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে, কিন্তু এদের তো শুধু কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়নি, সর্বাত্মে যেন কৃষ্ণচন্দন বেগে দেওয়া হয়েছে।

আমানউল্লাহ দেশের ভূতবিস্ময়বর্তমান সম্বন্ধে অনেক খাটি কথা বললেন। কাবুলের লোক হাততালি দিল। সদস্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনে, তারা এলোপাড়াডি হাততালি দিয়ে লজ্জা পেয়ে এদিক ওদিক তাকায়; ফরেন অফিসের কর্তারা আরো বেশী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেন। বিদেশী রাজদূতেরা অপলক দৃষ্টিতে আমানউল্লাহ দিকে তাকিয়ে—সেদিন বুঝতে পারলুম রাজদূত হতে হলে কতদূর আত্মসংযম, কত জোর চিত্তজয়ের প্রয়োজন।

জনি, সুট ভালো করে পরতে পারা না-পারার উপর কিছুই নির্ভর করে না কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কি প্রয়োজন ছিল লেফাফাদুরস্ত হওয়ার লোভে দেশের জন গাঁওঘুড়াকে লাজ্জিত করে নিজে দিগ্ভিশিত হওয়ার?

আমানউল্লাহর বক্কা এরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল জানিনে—ভাষা এক হলেই তো আর তাদের বাজারের বোঁচকেনা সহজ সরল হয়ে ওঠে না। শুনেছি, পুরানো বোতলও নাকি নয়া মদ সহিতে পারে না।

ছাশিশ

গীষকালটা কাটল ফেত-খামারের কাজ দেখে। আমাদের দেশে সে সুবিধে নেই; ঠাঠা রোদ্দুরে, ঝামঝাম বৃষ্টি, ভলভলে কাঢ়া আর লিকলিকে জোঁকের সঙ্গে একটা রোরফি না করে আমাদের দেশের ফেত-খামারের পয়লা দিকটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই। এদেশের চাষাবাসের বেশীসভা শুকনো-শুকনো। শীতের গোড়ার দিকে বেশ ভালো করে একদফা মাল চালিয়ে দেয়; তারপর সমস্ত শীতকাল ধরে চাষীরা আশা বৈশে শাশা ভালো

রকম বরফ পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে বার কয়েক ফেতের উপর বরফ জমে আর গলে; জল চুইয়ে চুইয়ে অনেক নিচে গোক আর সমস্ত ফেতটাকে বেশ নরম করে দেয়। বসন্তের শুরুতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঠগাট ভুলে যায় না। আখাভেজা আখাশুকনোতে তখন ফেতের কাজ চলে—নালাদার ধারে গাছতলায় একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বেশ আরাম করে বসে ফেতের কাজ দেখতে অসুবিধা হয় না। তারপর গীষকালে চতুর্দিকে পাখাড়ের উপকার জমা-বরফ গলে কাবুল উপত্যকার নামে এসে খালনানা ভরে দেয়। চাষীরা তখন নালায় বাধ দিয়ে দু'পাশের ফেতকে নাইয়ে দেয়। ধান ফেতের মত আল বেধে বোঝাক জমি টেটপুসুর করে দিতে হয় না।

কোন চাষীর কখন নালায় বাধ নেবার অধিকার সে সম্বন্ধে বেশ কড়াকড়ি আইন আছে। শুধু তাই নয়, নালায় উজান ভাটীর গায়ে গায়ে জলের ভাগবিটোয়ারার কি বন্দোবস্ত তারও পাকাপাকি শর্ত সরকারের দরতর লেখা থাকে। মাঝে মাঝে মারামারি বা ফতাকটি হয়, কিন্তু কাবুল উপত্যকার চাষারা দেখলুম বাজলী চাষার মতই নিরীহ—মারামারির চেয়ে গলাগাধি বেশী পছন্দ করে তার কারণ বোধ হয় এই যে, কাবুল উপত্যকা বাংলা দেশের জমির চেয়েও উর্বরা। তার উপর তাদের আরেকটা মস্ত সুবিধা এই যে, তারা শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। শীতকালে যদি খামটি পরিমাণে বরফ পড়ে তাদের ফেত ভরে যায়, অথবা যদি পাখাড়ের বরফ প্রচুর পরিমাণে গলে নেমে আসে, তাহলে তারা আর বৃষ্টির জোয়াক্য করে না। কাবুলের লোক তাই বলে, 'কাবুল বেজুর আরও লাকিন যে-যফ্ন বানাদ—কাবুল স্বর্গদীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায় দশহাত চওড়া একটি নালা বয়ে যায়। তার দু'দিকে দু'সারি উঁচু চিনার গাছ তারই নিচে দিয়ে পায়ে লাদার পথ। আমি সেই পথ দিয়ে নালা উজিয়ে উজিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটা পঞ্চবটীর মত পাঁচটারনারের কাছখানে বরসতি পেতে আরাম করে বসতাম। একটু উজানে নালায় বাধ দিয়ে আরেক চাষা তার ফেত নাওগাচ্ছে। আমি যে ফেতের পাশে বসে আছি তার চাষা আমার সঙ্গে নানারকম সুখদুঃখের কথা কইছে। এ দুজনের কান ময়জিরের দিকে—কোন আসরের (কপরাহ) নামাজের আজান পড়বে। তখন আমার চাষার পালা। আজান পড়া মাত্রই সে উপরের বাঁধের পাথর-কাদা সরিয়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে কুলকুল করে নিচের বাঁধের জল ভর্তি হয়ে শুক্ল করে; চাষা তার বাঁধ আগের থেকেই তৈরী করে রেখেছে। ব্যস্তমস্ত হয়ে সে তখন বাঁধের তদারক করে নেভায়, কারো শাবল দিয়ে মাঝে মাঝে কাদা তুলে সেটাকে আরও শক্ত করে দেয়, ফেতের ঢেলা মাটি এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিয়ে যানের জলের পথ করে দেয়। শিলওয়রাটা ইটুর উপরে তুলে কোমর গুঁজে নিয়েছে, জামাটা খুলে গাছতলায় পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে, আর পাগড়ির লেজ দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছেছে। আমি ততক্ষণে তার ইকোটোর তদারক করছি। সে মাঝে মাঝে এসে দু'একটা দম দেয় আর পাগড়ির লেজ দিয়ে হাওয়া খায়। আমাদের চাষার গামছা আর কাবুলী চাষার পাগড়ি দুই-ই একবস্ত্র। হেন কর্ম নেই যা গামছা আর পাগড়ি দিয়ে করা যায় না—ইহুকে মাছ ধরা পর্যন্ত। যদিও আমাদের নালায় সব সময়ই দেখখি অতি নগণ্য পোনা মাছ।

বেশ বেলা থাকতে মেয়ারা কলসী মাথায় 'জলকে' আসত। গোড়ার দিকে আমাকে দেখে তারা মুখের উপর উল্টা টেনে দিল। অর্থাৎ দেশের চাষার বউ যে রকম 'ভদরন নোকক' দেখলে 'নজ্জা' পায়। তবে এদের 'নজ্জা' একটু কম। ডান-হাত দিয়ে বুকের উপর ওড়না টেনে বাঁধত দিয়ে ইটুর উপরে পাজমা। তুলে এরা প্রথম লম্বনে আরবী ঘোড়ার মত ছুট দেখনি

আর অল্প কয়েকদিনের ভিতরই তারা আমার সামনে স্বচ্ছন্দে আমার চাষা বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিন্তু চাষা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশীদিন টিকলো না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মুইন-উস-সুলতানে। চাষাই বলল, সে প্রথমতঃ তার চোখকে বিশ্বাস করেনি যখন দেখতে পেল তারি আধা (ভদ্রলোক) বন্ধু মুইন-উস-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি (টেনিস) খেলছেন। আমি তাকে অনেক করে বোঝালুম যে, তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, সেও সত্য দিল, কিন্তু কাজের বেলা দেখলুম সে আর আমাকে তামাক সমাজতে দেয় না, আগের মত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না, 'তো'র বদলে ঠাইে 'ওমা' বলতে আরম্ভ করেছে আর সম্মানার্থে বসন্তের যদি বা সর্বমানে ঠিক রাখত তবু ক্রিয়াতে একঘনত ব্যবহার করে নিজের ভুলে নিজেই লজ্জা পায়। ভাষা শুধরাতে গিয়ে গম্পের খেই হারিয়ে ফেল, আর কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, আমি মুইন-উস-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি খেলি। আমাদের তেলতেলে বন্ধুত্ব কেমন যেন করকের হয়ে গেল।

কিন্তু লেনদেন বন্ধ হয়নি; যতদিন গায়ে ছিলুম প্রায়ই মুগিটা আঙুটা দিয়ে যেত। দাম নিতে চাইত না, কেবল আবদুর রহমানের খবাব ভয়ে যা নিতাম না মিলে চলে না তাই নিতে স্বীকার করত।

হেমন্তের শেষের দিকে ফসলকাটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন চাষা কাঠুরে হয়ে গেল। আমাকে আগের থেকেই বলে রেখেছিল একদিন দেরি পাঁচ গোলা-বোকাই শীতের জ্বালানি কাঠ নিয়ে উপস্থিত। আবদুর রহমানের মত বৃত্তান্তে লোকও উতকণ্ঠে স্বীকার করলে যে, এ রকম পরলা নম্বরের নিম-তর নিম-শুক (আধা-ভেজা) কাঠ কাবুল বাজারের কোথাও পাওয়া যায় না। আবদুর রহমান আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, সম্পূর্ণ শুকনো হলে কাঠ তাড়াতাড়ি জ্বলে গিয়ে ঘর বড় বেশী গরম করে তোলে, তাতে আমার খতিও হয় বেশী। আর যদি সম্পূর্ণ ভেজা হয় তাহলে গরমের চেয়ে ধুয়েই পরোয় বেশী, যদিও ফাঁদ তাতে কম।

এবার দাম দেবার বেলায় প্রায় হাতহাতির উপক্রম। আমি তাকে কাবুলের বাজার দরিত গোলে সে শুধু বল যে, কাবুলের বাজারে সে অত দাম পায় না। অনেক উল্লেখ করি পর বুঝলুম যে, বাজারের দররে বেশ খানিকটা পুলিশ ও তাদের ইয়ার-বকীকে দিয়ে দিতে হয়। শেষটায় গোলামল শুনে মাদাম জিয়ার এসে মিমাটাক করে দিয়ে গেলেন।

আমাদের দিলখোলা বন্ধুও প্রায় লোপ পাবার মত অবস্থা হয়ে যেদিন সে শুনতে পেল 'আমি সৈয়দ'। তারপর দেখা হলেই সে তার মাথার পাগড়ি ঠিক করে বসায় আর আমার হাতে চুম্বা খেতে চায়। আমি যতই বাধা দিই, সে ততই কাতর নয়নে তাকায়, আর পাগড়ি বাঁধে আর খোলে।

তামাক-সাজার সত্যমুগের কথা ভেবে নিঃশ্বাস ফেললুম।

ডিমোক্রেসি বড় মুনকো জিনিস; কখন যে কার অভিশাপ্পাতে ফেটে চোঁটার হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। তারপর আর কিছুতেই জোড়া লাগে না।

সাতাশ

হেমন্তের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন থেকে মৌলানা জিয়াউদ্দীন এসে কাবুলে পৌঁছলেন।

বগদাদফ, বেনগুয়া, মৌলানা আমাতে মিলে তখন 'চারইয়ারী' জমে উঠল।

জিয়াউদ্দীন অন্তঃসরের লোক। ১৯২১ সালের খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলঙ্ক

ছাড়েন। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হন এবং পরে ভালো বাঙালী শিষ্যেছেন। বেশ গান গাইতে পারতেন আর রবীন্দ্রনাথের অনেক গান পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করে মূল সুরে গেয়ে শান্তিনিকেতনের সাহিত্য-সভায় আসার জমাতেন। এখানে এসে সে সব গান খুব কাজে লেগে গেল, কাবুলের পাঞ্জাবী সমাজ তাকে লুফে নিল। মৌলানা ভালো ফাসী জানতেন বলে কাবুলীরাও তাকে খুব সম্মান করত।

কিন্তু 'চারইয়ারী' সভাতে ভাঙন ধরল। বগদাদফের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। বেনগুয়া সায়েব তখন বড় দামদার হয়ে গেলেন। কাবুলে তিনি কখনো খুব আরাম বোধ করেননি। এওজ, পিয়াসনকে বাদ দিলে বেনগুয়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঝাঁটা সমজদার। শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে ভেবে ভগ্নলোক প্রায়ই উদাস হয়ে যেতেন আর খামকা কাবুলের নিন্দা করতে আরম্ভ করতেন।

বেনগুয়া সায়েবই আমাকে একদিন রশান এক্ষেসিতে নিয়ে গেলেন।

প্রথম দর্শনেই তাভারিশ দেমিদফকে আমার বড় ভালো লাগলো। রোগা চেহারা, সাধারণ বাঙালীর মতন উঁচু, সোনালী চুল, চোখের লোম পর্যন্ত সোনালী, শীর্ণ মুখ আর দুটি উজ্জ্বল চীম্বু নীল চোখ। বেনগুয়া যখন আলপ করছিলেন সিঁইছিলেন তখন তিনি মুখ খোলার আগেই বেনো চোখ দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছিলেন। সাধারণ কটিনেন্টালের চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকে তিনি হ্যাণ্ডশেক করলেন, আর হাতের চাপ দেওয়ার মাঝ দিয়ে অতি সহজ অভ্যর্থনার সহজদাতা প্রকাশ করলেন।

তার স্ত্রীরও বেশমী চুল, তবে তিনি বেশ মোটাসোটা আর হাসিমুখী মুখী। কোথাও কোনো অলঙ্কার পরেননি, লিপাটিক রাজ তো নয়ই। হাত দু'খানা দেখে মনে হল ঘরের কাজকর্মও বেশ খানিকটা করেন। সাধারণ মেয়েদের কপালের চেয়ে অনেক চওড়া কপাল, মাথার মাঝখানে সিঁথি আর বাঙালী মেয়েদের মত অথচ বোঝা এলাখোঁপা।

কর্তা কথা বললেন ইংরাজীতে, গিন্নী ফরাসীতে।

অভিজ্ঞান শেষ হতে না হতেই তাভারিশ দেমিদফ বললেন, 'চা, অন্য পানীয়, কি খাবেন বলুন।'

ইতিমধ্যে দেমিদফ প্যাপারিস (রশান সিগারেট) বাড়িয়ে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে তৈরী। আমি বাঙালী, বেনগুয়া সায়েব শান্তিনিকেতন থেকে থেকে আধা-বাঙালী হয়ে গিয়েছেন আর রশানরা যে চা খাওয়াতে বাঙালীকেও হার মানায় সে তো জানা কথা।

তবে খাওয়ার কায়ালাটা আলাদা। টেবিলের মাঝখানে সামোভার; তাতে জল টপ্‌গ করে ফুটছে। এমিকে টি-পেট সকালাবেলা মুঠো পাঁচকে চা আর গরম জল দিয়ে একটা ঘন মিশকালো লিকার তৈরী করা হয়েছে—সেটা অবশ্য ততক্ষণে জুড়িয়ে হিম হয়ে গিয়েছে। টি-পেট হাতে করে প্রত্যেককে পেয়ালা দিয়ে মাদাম শুধান, 'কর্তা দেব বলুন।' পেয়ালাটুকু নিলেই যথেষ্ট; সামোভারের চাষি খুলে টপ্‌গবে গরম জল তাতে মিশিয়ে নিলে দু'য়ে মিলে তখন বাঙালী চারের রক্ত ধরে। কায়ালাটা ফদ নয়, একই লিকার দিয়ে কখনো কড়া, কখনো ফিকে যা খুশী খাওয়া যায়। দুধের রেওয়াজ নেই, দুধ গরম করার হাফগামও নেই। সকালবেলাকার তৈরী লিকার সেসময় দিন চলে।

সামোভারটি দেখে মুগ্ধ হলুম। রুপার তৈরী। দু'মিকের হ্যাণ্ডেল, উপরের মুকুট, জল খোলার চাবি, দাড়াবার পা সব কিছুতেই পাকা হাতের সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর কাজ করা। তারিক কবে বললুম, 'আপনার রুপার ডাভমহলটি ভারি চমৎকার।'

দেমিদফের মুখের উপর মিষ্টি লাজুক হাসি খেলে গেল—ছোট ছেলেদের প্রশংসা করলে যে

রকম হয়। মাদাম উদ্বেগিত হয়ে বেনওয়া সাময়িক বললেন, 'আপনার ভারতীয় বন্ধু ভালো কম্প্লিমেন্ট দিতে জানেন।' আমার দিকে তা = কিসে বললেন, 'তাজমহল ছাড়া ভারতীয় আর কোন ইমারতের সঙ্গে তুলনা দিলে কিন্তু চলত না মসিয়ো; আমি ঐ একটির নাম জানি, ছবি দেখেছি।'

তখন দেমিফ বললেন, 'সামোভারটি তুল্য শহর তৈরী।' আমার মাথার ভিতর যেন বিদ্রূহ খেল গেল। বললুম, কোথায় যেন ঢেখফ না গরিক লেখতে একটা রাশান প্রবাস পড়েছিল, 'তুল্যতে সামোভার নিয়ে যাওয়ার মত।' 'আমরা বাঙাল্যেতে বলি, 'তোলা মাথায় তেল ঢালো।'

'কেরিং কোল টু নিউ কানুন', 'বরেলি মে বাস জে লানা' ইত্যাদি সব কটাই আলোচিত হল। আমার ফরাসী প্রবাদটির মনে পড়েছিল, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী নিয়ে যাওয়া কিছু অবস্থা বিবেচনা করে সেটা চেষ্টা রাখলুম। হাফিজও যখন বলেছেন, 'আমি কাজী নই মোয়াজ্জিদ নই, আমি কোন্ দুঃখে 'তওবা' (অনুতাপ) করতে যাব, আমি ভাবলুম, 'আমি ফরাসী নই, আমার কি দায় রসাল প্রবাদটা দাবিল করব।'

দেমিফ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতবর্ষের লোক রাশান কথাসাহিত্য পড়ে কিনা। আমি বললুম, 'গোটা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কোনো মত দেওয়া নিম্নে কিন্তু বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে এককালে ফরাসী সাহিত্য যে আসন নিয়েছিল সেটা কয়েক বৎসর হল রুশকে ছেড়ে দিয়েছে। বাঙলা দেশের অনেক গুণী বলেন, 'ঢেখফ মপাসার চেনে অনেক উচ্চ দরের স্ত্রী।'

বাঙলা দেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষই যে ক্রমে রুশ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে সে সম্বন্ধে বেনওয়া সায়েব তখন অনেক আলোচনা করলেন। 'ভারতবাসীর সঙ্গে রুশের কোন জায়গায় মনের মিল, অনুভূতির ঐক্য, বাতাবরণের সাদৃশ্য, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বেনওয়া অনেকঞ্চ ধরে আপন পারদর্শনে ও অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় মজলিসী কায়দায় পরিবেশন করলেন। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে যে প্রবৃত্ত রাশান নাভেল, ছোট গল্পের বই মজদু আছে সে কথাও বলতে ভুললেন না।

দেমিফ বললেন, 'রাশানরা প্রাচ্য না পাক্ষাতের লোক তার স্থিরবিচার এখনো হয়নি। সামান্য একটা উদাহরণ দিন না। খাঁটি পশ্চিমের লোক শার্ট পাতলুনের নিচে গুঁজে দেয়, খাঁটি প্রাচ্যের লোক, তা সে আফগানই হোক আর ভারতীয়ই হোক, কুঁচটা বুলিয়ে দেয় পাক্ষাতের উপরে। রাশানরা ও দুদলের মাঝখানে—শার্ট পরলে সেটা পাতলুনের নিচে গোঁজে, রাশান কুঁচটা পরলে সেটা পাতলুনের উপর বুলিয়ে দেয়—সে কুঁচটা আবার প্রাচ্য কায়দায় তৈরী, তাতে অনেক রকম অনেক নৈ।'

দেমিফের মত অত শাস্ত ও ধীর কথা বলতে আমি কম লোককেই শুনেছি। ইয়েজী যে খুব বেশী জানতেন তা নয় তবু যেটুকু জানতেন তার ব্যবহার করতেন বেশ ভেবেচিন্তে, সম্যক শব্দ বাছাই করে করত।

রাশান সাহিত্যে আমার শব্দ দেখে তিনি টলস্‌টয়, গরিক ও ঢেখফ ইয়াসন পলিয়ানাতে যে সব আলাপ-আলোচনা করিয়েলেন তার অনেক কিছু বর্ণনা করে বললেন, 'জারের আমলে তার সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি—কারণ টলস্‌টয় আপন মতামত প্রকাশ করার সময় জারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যত্নে। জারের পরবর্তন পর নতুন সরকার এতদিন নানা জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল—এখন আস্তে আস্তে কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে নানা রহস্যের সমাধান হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা, আমি তো শুনেছি আপনারা আপনারদের প্রাক-বলশেভিক সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত নন।'

মাদামের মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় ইংরেজের প্রোপাগান্ডা।'

আমি আমার ভুল ববরের জন্য হস্তদস্ত হয়ে মাথা চেয়ে বললুম, 'আমরা রাশান জানিনে, আমরা ঢেখফ পড়ি ইংরাজীতে, লাল রুশের নিদাও পড়ি ইংরাজীতে।'

দেমিফ চুপ করে ছিলেন। তার দেখে বললুম তিনি ইংরেজ কি করে না-স্ক্রের, কি বলে না-বলে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আপন বক্তব্য পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিলে যে অসত্য আপনারা কাকে বিলোপ পাবে সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বার বার প্রকাশ পচ্ছিল।

আমরা এসেছিলাম চারটের সময়; তখন বাজছে প্রায় সাতটা। এর মাঝে যে কত প্যাপিরি পুড়ল, কত চা চলল গল্পের তোড়ে আমি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিনি। এক কাপ শেষ হতেই মাদাম সেটা তুলে নিয়ে এঁটে চা একটা বড় পাত্রে ঢেলে ফেলেন, লিকার ঢেলে গরম জল মিশিয়ে চিনি দিয়ে আমার অগম্যতাই আরেক কাপ সামনে রেখে দেন। জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন না কতটা লিকারের প্রয়োজন, দু-একবার দেখেই আমার পরিমাণটা শিখ নিয়েছেন। আমি কখনো ধন্যবাদ দিয়েছি, কখনো টলস্‌টয় গরিক তর্কের ভিতরে ছুঁবে যাওয়ায় লক্ষ্য করিনি বলে পরে আরও প্রকাশ করেছি।

কথার ফাঁকে মাদাম বললেন, 'আপনারা এখনেই খেয়ে যান।' আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'অনেক দিন হবে।' বেনওয়া সায়েব তো ছিলেছেড়া ধনুকের মত লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'আমকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আজ উঠি, বড্ড বেশীক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি।'

আমি একটু বোকা বনে গেলুম। পরে বুঝতে পারলুম বেনওয়া সায়েব খাওয়ার নেমন্তন্নটা অন্য অর্থে ধরে নিয়ে লজ্জা পেয়েছেন। মাদামও দেখি আস্তে আস্তে বেনওয়ার মনের গতি ধরতে পেরেছেন। তখন লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে বললেন, 'না মসিয়ো, আমি সে অর্থে বলিনি; আমি সত্যিই আপনারদের গলগল্পে ভারি খুশী হয়ে ভাবলুম দু'মুঠো খাবার জন্য কেন আপনারদের আড্ডাটা ভঙ্গ হয়।'

দেমিফ চুপ করে ছিলেন। ভালো করে কুয়াশটা কাটাবার জন্য বললেন, 'পশ্চিম ইয়োরোপীয় এটিকেটা-এরকম খেতে বলার অর্থ হয়ত 'তোমরা এবার গুটো, আমরা খেতে বসব'। আমার স্ত্রী সে ইঙ্গিত করেননি। জানেন তো খাওয়াগোয়ার ব্যাপারে আমরা এখনো আমাদের কুঁচটা পাতলুনের উপরে পরে থাকি—অর্থাৎ আমরা প্রাচ্যদেশীয়।'

সকলেই আরাম বোধ করলুম। কিন্তু সে যাত্রা ডিনার হল না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেমিফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি রাশান শেখেন না কেন?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি শেখাবেন।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়। 'With pleasure!' বেনওয়া বললেন, 'I am not with pleasure' বলে আমার দিকে চোখ ঠার দিলেন।

মাদাম বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

বেনওয়া বললেন, 'এক ফরাসী লণ্ডনের হোটেল দূরে বলল, 'Waiter, bring me a cotelette, please!' গুড়োটার বলল, 'With pleasure Sir.' ফরাসী ভয় পেয়ে বলল, 'No, not with pleasure, with politeness, please!'

বেনওয়া বিগড় ফরাসী। একটুখানি হাস্যকর পটভূমিতে শেষ পাতলা মেঘেটুকু কেটে দিয়ে টুক করে বেরিয়ে এলেন।

mone-prane-bangali.blogspot.com

‘মাদামও কিছু কম না। শেষ কথা শুনতে পেলুম ‘But I shall give you cotelettes with both pleasure and potatoes.’

রাত্তায় বেরিয়ে বেনওয়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, ‘এ দুটি যথার্থ খাটালোক।’

আঠাশ

হেমন্তের কাবুল ‘মধ্যযুগীয় সম্প্রসারণে ফলে ওঠে,’ ইংরাজীতে থাকে বলে ‘মিডল এজ স্প্রেড’। অর্থাৎ উঁচুটা মোটা হয়, চাল-চলন ভারীকিভরা।

যবগমের দানা ফুলে উঠল, আপেল ফেটে পড়ার উপক্রম, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত গ্রীষ্ম-ভরা রোন বাতাস বৃষ্টি খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, হাওয়া বইল ডাইনে বায়ে নান তোলেন না, ঠায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কাঁপে, না হয় থপ করে ভাল ছেড়ে পাছতলায় শুয়ে পড়ে। প্রথম নবায় হয়ে গিয়েছে, চাষীরাও খেয়েদেয়ে মোটা হয়েছ। শীতকাতুরেরা দুটো একটা ফালতো জামা পরে ফেঁপেছে, গাখাগুলো খাচ খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠেছে, খড়-চাপানো গাড়ির পেট ফেটে গিয়ে এদিক ওদিক বুটোর নাজী ছড়িয়ে পড়েছে।

আর সফল হয়ে ফেঁপে ওঠার আসল গরিমা দেখা যায় সকালবেলার শিশিরে। বেহায়া বড়লোকের মত কাবুল উপত্যকা কেবলি হীরের আঁঠি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়,—বলনমানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

কিন্তু এ সব জেলাই কাবুল নদীর রক্তশোষণ করে। সাপের খোলসের মত সে নদী এখন শুকিয়ে গিয়েছে, বাতাস বইলে বুক চিরে বালু ওড়ে। মার্কস তো আর ভুল বলেননি, ‘শেষণ করেই সবাই ফাঁপে।’

যে পাগমান পাহাড়ের বরফের প্রাসাদে কাবুল নদীর জৌলুশ তার নীল চুড়াগুলো থেকে এক একটা করে সব কটা বরফের সাদা টুপি খসিয়ে ফেলেছে। আকাশ যেন মাটির তুলনায় বহু বেশী বড়িয়ে গেল—নীল চোখে মোলাটে ছানি পড়েছে।

পাকা, পচা ফলনে গাধা মাথা ধরে; আফগানিস্তানের সরাইয়ের চতুর্দিক বন্ধ বলে দুর্গন্ধ যে রকম বেগতে পারে না, কাবুল উপত্যকার চারিদিকে পাহাড় বলে তেমনি পাকা ফল ফসলের গন্ধ সহজে নিকুতি পারে না। বাড়ির সামনে যে ঘূর্ণিঝড় খড়কুটো পাতা নিয়ে বাহিরে যাবে বলে রওয়ানা দেয় সেও দেখি খানিকক্ষণ পরে ঘুরে ফিরে কোনো দিকে রাস্তা না পেয়ে সেই মাঠে এসে সবসুদ্ধ নিয়ে থপ করে বসে পড়ে।

তারপর একদিন উষ্মের সন্ধ্যা এল বড়। প্রথম ধাক্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম, মেনে দেখি শেরির ‘ওয়েস্ট ইন্ড’ কীটনের ‘আতামকে’ বেরিয়ে নিয়ে চলছে—সংশ্লিষ্ট বর্ষিভাবের ‘বর্ষশেষ।’ খড়কুটো, জমে-ওঠা পাতা, ফেলে-দেয়া কুলো সবাই চলল দেশ ছেড়ে মুহাজিরন হয়ে। কেউ চলে সার্কাসের সন্তের মত ডিগবাঁজি খেয়ে, কেউ হনুমানের মত লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে দিয়ে আর বাদবাকী যেন ধনপতিজ দল—প্রলেতাঝিয়ার আক্রমণের ভয়ে একে একে গুড়িয়ে ধরে।

আধঘন্টার ভিতর সব গাছ বিলকুল সাফ।

সে কী বীভৎস দৃশ্য!

আমাদের পাগমান জল কেটে যাওয়ার পর কখনো কখনো দেখেছি কোনো গাছের শিকর পড়ে যাওয়ায় তার পাতা বয়ে পড়েছে—সমস্ত গাছ ধবলকণ্ঠ রোগীর মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

mone-prane-bangali.blogspot.com

এখানে সব গাছ তেমনি দাড়িয়ে, লেগে-সহ্যনি আকাশের দিকে উড়িয়ে। ‘দু’-একনি ‘অন্তর দেখতে পাই গোর দিতে মড়া নিয়ে যাচ্ছে।’ আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলুম কোথাও মড়ক লেগেছে কিনা। ‘নিকটই নাকি গাছ ১০ ফুট বা ১২ ফুট উচুতে এসেছে।’ আবদুর রহমান বলল, ‘না ভুল্লুর, পাতা ঝারার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োয়াও বয়ে পড়ে। এই সময়ই তারা মরে বোঁশী।’

ইতিমধ্যে আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার রীতিমত হাদিক-সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। তার জন্য দায়ী হবশা আবদুর রহমানই।

আমাকে খাইয়ে দাইয়ে রোজ রাঙাই কোনো একটা কাজ নিয়ে আমার পড়ার ঘরের এক কোণে আসন পেতে বসে,—কখনো বাদাম আখরাগের খোসা ছাড়ায়, কখনো চাল ডাল বাড়ে, কখনো কাঁকড়ের আচার বানায় আর নিত্যকাল কিছু না থাকলে সব কাজোড়া জুতো নিয়ে রঙ লাগাতে বসে।

আবদুর রহমানের জুতো বুরুশ করার কায়দা ‘মাদুলী’ সাদ্যন নয়, অতি উচ্চাঙ্গের আঁট। আমার দৃষ্টিবিশ্বাস তার অর্ধেক মেহেতবে মোলাবিসার ছবি আঁকা যায়।

প্রথম বয়েরর কাগজ মেলে তার মাথামাঝে জুতো জোড়টি রেখে অনেককাল পর দেখবে। তারপর দেশপাইয়ের কাটি দিয়ে কোথাও শুকনো কাদা লেগে থাকে তাই ছাড়ায়ে। তারপর লাগাবে এঞ্জিনের পিস্টনের পতিতে বুরুশ। তারপর মেথিলেটেজ পিস্টনে নেকড়া ভিজিয়ে বেছে বেছে যে সব ভায়ায়ায় পুরানো রক্ত জমে গিয়েছে সেগুলো আতি স্তম্ভপণে ওঠাবে। তারপর কাপড় ধোয়ার সাবানের উপর তক্তা নেকড়া চালিয়ে তাই দিয়ে জুতোর উপর থেকে আগের দিনের রক্ত সরাবে। তারপর নির্বিচার চিটু আধমকটাকা বসে থাকবে জুতো শুকোবার প্রতীক্ষা—ওয়াশের আঁটকরা যে রকম ঘনি শুকোবার অন্য সবুর করে থাকেন। তারপর তার রঙ লাগানো দেখে মনে হবে প্যারিস—সুন্দরী ও বৃষ্টি এত ঘড়ে লিপিশুকি লাগান না—তখন আবদুর রহমানের ক্রিটিকাল মোমেন্ট, প্রশ্ন শুধোলে সান্ধ্য পাবেন না। তারপর বা হাত জুতোর তিরের চুকিয়ে ডান হাতে বরশ নিয়ে কানের কাছে তুলে ধরে মাথা নিচু করে যখন ফের বুরুশ চালাবে তখন মনে হবে বেলালর ডাকসান্টে কলাবস সমে পৌঁছাবার পূর্বে যেন দিয়ে মজা গিয়ে বাতাজলশস্য নিয়ে গিয়েছে। তখন কথা বলার প্রশ্নাই ওঠে না, ‘শাবাশ!’ বলালেও ওস্তাদ তেড়ে আসবেন।

সর্বশেষে মোলোয়ে সিদ্দ দিতে অতি যত্নের সঙ্গে সর্বশেষ বুলিয়ে দেবে, মনে হবে দীর্ঘ অনদের পরে প্রেমিক যেন প্রিয়ার চোখে মুখে, কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম দিন আমি আপন অজ্ঞানতা বলে ফেলেছিলুম ‘শাবাশ’।

একটি ‘আট ন’ বছরের মেয়েকে তারই সামনে আমরা একদিন কয়েকজন মিলে অনেকক্ষণ ধরে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিলাম—যে দুপ করে শুনে যাচ্ছিল। যখন সকলের বলা কওয়া শেষ তখন সে শুধু আঁতে আঁস্তে বলেছিল, ‘তবু তো আজ তেল মাখিনি!’

আবদুর রহমানের মুখে ঠিক সেই ভাব।

পেড়ার দিকে প্রায়ই তেবেছি ওকে বলি যে সে ঘরে বসে থাকলে আমার অশ্রুতি বোধ হয়, কিন্তু প্রতিবারেই তার স্বচ্ছন্দ দীর্ঘ ব্যবহার দেখে আটকে গিয়েছি। শেতাঁয় স্থির করলুম, ফাসীতে যখন বসেছে এই সুনিলা মাত্র কয়েক দিনের সুসাগীরি ছাড়া আর কিছুই নয় তখন আমার ঘরে আর সরাইয়ের মধ্যে তফাকত কোথায়? এবং আফগান সরাই যখন সাময়িকী

স্বাধীনতায় প্যারিসকেও হার মানায় তখন কয়েক আবদুর রহমানকে এঘর থেকে ঠেকিয়ে রাধি কোন হক্কের জোরে? বিশেষত সে যখন আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাদামের খোসা ছাড়তে পারে, তবে আমিই বা তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রশান ব্যাকরণ মুখস্ত করতে পারব না কেন?

আবদুর রহমান ফরিয়াদ করে বলল, আমি যে মুইন-উস-সুলতানের সঙ্গে টেনিস খেলা করিয়ে দিয়ে রশান রাজদূতবাসে ফেলতে আরম্ভ করেছি সেটা ভালো কথা নয়।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, মুইন-উস-সুলতানের কোর্টে টেনিসের বল যে রকম শক্ত, এক মুইন-উস-সুলতানকে বাদ দিলে আর সকলের হৃদয়ও সে রকম শক্ত—রশান রাজদূতবাসের বল যে রকম নরম, হৃদয়ও সে রকম নরম।

আবদুর রহমান ফিসফিস করে বলল, 'আপনি জানেন না হজ্জুর, ওয়া সব বেদীন, বেমজহব'। অর্থাৎ ওদের সব কিছু 'ন দেবায়, ন ধর্মায়'।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, তোমাকে ওসব বাজে কথা কে বলেছে? সে বলল, 'সবাই জানে, হজ্জুর; ওদেশে মেয়েদের পর্যন্ত হায়া-শরম নেই, নিয়-শাদী পর্যন্ত গুটে গিয়েছে।'

আমি বললাম, 'তাই যদি হবে তবে বাদশা আমানউল্লা তাদের এদেশে ডেকে এনেছেন কেন?'। ভাললুম এই যুক্তিটাই তার কান দাগ কাটবে সবচেয়ে বেশী।

আবদুর রহমান বলল, 'বাদশা আমানউল্লা তো—'। বলে থেমে গিয়ে চুপ করে রইল।

পরদিন টেনিস খেলার দুইঘণ্টার ফাঁকে দেমিডফকে জানালুম, প্রলেটারিয়া আবদুর রহমান ইউ. এস. আর. সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করে। দেমিডফ বললেন, 'আফগানিস্তান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে নই। তবে তুর্কিস্তান অঞ্চলে আমাদের একটু আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছে বলে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি কর্মধারা একটু অতিরিক্ত খোলাটে হয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছেছে। আমরা উপর থেকে তুর্কিস্তানের কাঁধে জোরে কয়ে নানা রকম সূক্ষ্মকার পাগোতে চাইনে; আমরা চাই তুর্কিস্তান বেন নিজের থেকে আপন মঙ্গলের পথ বেঁচে নিয়ে বাকী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।'

দেমিডফের স্ত্রী বললেন, 'ব্যুৎহার আমীর আর তাঁর সাচোগ্যোপাঙ্গ শোষক-সম্প্রদায় বলশভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজাহারা হয়ে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। তারা যে নানা রকম প্রোপাগান্ডা চালাতে কসুর করবে না, তা তো জানেনই!'

আমি কমুনিজমের কিছুই জানিনে, কিন্তু এদের কথা বলার ধরন, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞের প্রতি সহিষ্ণুতা, আপন আদর্শে দৃষ্টিবাস আমাকে সত্যই মুগ্ধ করল।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করল রাজদূতবাসের ভিতর এদের সামাজিক জীবন। অন্যান্য রাজদূতবাসে বড়কটা, মেজকটা ও ভদ্রতরজনে তফাত যেন পৌরীশঙ্কর, দুমকা পাহাড় আর উইয়ের চিগিটে। এখানে যে কোনো তফাত নেই, সে কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, কিন্তু পার্থক্য কখনো রূঢ় কর্কশরূপে আমার চোখে ধরা দেয়নি।

কত অপরাধ, কত সন্ধ্যা কাটিয়েছে দেমিডফের বসবার ঘরে। তখন এম্পেসির কত লোক সেখানে এসেছেন, পাণিসরি টেনেছেন, গল্প-গুজব করেছেন। তাঁদের কেউ সেক্রেটারি, কেউ ডেকারী, কেউ আফগান, কেউ ভাষ্যন এয়ার ফোর্সের পাইলট—দেমিডফ স্বয়ং রাজদূতবাসের কোষাধ্যক্ষ। সকলেই সমান খাতিয়-যত্ন পেয়েছেন; জিজ্ঞেস না করে জানবার কোন উপায় ছিল না যে, কে সেক্রেটারি আর কে ডেকারী।

খোদ অ্যামবেসডর অর্থাৎ রশ রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রতিষ্ঠা তত্ত্বাধীন স্ট্রৌট পর্যন্ত সেখানে

mone-prane-bangali.blogspot.com

আসতেন। প্রথম দর্শনে তো আমি বগদানফ সায়েবের তালিম মত খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে শেকহায়া করে বললুম, 'I am honoured to meet Your Excellency!' কিন্তু আমার চোপ্ত ভদ্রতায় একসেলেন্সি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে জোর হাত ঝাঁকনি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতখানা তলোয়ারের মত এমনি ধারা চালালেন যে, আমার সমস্ত 'ভদ্রত্বতা' যেন দুটুকরো হয়ে কার্পেটে নুটিয়ে পড়ল।

মাদাম দেমিডফ বললেন, 'হিনি রুশ সাহিত্যের দরদী!'

কোনো ইংরেজ বড়কর্তা হলে বলতেন, 'রিয়েলি? হাউ ইন্টারেস্টিং!' তারপর আবহাওয়ার কথাবার্তা পাড়তেন।

স্ট্রৌট বললেন, 'তাই নাকি, তাহলে বসুন আমার পাশে, আপনার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা হবে।' আর সকলে তখন আপন আপন গোঁফ ফিরে গিয়েছেন। স্ট্রৌট প্রথমই গোটাকয়েক চোখা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার বিদ্যের চোঁড়ি জরিপ করে নিলেন, তারপর পূশকিনের সীতিকাব্য-রস আমাকে মূল থেকে আবৃত্তি করে শোনোতে লাগলেন। যে অংশ বোঝে নিলেন সে-ও জারি মরমিয়া। ওনিয়োগিন সঙ্গোরে নানা দুঃখ, নানা আঘাত পেয়ে তাঁর প্রথমা প্রিয়ায় কাছে ফিরে এসে প্রেম প্রথমত করছেন; উত্তরে প্রিয়া প্রথমত যৌবনের নষ্ট বিবসের কথা ভেবে বলেছেন, 'ওনিয়োগিন, যে আমার বন্ধু, আমি তখন তরুণী ছিলাম, হয়ত সুন্দরীও ছিলাম—'

আমাদের দেশের রায় যে রকম একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, আমার এই নবুন বয়সের কালে।'

আমি তখন হয়ে শুনলুম। আবৃত্তি শেষ হলে ভাবলুম, বরঞ্চ একদিন শুনেতে পার স্বয়ং চাটিল হেদোদা পারে লঙ্কা-ঠাসা চীনেবাদাম খেয়ে শশদে ভাইনে ঝায়ে নাম ঝাড়ছেন, কিন্তু মহামান্য বৃটিশ রাজদূত প্রথমদর্শনে অভ্যাগতকে কীটসের 'ইসাবেলা' শোনালে, এ যেন 'শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

ব্রিটিশ রাজদূতকে হামেশাই দেখছি স্ট্রাইট ট্রাউজার আর স্প্যাট-পরা। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে যেন স্বয়ং পঞ্চম জর্জের মামাতো ভাই। নিতান্ত দৈব-দৃষ্টিপাকে এই দূশমনের পুরীতে বড় অনিচ্ছায় কাল কাটিচ্ছেন। 'কীটস কে, অথবা কারা?—পিছনে যখন বহনচরনের 'এস' রয়েছে? পাসপোর্ট রয়েছে?। বলে দাও, ওসব হবে-টবে না।'

এমন কি, ফরাসী রাজদূতকেও কখনো বগদানফের ঘরে আসতে দেখিনি, যেনওয়া তাঁর কথা উঠলেই বলতেন, 'কার কথা বলছেন?। মিনিষ্টার অব দি ফ্রেন্স লিগেশন ইন কাবুল? ম নিয়ে। উনি হচ্ছেন মিনিষ্টার অব দি ফ্রেন্স লিগেশন ইন কাবুল—'

'মাবুলা অর্থ অভিধানে লেখে, Loony, off his nut।'

স্ট্রৌট বললেন, 'তিনি রাজদূতবাসের সাহিত্যসভাতে চেষ্টা সম্বন্ধে একখানা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। শুনে তো আমার চোখের তারা ছিটকে পড়ার উপক্রম। অরেকটা লিগেশনের কথা জানি, সেখানে চুড়ী পাখি শিকার সম্বন্ধে প্রবন্ধ চালেও চলাতে পারে, কিন্তু চেষ্টা, বাই গ্যাড, স্যার!'

আমি বললাম, 'রশান শেখা হলে আপনার প্রবন্ধটি অনুবাদ করার বাসনা রাধি।'

স্ট্রৌট বললেন, 'হিলফ্য! আপনাকে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। কোনো স্বত্ব সুরক্ষিত নয়।'

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলাম আর পাঁচজন তখন বড়কর্তার মুখের কথা লুফে নেবার জন্য চতুর্দিকে ঝুলে থাকতেন। ছোট ছোট দল পাকিয়ে সবাই আপন আপন গল্প নিয়ে মগন হয়ে ছিলেন। আর সকলে কি জানি আলোচনা করছিলেন, টিক টিক বলতে পারিনে, তবে

গুইয়ে দিল। লেপের তলায় আগেই গরম জলের বাতল ফ্র্যান্সেলে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটোতে পা ঠেকিয়ে আমি মুনি-স্বাধিরে সিংহাসনে পদাভ্যাস করার সুখ অনুভব করলুম। পেটের ভিতর চর্বির ঘন শুক্কয়া, লেপে-চাপা গরম বাতলে গরম, আর আবদুর রহমানের বাঘের খব্বার ডলাই-মলাই তিনে মিলে এক পলকেই চোখের পলক বন্ধ করে ফেলেছিলুম।

সমস্ত কাহিনীটি যে এত বাখানিয়া বললুম তার প্রধান কারণ, আমার দৃষ্টিবিশ্বাস এ বই কোনো দিন কাজে কোনো কাজে লাগবে না। আর আজকের দিনের ভরত-দণ্ডিন কমুনিষ্টরা বলেন, যে-আট কাজে লাগে না সে-আট আটই নয়। অর্থাৎ শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি দেয়ালে মশারির পেরেক লাগা না যায় তবে সে শিবলিঙ্গের 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

তবু যদি কোনো দিন পাকচক্র ফ্রস্টবিটন হয় তবে প্রলেতারিয়ার প্রতীক ওবা আবদুর রহমানকে স্মরণ করে তার দাগওয়াই চলাবেন। সেসে উঠবেন নিশ্চয়ই, এবং তখন যেনে আপনাদের কৃতজ্ঞতা আবদুর রহমানের দিকে ধায়। আবদুর রহমানের প্রাণ্য প্রশংসা আমি কোতাবের মালিকরূপে কেড়ে নিয়ে 'শোষক', 'বুজুয়া' নামে পরিচিত হতে চাইনে।

পরমদিন সকালেবেলা দেখি, তিন মাইল বরফ ভেঙে বৃষ্টি মীর আসলম এসে উপস্থিত। বললেন, 'আজ্ঞাজনের বাচনিক অবগত হইলাম তুমি কল্যা রজনীর প্রথম যাত্রা প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। কুল-সদস্য কহ। শৈত্যাক্রিকে পদমধ্যে আত্মিক ক্রেশ হও নাই তো?'

আমি আবদুর রহমানের কবিরাঞ্জির সালঙ্কার বর্ণনা দিলে মীর আসলম বললেন, 'নাতিদীর্ঘদিবস তথা শবরীর প্রথম যাত্রাই স্বতচ্ছলশকটাত্মকৌশিক শিখির-বিদ্ধ করিতে সক্ষম। কৃশানুশ্বেশর হইতে রক্ষা করিয়া তোমার পরিচায়ক বিচক্ষণের কর্ম করিয়াছে। অপিচ লক্ষ্য করো নাই, স্বদেশে আতপতাপে দগ্ধ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন মাত্রই সুশীলা জননী তদগৌই শীতল জল পান করিতে নিষেধ করেন, অবগাহনকক্ষ উন্মোচন করেন না? সঙ্কটস্থয় আয়ুর্বেদের একই সূত্রে গৃহিত।'

হক কথা।
বললুম, 'ইয়োরাগে আমানউল্লাহ সম্পর্ধনা নিয়ে হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান বড়ই গর্ব অনুভব করছে।'

মীর আসলম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বিদেশে সম্মান-প্রাপ্ত নৃপতির সম্মান স্বদেশে লাঘব হয়।'

এ যেন চাণক্য-শ্লোকের তৃতীয় ছত্র। ভাবলুম, জিজ্ঞেস করি, মহাশয় ভারতবর্ষে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, মুসলমানী না হিন্দুয়ানী, কিন্তু চেপে গিয়ে বললুম, 'আমানউল্লাহ বিদেশে সম্মান পাওয়াতে স্বদেশে সংস্কার কর্ম করবার সুবিধা পাবেন না?'

মীর আসলম বললেন, 'সংস্কার-পর্বকে যে নৃপতি কটমগু, বৈদেশিক সম্মান-মুকুটের গুরুভার তঁাহাকে অধিকতর নিমজ্জিত করবে।'

আমি বললুম, 'রানী সুরাইয়াকে দেখবার জন্য প্যারিসের জেলে-বুড়ো পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে ফটার পর ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, অদ্য যদি তুমি তোমার পদমুদ্রের ব্যবহার পরিত্যাগপূর্বক মন্তকোপরি দণ্ডায়মান হও তবে তোমার মত সম্প্রসারিতচিহ্ন মনুষ্যেরও এবশ্বিধ বাতুলতা নিরীক্ষণ করিবার জন্য কাবুলহট্ট সম্মিলিত হইবে।'

আমি বললুম, 'কী মুশকিল, তুলনাতা আদ্যপাই ঠিক হল না; রানী তো আর কোনোরকম পাপালাপ করছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'মুসলমান রমণীর পক্ষে তুমি অন্য কোন বাতুলতা প্রত্যাশা

করো? অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রশস্ত রাজবস্ত্রে কোন মুসলমান রমণী এবশ্বিধ অশাস্ত্রীয় কর্ম করিতে পারে?'

আমি বললুম, 'আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী কুরান-হাদীস পড়েছেন; মুখ দেখানো তো আর কুরান-হাদীসে ব্যর্থ নেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত শাস্ত্রজ্ঞান এতদ্বলে আবাস্তর। পার্বত্য উপজাতির শাস্ত্রজ্ঞান এতদ্বলে প্রযোজ্য। তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।'

আমি আলোচনাতী হাফ্ফা করবার জন্য বললুম, 'জানেন, ফরাসী ভাষায় 'সুরীরা' শব্দের অর্থ 'মুখ হাস্য'। রানী সুরাইয়ার নাম তাই প্যারিসের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'আমীর হবীবউল্লাহ নামের অর্থ 'প্রিয়তম বান্দব'; ইংরেজ শতাব্দীর এই শব্দার্থের প্রতি আর্মীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করত শপথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন শতাব্দীর লৌহীলক ঠায়াহ করণ্থে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, তখন হবীবউল্লাহর কোন 'হবীব' তাহাকে স্মরণ করিল? অপিচ, হবীবউল্লাহর হবীববর্গই তাহাকে পুলসিরাভের (বেতস্কীর) প্রান্তস্থে অকারণে, অসময়ে দণ্ডায়মান করাইয়া দিল।'

আমি বললুম, 'ও তো পুরানো কাহিনী। কিন্তু ঠিক করে বলুন তো আপনি কি আমানউল্লাহর সংস্কার পন্থা করেন না?'

বললেন, 'বৎস, গুস্তার পরবেশা করিয়া আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমি শিক্ষাচলৎস্কারের বিরুদ্ধে কেন দণ্ডায়মান হইব? কিন্তু আমানউল্লাহ যে ফিরিঙ্গী-শিক্ষা প্রবর্তনাভিলষী আমি তাহা ভারতবর্ষে দর্শন করিয়া দৃষ্টান্তে করিয়াছি। কিন্তু ভদ্র, তোমার সুমিষ্ট চৈনিক মুখ পরিত্যাগ করিয়া এই তিক্ত বিষয়ের আলোচনায় কি লভা? যুগপত কি তুমি স্বদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছ? গুরুগৃহের সুগন্ধ নাসারঞ্জে প্রবেশ করিতেছে।'

আমি বললুম, 'আপনার জন্যও এক প্যাকেট এনেছি।'

মীর আসলম সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু ভদ্র, শুদ্ধাঙ্গধরগিকের ন্যায় প্রাণ্য অর্পণ করিয়াছ সত্য?'

আমি বললুম, 'আপনার কোনো ভয় নেই। কাবুল কাস্টম হৌসকে ফাঁকি দেবার মত এলেম আমার পেঁচে নেই। বিছানার ছারপোকাকে পর্যন্ত সেখানে পাশপোট দেখাতে হয়, মাশুল দিতে হয়। আমি তাদের সব অন্যায় দাবীদায়ী কড়ায়-গুণ্ডায় শোধ করেছি। আপনাকে হারাম খাইয়ে আমি কি আখেরে জাহান্নামে যাব?'

মীর আসলম আমাকে শীতকালে কোন কোন বিষয়ে সর্বাধন হতে হয় সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, আবদুর রহমানকে ডেকে ঘৃতলবণতৈলতুল্লবস্রাইঙ্কন সম্বন্ধে নানা সুমুক্তি দিয়ে বিদায় নিলেন।

খবর পেয়ে তারপর এলেন মৌলানা। আমি আমানউল্লাহর বিদেশে সম্মান পাওয়া, আর সে সম্বন্ধে মীর আসলমের মন্তব্য তঁাকে বললুম। মৌলানা বললেন, 'আমানউল্লাহ যাদের কথায় চলেন, তারা তো বাদশাহের সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করছে। তারা বলছে, 'মুস্তফা কামাল যদি তুর্কীকে, রেজা শাহ যদি ইরানকে প্রগতির পথে চালাতে পারেন, তবে আমানউল্লাহই বা পারবেন না কেন? এই হল তাদের মনের ভাব; কথাটা খুলে বলার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। কারণ কোনো রকম বাধাও তো কেউ দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু মৌলানা, কতকগুলো সংস্কারের প্রয়োজন আমি মোটেই বুঝে উঠতে পারিনে। এই ধরো না শুক্রবারের বদলে বৃহস্পতিবার ছুটির দিন করা।'

মৌলানা বললেন, 'শুক্রবার ছুটির দিন করলে জুম্মা নামাজের হিজিকি সমস্ত দিনটা

কেটে যায়, ফলাতো কাছ-কর্ম করার ফুরসত পাওয়া যায় না। তাই আমানউল্লা দিয়েছেন সমস্ত বৃহস্পতিবার দিন ছুটি, আর শুক্রবারে কুশনার নামাজের জন্য আধ ফটার বদলে এক ফটার ছুটি। কিন্তু জানো, আমি আরেকটা কার্য বের করেছি। এই দেখ না! আরোপনের করে যদি তুমি শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন বুধবার বেছোও, এখানে পৌছবে ছুটির দিন বৃহস্পতিবারে, তারপর ইরাক পৌছবে শুক্রবারে সেও ছুটির দিন, তারপরের দিন প্যালেস্টাইনে—সেখানে ইস্রায়েলের জন্য শনিবারে ছুটি, তারপরের দিন রবিবারে ইয়েরোপে, তারপরের দিন সাইপ্রস-আলবোনেও, সেখানে তো তামাম হস্তা ছুটি।

আমি বললুম, 'উত্তম আবিষ্কার করেছে, কিন্তু বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছে তো? না হলে বরফ ভেঙে কাবুলে ফিরবে কি করে?'

মৌলানা বললেন, 'দু—আমাদের মাগেই বরফের উপর পায়ে চলার পথ পড়ে যাবে; আসতে যেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি চললুম দেশে, বড়কি নিয়ে আসতে। বেনগুয়া সায়েব মত দিয়েছেন, তুমি কি বল?'

আমি শুধলুম, 'বউ রাজী আছেন, হা?'

আমি বললুম, 'তবে' আর কাবুল—অমৃতসরে প্লেবিসি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? মৌলানা বিবির ভাষায় তো রয়েছে বাপ—

কিন্তু আমি বিবির রাজী? কিস্য করে রাজী?

মানে মনে বললুম, 'বগদাদক গেছেন, তোমার দাড়িটির দশনও এখন আর কিছু দিনের তরে পাব না। নতুন বউয়ের কা তব কাছা হতে অস্তত ছাটি মাস লাগার কথা।'

মৌলানা চলে যাওয়ার পর আবদুর রহমানকে ডেকে বললুম, 'দাদা তো হে কুসিখানা জানালার কাছে বসিয়ে; বাকী শীতটা তোমার এ বরফ দেখেই কাটা'।

আবদুর রহমানের বর্ণনামাফিক সব রকমেরই বরফ পড়ল। কখনো পেঁজা পেঁজা, কখনো গালা গালা, কখনো ঘূর্ণিঝড়ের চক্র বেয়ে দশরশিকি অন্ধকার করে, কখনো আচ্ছন্ন ঘবনিবার মত গিরিভ্রান্তর আপসা করে দিয়ে; কখনো অতি কাছে আমারই বাতায়ন পাশে, কখনো বহুদূরে সানুশ্চিত হয়ে, শিশুর চুচন করে। আস্তে আস্তে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল, শুধু প্রহরবিজিত চিমার গাছের সারি দেখে মনে হয় দাঁত ভঙা পুরানো চিকুনিখানা ঠাকুরমা বেনে মেয়ালের গায়ে খাড়া করে রেখে বরফের পাকা চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আবদুর রহমান মর্মান্বিত। আমাকে প্রতিবার এ রকম সময় একবার করে বাইরের দিকে তাকায় আর আতঙ্কে বলে, 'মা হুজুর, এ বরফ ঠিক বরফ নয়। এ শহরে বরফ, বাবুদারী বরফ। সত্যিকার খাঁটি বরফ পড়ে পানসির। চেয়ে দেখুন বরফের চাপে এখনো গোট বন্ধ হয়নি। মানুষ এখনো দিবা চলাফেরা করছে, ফেসে যাচ্ছে না।'

আবদুর রহমানের ভয় পাছে আমাকে বোঝা গেলো কবুল উপত্যকা তার ভেজাল বরফ গাছিয়ে দেয়। নিঃসংশয় যদি বিনাভে হয় তবে বেনে আমি কিনি আসল, খাঁটি মল 'মেড ইন পানসির'।

একবিশ

শীত আর বসন্ত ঘরে বসে, দুই সাতার দিয়ে কাটতে হল। এদেশে বসন্তের সঙ্গে আমাদের বর্ষার ভূদনা হয়। সেখানে গীষ্মকালে ধরণী শুভ্রশয়নে পিপাসার্তা হয়ে পড়ে থাকেন, অথচাস্য যে কোনো দিবসই হোক ইন্দুপূরীর নববর্ষণ বারত

mone-prane-bangali.blogspot.com

পেয়ে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হন। এখানে শীতকালে ধরিত্রী প্রাণহীন সম্পদ-বিহীন মহানিদ্রায় লুটিয়ে পড়েন, তারপর নববর্ষের প্রথম রৌদ্রে চোখ মেলে তাকান। সে তাকানো প্রথম ফুটে ওঠে গাছে গাছে।

দূর থেকে মনে হল, ফাকাশে সাদা গাছগুলিতে নৃষি কোদারকর্ম সবুজ পোকাক লেগেছে। কাছ দিয়ে দেখি গাছে গাছে অশুণিত ছোট ছোট পাতার কুঁড়ি; জন্মের সময় কুকুরছানার বন্ধ চোখের মত। তারপর কয়েকদিন লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখি সেগুলো ফুটেছে আর দুটি দুটি করে পাতা ছুটে বেরিয়েছে—গাছগুলো বেনে সমস্ত শীতকাল বকপাখির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ ডানা মেলে ওজরার উপভ্রম করেছে। সহস্র সহস্র সবুজ বলাকা বেনে মেলে ধরিয়ে লক্ষ লক্ষ অকুরের পাতা।

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন কবীর।

গাছে গাছে দেখেন—হামি, পাতায় পাতায় আড়াখাড়ি—কে কাকে ছেড়ে তড়াতড়ি গাছিয়ে উঠবে। কোনো গাছ পোজার দিকে সড়া দেয়নি, হঠাৎ একদিন একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ মেলে দেখে আর সবাই চের এগিয়ে গেছে, সে তখন এমনি জোর ছুটি লাগাল যে, দেখতে না দেতো আর সবাইকে পিছনে ফেলে বাজী জিতে, মাথায় আইভি মুকুট পরে সর্বস্ব দুলতে লাগল। কেউ সাদা-গায়ে কিছু পরে শুধু মাথায় সবুজ মুকুট পরল, কেউ ধীরেসুস্থ-সবালগা যেন সবুজ চন্দনের কোঁয়া পরতে লাগল। এতদিন বাতাস শুকনো ডালের ভিতর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলে যেত, এখন দেখি কী আদরে পাতাগুলোর গায়ে হিনিয়ে-বিনিয়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

কবুল নদীর হকের উপর জমে-যাওয়া বরফের জগদদল-পাথর ফেটে চোঁচির হল। পাহাড় থেকে নেমে গভীর গর্জনে শত শত নব জলধারা—সঙ্গে নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ পাহাড়ের নুড়ি আর বরফের টুকরো। নদীর উপরে কাঠের পুলগুলো কাপতে আরম্ভ করেছে—সিকন্দর শাহের আমলে থেকে তারা হুটু ভেঙ্গে কতবার নল পড়ছে, ভেসে গিয়েছে, ফের দাঁড়িয়ে উঠেছে তার হিসেব কেউ কখনো রাখতে পারেনি।

উপরে তাকিয়ে দেখি গভীর নীলাবুজের মত নবীন নীলাকাশ হবনশুভ্র মেঘের ঝালর বুলিয়ে চন্দ্রাত্মা সাজিয়েছে।

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি সবুজের বন্যায় জনপদ অরধ্য ভুবে গিয়েছে। এ রকম সবুজ দেখেই পূর্ববঙ্গের কবি প্রিয়র শামাল রঙের স্মরণে বলেছিলেন—

কিন্তু আমাদের বয়। আর এদেশের বসন্তে একটা গভীর পাখা রয়েছে। বর্ষায় আমাদের মন বরষায্যে হয়, এদেশের জনপ্রাণীর মন বাহিরমুখ্য হয়। গাছপালার সঙ্গে সঙ্গের মায়া যে সুপ্রাণিত নব যৌবনের সম্পদ অনুভব করে তারই স্মরণে কবি বলেছেন—

শুধু ওমর খৈয়াম দোঁটানার ভিতর থাকা পছন্দ করেন না। তিনি গর্জন করে বলেছেন,

বিবিধিবিদ্যার শীতপরিধান

ফাগুন আগুনে দহন করো।

হে সাকি, পেয়লা অধরে ধরো।*

কাবুলীরা তাই বেরিয়ে পড়তে, বা বেরিয়ে উপায় নেই—শীতের আলানী কাঠ ফুরিয়ে এসেছে। দুশা ভেড়ার কাবনা তলায় এসে ঠেকেছে, ঠুটকি মাংসের পোকা কিলবিল করছে। এখন দাস্তগু বসন্তের রোদে শরীরকে ক্লিষ্ট তাতনো যায়, দুশা ভেড়া কচি বাসে চরানো যায় আর আখখোঁচড়া শিকারের জন্য দু'চার দল পাখিও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। আবদুর রহমান বললে, পাশিশির অঞ্চলে ভাড়া বরফের তলায় কি এক রকমের মাছও নাকি এখন ধরা যায়। অনুমান করলুম, কোন রকমের পিঙ্ক ট্রাউটই হবে।

রথ দেখার সময় যারা কলা বেচার দিকেও মাঝে মাঝে ঘুরে দেন তাঁদের মুখে শুনেছি কুবের যে ফকরে ঠিক একটি বৎসরের জন্যই নির্বাসন দিয়েছিলেন তার একটা গভীর কারণ আছে। হয় ক্ষতুভেদ হয় রকম করে প্রিয়ার বিরহযন্ত্রণা ভোগ না করা পর্যন্ত মানুষ নাকি পরিণতি বিচ্ছেদেরদানের স্বরূপ চিনতে পারে না; আর বিদগ্ধ জনকে এক বছরের বেশী শাস্তি দেওয়াতেও নাকি কোনো সুলভ চতুরতা নেই—সোজা বাঙালি তখন তাকে বলে মরার উপর খাড়ার ঘা দেওয়া মাত্র।

আফগান—সরকার অথবা বিদ্রোহী নন বলে ছয়টি স্বত্ব পূর্ণ হওয়া মাত্রই আমাকে পাণ্ডুবর্জিত গণগ্রামের নির্বাসন থেকে মুক্তি দিয়ে শহরে ঢাকারী দিলেন। এবারে বাসা পেলুম লব-ই—সরিয়ায় অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে, রাশান দূতাবাসের গা ঘেঁষে, বেনওয়া সড়কের সঙ্গে একই বাড়িতে।

প্রকাণ্ড সে বাড়ি। ছোটোমতো দুর্গ বললেও ভুল হয় না। চারদিকে উঁচু দেয়াল, ভিতরে চকমেলানো একতলা দোতলা নিয়ে ছাষিশখানা বড় বড় কামরা। মাঝখানের চত্বরে ফুলের বাগান, জলের ফোয়ারাটা পর্যন্ত বাদ যায়নি। বড় লোকের বাড়ি সরকারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে—বেনওয়া সায়েব ফদি-ফিকির করে বাড়িটা বাগিয়েছিলেন।

আমি নিলুম এক কোশে চারটে ঘর আর বেনওয়া সায়েব রইলেন আরেক কোশে আর চারটে ঘর নিয়ে। বাকী বাড়িটা ঝা ঝা করে, আর সে এতই প্রকাণ্ড যে আবদুর রহমানের সঙ্গীরা রবও কায়রুশে আধিনা পাড়ি দিয়ে ওপরে পৌঁছায়।

শেহের এসে গুস্তিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল। রাশান রাজদূতাবাসে রাজাই যাই—দুর্দীন না গোলে (দেমিফক এসে দেখা দেন)।—সইফুল আলম মাঝে মাঝে টু মেরে যান, সোমখ বউ সম্বন্ধে অহরহ দুস্তাভাগ্রস্ত মৌলানার দাড়ির দর্শনও মাঝে মাঝে পাই, দোস্ত মুহম্মদ ঘুরিয়ারুর মত বেল্লা-অবেলায় চকর ঘেরে ঘেরার সময় 'কলাজা মুনলা' ফেলে যান, বিদক বীর আসিম সূক্ষি টেনিক যুধ পান করে যান, তা ছাড়া ইনি উনি তিনি তো আজেনই আর নিভান্ত বাধ্যবদ্ধ ভক্ত হল বিরহী যক্ষ বেনওয়া তো হাতের নাগাল।

রাশান রাজদূতাবাসে আরো অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল; দেমিফককে বাদ দিলে সকলের পয়লা নাম করণে হয় বলশফের। নামের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে তাঁর দেহ—ব্যোদ্রাস্ক বৃক্ষক্ষ শালগ্রামশুমহাভূজঃ বললে আবদুর রহমান বরফ অপাংক্বেয় হতে পারে, ইনি সে বর্ণনা গলাধ্বকরণ করে অনায়াসে সেকও লেপিঙ চাইতে পারেন।

আবদুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় সে জিত্তীয় নরদানবের কথা বলেছিলুম ইনিই সে-বিভীকী।

* অনুবাদকের নাম মনে নেই বলে দৃষ্টিভ্রম।

বহুবীর এর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি—কাবুল বাজারের মত পপুলার লীথ অব নেশনসে আজ পর্যন্ত এমন দিশী বদিশী চোখে পড়েনি যে তাঁকে দেখে হকচকিয়ে যাননি।

ঊর্দুয়ায় সোয়ার হলে তক্ষুনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে—বহু ঘোড়াকে ঘাবড়ে গিয়ে সামনে পা দুটো আকাশে তুলতে দেখছি।

টেনিস-কোর্টে রেকট নিয়ে নামলে শতপুঙ্ক বেজ—লাইনের দশ হাত দূরে তারের জালের গা ঘেঁষে দাঁড়াত। বলশফ বেজে দাঁড়ালে তাঁর কোনো পাটনার নেটে দাঁড়াতে রাজী হত না, শতপুঙ্কের তো কথাই ওঠে না। তাঁতের রেকট ঘন ঘন ছিড়ে যেত বলে আলুমিনিয়াম জাতীয় হাড়ুর রেকট নিয়ে তিনি তাকু হাকড়াতে, স্বচ্ছবে নেটে ডিঙাতে পারতেন—লাফ দেবার প্রয়াসেই হত না—আর খেলা নেটে গিফট করার জন্য এক হাতে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে মেয়েরা যেরকম সেলাই কলের হাতল ঘোরায়।

শুনেছি বিলেতে কোনো কোনো ফিল্ম নাকি যোলো বছরের কম বয়স হলে দেখতে দেয় না—চরিত্র দোষ হবে বলে; যাদের ওজন একশ' ঘাট পৌণ্ডের কম তাদের ঠিক তেমনি লেশফের সঙ্গে শেকহ্যাগু করা বারণ ছিল, পাছে হাতের নড়া ঝাঁপ থেকে বসে যায়। মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

বীরপুঙ্ক হিসেবে রাশান রাজদূতাবাসে বলশফের বিস্তার ছিল। ১৯১৬ সাল থেকে বলশফকে বিনোদের শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে বিনোদে বাস্তব লড়াই লেজেনে। ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে যখন রশবাহিনী পোলায়ও লড়াই হেরে পালায় তখন বলশফ রাশান ক্রাভালিরিতে ছোকরা অফিসার। সেবারে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার সময় তাঁর পিঠের চোদ্দ জায়গায় জখম হয়েছিল—বিস্তার ঝুলোঝুরি পর একদিন শাট খুলে তিনি আমায় দাগগুলো দেখিয়েছিলেন। কোনো কোনোটা তখনো আধ ইঞ্চি পরিমাণ পড়ী। আমি টাট্টা করে বলেছিলুম, 'পুণ্ডে তব অস্ত্র-লেখা'।

বলশফকে কেউ কখনো চটাতো পারেনি বলেই রসিকতা করেছিলুম। তিনি ভরতবর্ষের ক্ষত্র বীরদ্বৈর, 'কোভ' শুনে বললেন, 'যদি সেদিন না পালাতাম তবে ব্রহ্মশির আমলে পোলদের বেধড়ক পল্টা ঘর দেবার সুখ থেকে যে বঞ্চিত হতুম, তাহা কি।

মাদাম দেমিফক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আর জানেন তো, মসিয়ো, ঐ লড়াইতেই সোভিয়েট রাশার অনেক পথ সুঘা হয়ে যায়।'

বলশফের একটা মস্ত লোম দুদগু চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। হাত দুখানা নিয়ে যে কি করবেন ঠিক করতে পারেন না বলে এটা সেটা নিয়ে সব সময় নাড়াচাড়া করেন, বেখোলায় একটু বেশী চাপ দিতেই কর্কশুটা পর্যন্ত ভেঙেনা যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেই আমার টুকিটাকি সব জিনিস তাঁর হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে ফেলতুম। আমার ঘরে ঢুকলে আমি তৎক্ষণাৎ তাকে একধালা আস্ত আখরোট খেতে দিতুম।

দুটো একটা খেতেন মাঝে মাঝে—যাওয়ার পর দেখা যেত সব কাটি আখরোটের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছে, চহারকোশজিকন (হাফুডি) না দেওয়া সত্ত্বেও।

এ রকম অভ্যস্তত্ব লোক সমস্ত কাবুল শহরে আমি দুটি দেখিনি। একদিন তাই যখন দেমিফকের ঘরে আলোনা হচ্ছিল তখন বলশফের সবচেয়ে দিশী-দোস্ত রোগাপটকা মিশেশকফ বললেন, 'বলশফের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব তার গায়ের জোরের ভয়ে।'

বলশফ বললেন, 'তা হলে তো আমার সবচেয়ে বেশী শত্রু থাকার কথা।'

মিশেশকফ যা বললেন, পদাবলীর ভাষায় প্রকাশ কবলে তার রূপ হয়—

পড়তে পারে। কিন্তু ইরানী, কাবুলীরা আরবী জানে না; গুরু না নিলে কি উপায়?

এ-তরফে শেষ কথনো হবে না।

কিন্তু বিষয়টা যদি ধর্মের গভীর ভিতরেই বদ্ধ থাকত, তবে আমানউল্লা গুরু-ধরা ব্যরণ করতেন না। কারণ, যদিও মানুষ গুরু স্বীকার করে ধর্মের জন্য, তবু দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত গুরু দুনিয়াদারীর সব ব্যাপারেও উপদেশ আরম্ভ করেছেন এবং গুরুর উপদেশ সাফাৎ আদেশ।

তাহলে দাঁড়ালে এই যে, আমানউল্লার আদেশের বিরুদ্ধে মোল্লা যদি তাঁর শিষ্য কোনো সেপাইকে পাশ্টা আদেশ দেন, তবে সে সেপাই মোল্লার আদেশই যে মেনে নেবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

চার্চ বনাম স্টেট।

গোলাপী চশমাটা কপালে তুলে অনুসন্ধান করলুম, দেয়ালে কোনো লেখা ফুটে উঠেছে কিনা, আমানউল্লা যেন হঠাৎ জারী করলেন। তবে কি কোনো অবাধ্যতা, কোনো বিদ্রোহ, কোনো—? কিন্তু এসব সন্দেহ কাবুলে মুখ ফলত বলা তো দূরের কথা, ভাবতে পর্যন্ত ভয় হয়।

আমার শেষ ভরসা মীর আসলাম। তিনি দেখি কালো চশমায় আরেক পাঁচ ভুলো মাথিয়ে রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। খবরটা দেখলুম তিনি বহু পূর্বেই জেনে গিয়েছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ইহলোক-পরলোক সর্বলোকের জন্যই গুরু নিম্নয়োজন।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনি যখন আপনার ভারতীয় গুরুর কথা স্মরণ করেন, তখনই জে দেখছি তাঁর প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ।'

মীর আসলাম বললেন, 'গুরু দ্বিবিধ। যে গুরুগৃহে প্রবেশ করার দিন তোমার মনে হইবে, গুরু ভিন্ন পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারো না এবং ত্যাগ করার দিন মনে হইবে, গুরুতে তোমার প্রয়োজন নাই, তিনিই যথার্থ গুরু—গুরুর আদর্শ তিনি যেন একদিন শিষ্যের জন্য সম্পূর্ণ নিম্নয়োজন হইতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরু শিষ্যকে প্রতিদিন পরাধীন হইতে পরাধীনতর করেন। অবশেষে গুরু বিনা সে-শিষ্য নিম্নখাসপ্রশাসনকর্ম পর্যন্ত সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। আমার গুরু প্রথম শ্রেণীর। আফগান সৈন্যের গুরু দ্বিতীয় শ্রেণীর।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ আপনার গুরু আপনাকে স্বাধীন করলেন; আফগান সেপাইয়ের গুরু তাকে পরাধীন করেন। পরাধীনতা ভালো জিনিস নয়, তবে কেন বলেন, গুরু নিম্নয়োজন? বরঞ্চ বলুন, গুরুগৃহে সেখানে অপকর্ম।'

মীর আসলাম বললেন, 'অস, সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রশ্ন, সংসারে কয়জন লোক স্বাধীন হইয়া চলিতে ভালোবাসে বা চলিতে পারে। যাহারা পারে না, তাহাদের জন্য অন্য কি উপায়?'

আমি বললুম, 'খুদায় মালুম। কিন্তু উপস্থিত বলুন, সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা?'

মীর আসলাম বললেন, 'নৃপতির সমীকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে না যতক্ষণ না সিংহাসনের জন্য অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হন।'

আমি ভাবি খুশী হয়ে বিদায় নিতে গিয়ে বললুম, 'কয়েকদিন হল লক্ষ্য করছি, আপনার ভাষা থেকে আপনি কঠিন আরবী শব্দ কমিয়ে আনছেন। সেটা কি সজ্ঞানে?'

mone-prane-bangali.blogspot.com

মীর আসলাম পরম পরিতোষ সহকারে মাথা দেলাতে দেলাতে হঠাৎ অত্যন্ত গ্রাম্য কাবুলী ফাসীতে বললেন, 'এ্যাদিনে বুকুতে পারলে চাঁদ? তবে হক কথা শুনে নাও। আর বছর যখন হেথায় এলে তখন ফাসী জানতে চু-চু। তাইতে তোমায় তালিম দেবার জন্য আরবী শব্দের বেড়া বানা তুম, তুমি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরোতে। গোড়ার দিকে ঠাণ্ড গুলো জখম-টখমও হয়েছে। এখন দিবা আরবী মোড়ার মত আরবী বেড়া ডিঙাচ্ছে বলে খামকা বখেড়া বাঁধার কশ্ম বন্ধ করে নিলুম। গুরু এখন ফালতো। মাথার ভসভসে বিলুতে তুরপুন সিঁহলোনা?'

আমি বাড়ি ফেরার সময় ভাবলুম, লোকটি সত্যিকারের পণ্ডিত। গুরু কি করে নিজেকে নিম্নয়োজন করে তোলেন, সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন।

তারপর বেশী দিন যায়নি, এমন সময় একদিন নোটিশ পেলাম, একদল আফগান মেয়েকে উচ্চশিক্ষার জন্য তুর্কীতে পাঠানো হবে; স্বয়ং বাদশা উপস্থিত থেকে তাদের বিদায়-আশীর্বাদ দেবেন।

আমি যাইনি। বৃটিশ রাজদুতাবাসের এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীর মুখ থেকে বর্ণনাটা শুনলুম। তার নাম বলব না, সে নাম এখনো মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে ধুমকেন্দ্র মত দেখা দেয়। বললেন, 'গিয়ে দেখি, জনকুড়ি কাবুলী মেয়ে গার্ল গাইডের সঙ্গে পরে দাঁড়িয়ে। আমানউল্লা স্বয়ং উপস্থিত, অনেক সরকারী কর্মচারী, বিদেশী রাজদুতাবাসের গণ্যমান্য সভাপণ, আর একপাশে মহিলারা। রানী সুরাইয়াও আছেন, হ্যাটের সামনে পাতলা নেটের পরদা।

'আমানউল্লা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক ঝাঁট এবং পুরনো কথা দিয়ে অবতরমিকা শেষ করে বললেন, 'আমি পদা-প্রথার পক্ষপাতী নই, তাই আমি এই মেয়েদের বিনা বোরকারে তুলী পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমি স্বাধীনভাষায়ী; তাই কবুলের কোনো মেয়ে যদি মুখের সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরোতে চায়, তবে আমি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমার আমি কাউকে জোর করতেও চাইনে, এমন কি, মহিষী সুরাইয়াও যদি বোরকা পরাই পছন্দ করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

কর্মচারীটির বললেন, 'এতো ভালোয়-ভালোয় চলল। কিন্তু আমানউল্লার বক্তৃতা শেষ হতেই রানী সুরাইয়া এগিয়ে এসে নাটকীয় ঢঙে হ্যাটের সামনের পর্দা ছিড়ে ফেললেন। কাবুল শহরের লোক সভাস্থলে আফগানিস্তানের রাজমহিষীর মুখ দেখতে পেল।'

কর্মচারীটির রসবোধ অত্যন্ত কম, তাই বর্ণনাটা দিলেন নিত্যন্ত নীরস-নিজলা। কিন্তু ঝুটিয়ে যে জিজ্ঞেস করব, তারও উপায় নেই। হয়ত খুব এসেছেন রিপোর্ট তৈরী করার মতবাব নিজে—ঘনটা ভাবতবাসীর মনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই হবে রিপোর্টের মশলা। আমিও 'পাকার' খেলার জুয়াড়ীর মত মুখ করে বসে রইলুম।

যাবার সময় বললেন, 'এরকমধারা ড্রামাটিক কায়দায় পর্দা ছিড়ার কি প্রয়োজন? রয়েসয়ে করলেই ভালো হত না?'

আমি মনে মনে বললুম, 'হয়রেকের সনাতন পন্থা। সব কিছু রয়েসয়ে। সব কিছু টািপেটোপে। তা সে ইংরেজী লেখাপড়া চালানোই থেকে, আর ঢাকাই মসলিনের বুক ছিড়ে টুকরো টুকরো করাই থেকে। ছুঁ হযে টুকবে, মুঘল হযে বেগবে।'

কিছু একটা বলতে হয়। নিবেদন করলুম, 'এসব বিষয়ে এককালে ভারতবাসী মাত্রই কোনো না কোনো মত পোষণ করত। কারণ তখনকার দিনে আফগানিস্তান ভারতবর্ষের মুখের দিকে না তাকিয়ে কোনো কাজ করত না, কিন্তু এখন আমানউল্লা নিজের চোখে সমস্ত

পশ্চিম দেখে এসেছেন, রাস্তা তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছে; আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব, মঙ্গল কামনা করব, বাস্!

কমট্যারী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবলুম।
কিন্তু একটা কথা এখানে আমি আমার পাঠকদের বেশ খানিক করে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি এবং কাবুলের আর প্যাঁচজন তখন আমানউল্লাহর এসব সংস্কার নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাইনি। মানুষের স্বভাব আপন ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বড় করে দেখা—হাতের সামনের আপন হাতের মুঠি হিমালয় পাহাড়কে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়ত যে—সব সংস্কার করা হচ্ছিল তার একটাও আমার মত প্যাঁচজনের স্বার্থকে স্পর্শ করেনি। সুঁচি সংগে নিয়েই আমরা কাবুল গিয়েছি, কাছেই সুঁচি পরার আঁকি আমাদের বিচলিত করবে কেন; আর আমরা পাতলা নোটের বাবসাও করিনে যে, মহারানী তাঁর হার্টের নোট ছিড়ে ফেললে আমাদের দেউলে হতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ইরান—আফগানিস্তানের বাদশা দেশের লোকের মাল-জানের মালিক। আর সকলেই জানে এই দুই বস্তুই অত্যন্ত ফানী—নশ্বর। নশ্বর জিনিস এমনি যাবে অমনি যাবে—বাদশাহের খামখেয়ালি নির্মিতত্ত্ব ভাগী মাত্র। রাজা বাদশা তো আর গাধাখচ্চর নন যে, শুধু দেশের মোট পিঠে করে বইবেন আর জবর কাটবেন—তারা হলেন গিয়ে তাজী ঘোড়ার জার। দেশাধিকে পিঠে নিয়ে যেমন হঠাৎ প্রগতির দিকে খামকা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবেন, তেমনি কারণে অকারণে সোয়ারকে দুটো চারটে লাথি চাঁটও মারবেন। তাই বলে তো আর ঘোড়ার দানাখিনি বন্ধ করে দেওয়া যায় না।

কাজেই কাবুল শহরের লোকজন খাচ্ছে—দাচ্ছে ঘুমচ্ছে, বেরিয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় আমানউল্লাহর প্রতিজ্ঞা যে, তিনি সব মেয়েদের বেপদার্য বেরবার সাহায্য করবেন, এক ভিন্নরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। শোনা গেল বাদশাহর হুকুম, কোনো স্ত্রীলোক যদি বেপদা বেরতে চায় তার স্বামী যেন কোনো ওজর-আপত্তি না করে। যাদের আপত্তি আছে, তারা যেন বউদের তালিকা দিয়ে দেয়। আর তারা যদি সরকারী চাকরী করে, তবে আমানউল্লাহ দেখে নেন। কি দেখে নেন? সেটা পটাপটি বলা হয়নি, তবে চাকরীটাও হয়ত বউদের সঙ্গে-সঙ্গে একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সাধে কি আর বাংলায় বলি, 'বিবিলিন চাল যান লবে-জান'। শুধু বিবিলিন চাল গেলে শুধু মানুষ প্রেমিকদের কথা আলাদা—'লবে জান' হবে কেন? সংগে সংগে চাকরীটা গেলে পর মানুষ অন্যায়ের 'লবে-জান' হয়।

মীর আসলাম বললেন, 'গিন্নীকে গিয়ে বন্ধু, 'ওগো চোখে সূরমা লাগিয়ে বে-বোরাকর কাবুল শহরে এতটা রোদ নেরে এস।' বিশ্বাস করবে না ভায়া, বান্দা ঝুঁকে মারলে। তা জানো তো, মোল্লার পাগড়ি, বদনাটাই খেল টোল। আশ্মা অবিশি টাল খেয়ে খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।'

আমি বললুম, 'হা হা জানি, পাগড়ি অনেক কাজে লাগে।'

মীর আসলাম বললেন, 'ছাই জানো, বে করলে জানতে। বেয়াজা বউকে তোমার তো আর বেঁধে রাখতে হয় না।'

আমি বললুম, 'বাজে কথা। আমানউল্লাহ ক্যাঁচ করে কেটে দিয়েছেন। আর ভালোই করেছেন, বউকে বেঁধে রাখতে হয় মনের শিকল দিয়ে, হৃদয়ের জিহ্বার দিয়ে।'

মীর আসলাম বললেন, 'হৃদয়মনের কথা ওঠে যেখানে তরুণ-তরুণীর ব্যাপার। যাট বছরের বুড়ো বোল বছরের বউকে কোন্ মনের শেকল দিয়ে বাঁধতে পারে বনো? সেখানে কারিন-নামা সর্বাত্মক ঢাকা-বোরকা, আর পাগড়ির নাজ।'

আমি বললুম, 'তাতো বটেই।'

মীর আসলাম বললেন, 'আমানউল্লাহ যে পদা ছেঁড়ার জন্য তব্বী লাগিয়েছেন, তাতে জোয়ানদের কি? বেদনাতা সেখানে নয়। বুড়া সর্দারদের ভিতর চিৎরি বউদের ঠেকাবার জন্য সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'তরুণীরা ঢকল হয়ে উঠেছেন নাকি?'

তিনি বললেন, 'ভালা রে বিপদ, আমাকে তুমি নওরোজের আকবর বাদশা ঠাওরাণে নাকি? চিৎরিদের আমি চিনি। কথোকে? ইন্তক মেয়ে নেই, ছেলের বউও নেই। গিন্নীর বয়স, পঞ্চাশ, কিন্তু বয়স ভাড়িয়ে হাফ-টিকিট কেটেছেন, দেখলে বোঝা যায় শ' খানেক হবে।'

আমি বললুম, 'তবে কি বুড়োরা খামকা ভয় পেয়েছেন?'

মীর আসলাম বললেন, 'শোনা। খুলে বল। আমানউল্লাহর হুকুম শোনা মাত্র চিৎরিরা যদি লাফ দিয়ে উঠত, তবে বুড়োরাও না হয় তার একটা দাওয়াই বের করত; এই মনে করে তুমি যদি হঠাৎ তলোয়ার নিয়ে কাউকে হামলা করো, সেও কিছু একটা করবে। বীর হলে লড়বে, বকরীর কলিজা হলে ন্যাজ দেখাবে। কিন্তু এ তো বাপু, তা নয়, এ হল মাথার ওপর ঝোলানো নাড়া তলোয়ার। চিৎরিরা হয়ত সব চুপ করে বসে আছে—রাস্তায় তো এখনো চাঁদের হাট বসেনি—কিন্তু এক একজন এক এক শ' খানা তলোয়ার হয়ে চাঁদির ওপর ঝুলে আছে। চোখ দুটি বন্ধ করে একটাবার দেখে নাও, বাপু।'

শিড়ির উঠলুম।

তন্ত্রিশ

একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ মূর্তি। চেনা চেনা মনে হল অথচ যেন অচেনা। তার হাতের ঠের দিকে নজর যেতে দেখি সেটা সম্পূর্ণ চেনা। তার উপরকার কুটি, মাখন, মামলো, বাসি কাবাবও নিত্যিকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত। ধুম দেখলে বহিষ্কৃত উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়; সকালবেলা আমার ঘরে এ রকমের ট্রে হওয়ায় দুলতে পারে না, বাকি অবশেষে রহমানের উপস্থিতি স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু কী বেশভূষা! পাজমা পরেনি, পরেছে পাতলুন। কয়েদীদের পাতলুনের মত সেটা নেমে এসেছে হাঁটার হাঁকি তিনেক নিচে; উকুতে আবার সে পাতলুন এমনি টাইট যে, মনে হয় সুপুঙ্খ শাভারীর ফরাশী নাইট শাটিনের ব্রিসেৎ পরেছেন। শাট, কিন্তু কলার নেই। খোলা গলার উপর একটা টাই বাঁধা। গলা বন্ধ কোট, কিন্তু এত ছোট সাইজের যে, বোতাম লাগানোর প্রশ্নই ওঠে না—তাই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শাট আর টাই। দুকান হোঁষা হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত গিলে ফেলেছে। লোকনে যে রকম হ্যাট-স্ট্যাণ্ডার উপর খাড়া করানো থাকে!

পায়ে নাগারাই, চোখে হাসি, মুখে খুশী।

আবদুর রহমানের সঙ্গে এক বছর ঘর করেছি। চটে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে হস্তীর সঙ্গে নামাদিক দিয়ে তুলনা করেছি, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ সুস্থ, তার মাথায় যে ছিঁচ নেই সে বিষয়ে আমার মনে দুরত্বভাষি ছিল। তাই চোখ বন্ধ করে বললুম, 'বুঝিয়ে বল।'

আমার যে খটকা লাগবে সে বিষয়ে সে সচেতন ছিল বলে বলল, 'দেরেশি পুশদাম—অর্থাৎ 'সুঁচি পরেছি।'

আমি শুধালুম, 'সরকারী চাকরী পেলে লোক দেরেশি পরে; আমার চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?'

mone-prane-bangali.blogspot.com

আবদুর রহমান বলল, 'তওবা, তওবা, আপনি সায়েব আমার সরকার, আমার রুটি দেনোয়াল।'

'তবে?'

'সকালবেলা রুটি কিনতে গেলে পর পুলিশ ধরলো। বলল, 'বাদশার ঢুকুম আজ থেকে কাবুলের রাষ্ট্রায় পাঞ্জামা, কুর্তা, জোশা পরে বেরোনো বারণ—সবাইকে দেরেশি পরতে হবে।' আমার কাছ থেকে এক পাই জরিমানাও আদায় করল। রুটি কিনে ফেরবার পথে আমার দু'ভিনটে পুলিশ ধরল। আপনার পোকাই পেড়ে কোনো গাটিকে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ির সামনে আমাদের পড়শী কর্নেল সায়েবের সঙ্গে দেখা, তিনি ডেকে নিয়ে এই দেরেশি দিলেন, আমাকে তিনি বড্ড স্নেহ করেন কিনা, আমিও তাঁর ফাইফরমার্শ করে দিই।'

গুম হয়ে শুনলাম। শেখটায় বললুম, 'দেখি দোকানে তো এখন ভিড় হওয়ার কথা। দু'দিন বাদে গিয়ে তোমার পছন্দমত একটা দেরেশি করিয়ে নিয়ে।'

আবদুর রহমান হিসেবী লোক; বলল, 'এই তো বেশ।'

আমি বললুম, 'চুপ'। আর দুপুরবেলা এক জোড়া বুট কিনে নিয়ে।'

আবদুর রহমান কলরব করে বলল, 'না ভজুর তার দরকার নেই। পুলিশের ফিরিস্তিতে বুটের নাম নেই।'

প্রথমটায় অবাক হলাম। পরে বুকলুম ঠিকই তো; লক্ষণ না হয় সীতাদেবীর পায়ে দিকে তাকাতো পারেন—রাজ্যভ্রমায় তো সে সম্পর্ক নয়।

বললুম, 'চুপ। দুপুরবেলা কিনবে। আর দেখো, এবার হ্যাটিটা খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান চুপ।

বললুম, 'খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান আস্তে আস্তে ফাঁপ কাঠে বলল, 'ভজুরের সামনে?' তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ল উত্তর আফগানিস্তান তুর্কিস্তানের মানুষ শয়তানের ভয় পেলে পাগড়ি খুলে ফেলে। শুধু-মাথা দেখলে নাকি শয়তান পালায়। তাই আবদুর রহমান ফাঁপের পেছনে। তখন মনে পালল যে, হোস অব কমপেন্ড হ্যাট না পরা থাকলে কথা কইতে দেয় না। বললুম, 'ধাক, তাহলে তোমার মথার হ্যাট।'

রাষ্ট্রায় বেরিয়ে দেখি শহর অন্যদিনের তুলনায় ফাঁকা। দেরেশির অভাবে লোকজন বাড়ি থেকে বেরতে পারেনি। পর্দা তুলে দেওয়াতে রাষ্ট্রাঘাটে মেয়েদের ভিড় বাড়ার কথা ছিল তেমনি দেরেশির রেওয়াজ এক নৃত্য ধরনের পর্দা হয়ে পুরুদায়ের হারোমক করল।

যারা বেরিয়েছে তাদের দেরেশির বর্ণনা দেওয়া আমার সাধারণ বাইরে। যত রকম ছেঁড়া, নোংরা, শরীরের তুলনায় হয় ছোট নয় বড়, কোট-পাতলুন, প্লাস-ফার্স, স্টিচে দিয়ে যত রকমের সম্ভব অসম্ভব খিচুড়ি পোকানো যেতে পারে তাই পরে কাবুল শহর রাষ্ট্রায় বেরিয়েছে—গোটা দশকে পাগলাম-গারদকে হলিউডের গ্রীনক্রমে ছেড়ে দিলেও এর চেয়ে বিপণ্য কাণ্ড সম্ভবপর হত না।

ইয়োয়োরপিয়রা বেরিয়েছে ডামাশা দেখতে। আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আফগানিস্তানকে আমি কখনো পর ভাবিনি।

শহরতলী দিয়ে আমাকে কাজে যেতে হয়। সেখানে দেখি আরো কঠোর দৃশ্য। গ্রামের লাকড়ীওয়াল, সঙ্কীওয়াল, আশুওয়াল যেই শহরের চৌহদ্দির ভিতরে পা দেয় অতিনি পুলিশ তাদের ধরে ধরে এক এক পাই করে জরিমানা করে। বেচারীদের কোনো রমিদ দেওয়া

হয় না; কাজেই দশ পা যেতে না যেতে তাদের কাছ থেকে অন্য পুলিশ এসে আবার নতুন করে জরিমানা আদায় করে। দুনিয়ার যত পুলিশ, সেদিন কাবুলের শহরতলীতে জড়ো হয়েছিল। খবর নিয়ে শুনলাম যারা এ সময়ে অফডিউটি তারাও উর্দি পরে পয়সা রোজকার করতে লেগে গিয়েছে—জরিমানার পয়সা নাকি সরকারী তহবিলে জমা দেওয়ার কোনো বদোবস্ত করা হয়নি।

দিবাধিপ্রহরে যে কাবুলী পুলিশ রাষ্ট্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে রেকর্ড ব্রেক করতে পারে, তার ব্যতীত স্নেহ মনে হল, বলতে বাস্তবায়িত হবে না পারেন।

এ অত্যাচার কান্না ধরে চলেছিল বনতে পারেন।

দুই সপ্তাহ ধরে দেশের খবরের কাগজ চিঠিপত্র পাইনি। খবর নিয়ে শুনলুম জলালাবাদ-কাবুলের রাষ্ট্রা বরফ ঢাকা পড়ায় মেল-বাস আসতে পারেনি; দু-একজন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, রাষ্ট্রায় নাকি লুটতরাজও হচ্ছে। মীর আসলাম সাবধান করে গেলেন যেন যেখানে, সেখানে যা তা প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করি।

অন্য কাজ শেষ হলে মেয়েদের ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস ও সেকেন্ড মিস্ট্রেসকে আমি ইংরিজী পড়াইতুম। আফগান মেয়েরা ঢালাক; জানে যে ধনীরা কাছ থেকে টাকা বের করা শক্ত কিন্তু গরীয়েদের দরজা-হাত। জানের বেলোতেও এই নীতি খাটবে ভেবে এই দুই মহিলা আমাকেই বেছে নিয়েছিল।

হেড মিস্ট্রেসের বয়স পঞ্চাশের উপর; মাতৃভাষা বাদ দিলে জীবনে তিনি এই প্রথম ভাষা শিখছেন। কাজেই কাবুলের পাখর-ফাটা শীতেও তাকে আমি ইংরিজী বানান শেখাতে গিয়ে যেমে উঠতুম। ইংরিজী ভাষা শিখতে বসেছেন, কিন্তু ঐ এক বিষয় ছাড়া দুনিয়ার আর সব জিনিসে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। বিশেষ করে মাস্টার মশায়ের বয়স কত, দেশ কোথায়, দেশের জন্ম মন খারাপ হয় কিনা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই তাঁর বাথো না। তবে খুব সম্ভব তিনি আমার এপেনডিক্সের সাইজ ও এ-জগতে আমার জন্মবার কি প্রয়োজন ছিল, এ দুটো প্রশ্ন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি। আমার উত্তর দেবার কায়দাও ছিল রিডিং। আমার দেশ? আমার দেশ হল ভজনগজল, বানানটা শিখে নিন, বি ই এন জি এ এল। উচ্চারণটাও শিখে নিন; কেউ বলে বেনগোল, অব্যার কেউ বলে বেঙোল। ঠিক তেমনি 'ইরানচ-এ-এক আর—'। তিনি বলতেন, বুঝেছি, বুঝেছি, তা বলুন তো বাঙালী মেয়েরা দেখতে কি রকম? শুনেছি তাদের যুব বড় চুল হয়, 'জুকেবোডল' বলে একরকম তেল এদেশে পাওয়া যায়। আপনি কী তেল মাখেন? আমাদের দু'জনরা এই চাপান উত্তারের মাখখানে পেড়ে ইংরিজী ভাষা বেশী এগতে পারতো না, বিশেষ করে তিনি যখন আমাকে আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেন। মায়ের কথা বলার ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখাবার এলেম আমার পেটে নেই।

সেকেন্ড মিস্ট্রেসের বয়স কম—ত্রিশ হয় না হয়। দুটি বাকার মা, থলথলে দেহ, বাদা নাক, মুখে এক গাদা হাসি, পরনে বারো মাস শ্রিপণ্ডার, লম্বা-ছাতা ব্লাউজ আর নেভি ব্লু গুরু। কবলের বট, বুদ্ধিগুণি আছে আর আমি যখন কবীর প্রশ্নের চাপে নাজেহাল হুম, তখন তিনি মিটিমিটিয়ে হাসতেন আর নিতান্ত বেয়াজা প্রশ্নে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলে মাঝে মাঝে উদ্ধার করে দিতেন।

জোর শীত কিন্তু তখনো বরফ পড়েনি এমন সময় একদিন পড়াতে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেনি

mone-prane-bangali.blogspot.com

কর্নেলের বউ বইয়ের উপর মুখ ঝুঁজ টেবিলে বাকি পাড়েছেন আর কতী তার পিঠে হাত বুলিয়েছেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে কর্নেলের বউ রক্তচাপ করে উঠে বসলেন। দৈর্ঘ্য আর দিল্লের মত মুখের হাসির স্বাভাবিক সন্ধ্যা নেই। চোখ দুটো লাল, নাকের ডগার চামড়া যেন ছড়ে গিয়েছে।

এসব জিনিস লক্ষ্য করতে নেই। আমি বই খুলে পড়তে আরম্ভ করলুম। দুর্মিণিও যার্মানি, হঠাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝখানে কর্নেলের বউ দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলুম। কতী শান্তভাবে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে থাকলেন, 'অধীর হয়ে না, অধীর হয়ে' না। খুদাতা মোহেরবান। বিশ্বাস হারিয়ে না, শান্ত হও।'

আমি চোখের চেয়ে কতীকে শুধালুম, 'আমি তাহলে উঠি?'

তিনি ঘাড় নেড়ে যেতে বাধ্য করলেন। দুর্মিণি যেতে না যেতে আবার কামা, আবার সানন্দনা : আমি যে সে অবস্থায় কি করব ভেবেই পাচ্ছিলুম না। কানার সঙ্গে মিশিয়ে যা বলছিলেন তার থেকে গোড়ার দিকে মাত্র এইটুকু বাকলুম যে, তিনি তাঁর স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করে দিশেছারা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভালো করে কিছু বলতে গেলে কতী বাধা দিয়ে তাঁকে গুসব কথা ভুলতে বাধ্য করছিলেন। বুললুম যে, অমঙ্গল চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক নয় এবং এমন সব কারণও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, সেগুলো প্রকাশ্যে বলা বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু তিনি তখন এমনি আত্মকত্ব হারিয়ে বসেছেন যে, তাঁকে কোনো মুশকিল। কখনও বলেন, 'শিনওয়্যারী বর্বর জানোয়ার' কখনো বলেন, 'সাতদিন ধরে সরকারী কোনো খবর পাওয়া যায়নি।' কখনো বলেন, 'শিনওয়্যারী শহরে পৌঁছলে কোনো অফিসার পরিবারের রক্ষা নেই।'

জলালাবাদ অঞ্চলে নুতরাজ হাফে আপেই গুজব হিসেবে শুনেছিলুম; তার সঙ্গে এসব ছোঁড়াছোঁড়া খবর জুড়ে দিয়ে বুঝতে পারলুম যে, সে অঞ্চলে শিনওয়্যারী বিদ্রোহ করে কাবুলের দিকে রওয়ানা হয়েছে, আমানউল্লাহ তাদের ঠেকাবার জন্য যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন সাতদিন ধরে তাদের সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস্য খবর পাওয়া যায়নি, আর কাবুলের অফিসার-মহলে গুজব, সে বাহিনীর অফিসাররা শিনওয়্যারীর হতে ধরা পড়েছেন।

এত বড় দুঃসংবাদ ইংরাজী পড়ার চেয়ে দিনে দমন করা অসম্ভব। আর আমি এসব সংবাদ জেনে ফেলেছি সেদিক কতী আপোই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু কর্নেলের বউকে তিনি কিছুতেই ঠেকাতেও পারছিলেন না। শেষটায় আমি এক রকম জোর করে গুটার চোকা করলে কর্নেলের বউ হঠাৎ চোখ মুছে বললেন, 'না, মুআল্লিম সাহেব, আপনি যাবেন না, আমি পড়তে মন দিচ্ছি।'

এ রকম পড়া আমাকে যেন জীবনে আর না পড়তে হয়। এবার যখন ভেঙে পড়লেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'বাদশা আমানউল্লাহ মত যারা গৌপ রেখেছে তাদের ধরে ধরে উপরের চোট কেটে ফেলছে। আমানউল্লাহ ঠিক নাকের তলায় একটুখানি গোঁফ রাখেন—সেই টুথ-ব্রাশ মুন্টান ফাশান ফৌজী অফিসারদের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।

এবারে আমি একটু সন্দনা দেবার সুযোগ পেলুম। বললুম, 'লন্ডাইয়ের সময় কত রকম গুজব রটে সে সব কি বিশ্বাস করতে আছে? আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন তাই অমঙ্গল সংবাদ মাত্রই বিশ্বাস করছেন।'

আবার চোখ মুছে উঠে বসলেন। আমি যে পর-পুরুষ সে কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আমার দু'হাত চেপে ধরে বললেন, 'মুআল্লিম সায়েব, সত্যি বলুন, ইমান দিয়ে বলুন, আপনি কয় সপ্তাহ ধরে হিন্দুস্থানের চিঠি পাননি?'

হিন্দুস্থানের ডাক শিনওয়্যারী অঞ্চল হয়ে কাবুল আসে। তিন সপ্তাহ ধরে সে ডাক বন্ধ ছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। তাঁর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললুম, 'আমি এ সপ্তাহেই দেশের চিঠি পেয়েছি।'

তিনি কিছুটা আশ্বস্ত দেখে আমি বললুম, 'আপনি তো আর পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেশেন না যে, হক খবর পাবেন। মেয়েরা স্বভাবতই একটুখানি বেশী ভয় পায়, আর নানারকম গুজব রটায়। তাই তো বাদশাহ আমানউল্লাহ পরদা পছন্দ করেন না।'

কতী আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, 'যে সব খবর শুনলেন সেগুলো আর কড়িবে বললেন না।'

আমি বললুম, 'এসব খবর নয়, গুজব। গুজব রটালে শুধু কি আপনারদের বিপদ? আমি বিদেশী, আমাকে আরো বেশী সাবধানে থাকতে হয়।'

রাস্তায় বেরিয়ে একা হতেই বুললুম, 'মিথ্যা সান্দনা দেবার বিড়ম্বনাতা কি। সেটা কাটাবার জন্য পাঞ্জাবী গ্রামোফোনওয়ালার লোকনে ঢুকলুম। আমার গ্রামোফোন নেই, আমি রেকর্ড কিনিনে তবু দেশের ভাই শুকুর মুহাম্মদ' বলে দোকানদার আমাকে সব আদার-আপ্যায়ন করত। জিজ্ঞেস করলুম, 'মৌলানার বাড়লা রেকর্ডগুলো কলকাতা থেকে এসেছে?'

দোকানদার বলল, 'না, এবং ভাব্যবিক্রে শেখ বুললুম খোঁচাটি কামলে কারণতা বলতেও বাবে না। আমি কিন্তু তাকে না খাটিয়েই খানকরে রেকর্ড শুনে বাড়ি চলে এলুম।'

কিন্তু খোঁচাটি খোঁচাটি কিছুই করতে হল না। স্তরে স্তরে বরষ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম গুজব এসে কাবুলের বাজারে স্থপীকৃত হতে লাগল। সে বাজার অয় বিক্রয় করে অর্থের পরিবর্তে, কিন্তু সন্দেশ দেয় বিনামূল্যে এবং বিনামূল্যের জিনিস যে ভেজাল হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? যখনই চোখে গুজব রটল বেশী।

কিন্তু এ-বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমানউল্লাহ অস্ত্রবলে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হানি, এখন যদি অর্থাৎ কিছু করতে পারেন।

পূর্বেই বলেছি আক্ষপানিস্থানের উপজাতি উপজাতিতে খুদাখুনি লড়াই প্রায় বারোমাস লেগে থাকে। বলির কলে কখনো কখনো অস্ত্রসংবরণ হলেও মিত্রতা হান্যতার অস্বাভাব সেখানে নেই। কাজেই আক্ষপানি কৃষ্ণীতির প্রথম সূত্র : কোনো উপজাতি যদি কখনো রাজার বিরুদ্ধে যোষণা করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই উপজাতির শত্রুপক্ষকে অর্থ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। যদি অর্থ বাক না হয়, তবে রাইফেল দেবে। রাইফেল পেলে আক্ষপানি পরমোৎসাহে শত্রুকে আক্রমণ করবে—কাষ্ঠ-মসিকেরা বলেন সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বন্ধুগুলোর তাগ পরীক্ষা করা।

কিন্তু এখানে দেখা গেল, বিদ্রোহের নীল-ছাপটা তৈরী করেছেন মোল্লারা এবং তাঁরা একখাটা সব উপজাতিতে বেশ কয়েক বৃষ্টিয়ে দিয়েছেন যে, যদি কোনো উপজাতি 'কাফির' আমানউল্লাহ বিরুদ্ধে যোষণা করে, তবে তারা তখন দীন ইসলামের রক্ষাকর্তা। রাইফেল কিম্বা টাকার লোভেও অথবা ঐতিহ্যগত সাদান শত্রুতার স্মরণে তখন যারা আমানউল্লাহর পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইতে তারাও তখন আমানউল্লাহর মতই কাফির। শুধু যে তারাও তখন সোজাভাবে তা নয়, তাদের পূর্বতন অধস্তন চতুর্থ পুরুষ যেন স্বর্গদার দর্শন করবার আশা মনে পোষা না করে।

এ বড় ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত। ইহলোকে বকলগু থাকবে রাইফেল, পরলোকে ছুরী, এই পুরুষ-প্রকৃতির উপর আক্ষপানি-দর্শন সংস্থাপিত। কোনোটাতেই চোটে লাগলে চলবে না। কিন্তু

প্রশ্ন আমানউল্লা কি সেইটি কান্নির?

এবারে মোল্লারা যে মোকাম মুক্তি দেখাল তার বিরুদ্ধে কোনো শিনওয়ারী কোনো খুসিয়ানী একটি কথাও বলতে পারল না। মোল্লারা বলল, 'নিজের চোখে দেখিসনি আমানউল্লা গণ্ডা পাঁচকে কাবুলী মেয়ে মুস্তফা কামালকে ভেট পাঠিয়েছে; তারা যে একত্রে জলালাবাদে কান্টিয়ে গেল, তখন দেখিসনি, তারা বেপদা বেহায়ার মতন বাজারের মাঝখানে গটগট করে মোটার থেকে উঠল নামল।'

কথা সত্যি যে, বিস্তার শিনওয়ারী খুসিয়ানী সেদিনকার হাফিরে জলালাবাদ এসেছিল ও সেখানে বেপদা কাবুলী মেয়েদের দেখেছিল। আরো সত্যি যে, গাভী মুস্তফা কামাল পাশা আফগান মোল্লাদের কাছ থেকে কখনো গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাননি।

তবু নাকি এক 'মুখ' বলেছিল যে, মেয়েরা তুর্কী যাচ্ছে ডাক্তার শিখতে। শুনে নাকি শিনওয়ারীরা অটহাস্য করেছিল—'মেয়ে ডাক্তার! কে কবে শুনেছে মেয়েছেলে ডাক্তার হয়! তার চেয়ে বললেই হয়, মেয়েগুলো তুর্কীতে যাচ্ছে গৌণ গজাবার জন্য।'

কে তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে যে, শিনওয়ারী মেয়েরাই বিনা পর্দায় ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, কে বোঝাবে যে, বুড়ীসাদীমা যখন হলুদ-পট্টা বাঁধতে কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চোখেও পাকাপোক্ত তখন কাবুলী মেয়েরাই বা ডাক্তার হতে পারবে না কেন? কিন্তু এ সব বাজে তর্ক, নিষ্পল আলোচনা। আসল একটা কারণের উপলক্ষে কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু সেটা সত্য, অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। আমানউল্লা নাকি রাজকোষের অর্থ বাড়াবার জন্য প্রতি আফগানের উপর পাঁচ মুদ্রা ট্যাক্স বসিয়েছিলেন।

আমানউল্লা এ সব কথাই আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আর পাঁচজনের মত তিনিও সেই ফার্সি ব্যয়েণ্টী জানতেন, সোনার রস্তুিকু থাকলে মানুষ মরা কুকুরকেও আদর করে। আমানউল্লা সব উজিরদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, উপজাতিকে মুছ দেওয়ার ব্যাপারে কে কি জানেন?

আমার বন্ধু আধা-পাগলা দোস্ত মুহাম্মদ ভুল বলেননি। দেখা গেল অনেকেই অনেক কিছু জানেন, শুধু জানেন না, কোন উপজাতির সঙ্গে কোন উপজাতির শত্রুতা, কোন উপজাতির বড় বড় সর্দার উপপিত্ত কাব্য, কাদের মধ্যস্থতায় তাদের কাছে গোপনে ঘুষ পাঠানো যায়, কোন মোল্লার কোন খুড়ো উপস্থিত কাবুলে যে, তার উপর চোটপাট করলে দেশের জাইপা শায়েস্তা হবেন—অর্থাৎ জনাবার মত কিছুই জানেন না।

তখন অনাদৃত উপপিত্ত প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী বৃদ্ধদের ডাকা হল—তারা বললেন যে, গত দশ বৎসর ধরে তারা কোনো প্রকার কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন না বলে আফগান উপজাতিদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ছিল হয়ে গিয়েছে। রাজানুকম্পা বিগলিত হয়ে যে অর্থবাহী তাদের পয়ঃপ্রণালী দিয়ে উপজাতিদের কাছে পৌঁছে, সে-সব পয়ঃপ্রণালী দশ বৎসরের অনাদরে জঞ্জালবদ্ধ। এখন বন্যা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

অনেক ভেবে-চিন্তে আমানউল্লা তাঁর ভগিনীপতি আলী আহমদ খানকে জলালাবাদ পাঠালেন। শিনওয়ারীদের টাকার বামে ভাসিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, কেউ বলে দশ লাখ, কেউ বলে বিশ লাখ।

শাস্ত্রের তর্কে, দর্শনের লড়াইয়ে দিশেহারা হলে ওমর খৈয়াম মৃৎপাত ভরে সুরা পান করতেন। সেই মাদির ভাড়ই নাকি তখন তাকে গভীরতম সত্যের সন্ধান দিষ্ট।

আমার মৃৎপাত্র আবদুল রহমান। তারক সব খুলে বারো তার মতামত জানতে চাইলুম। গেড়ার দিকে সে আমাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে বারণ করত, কিন্তু শিনওয়ারী

বিরোধের খবর শহরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজার গম্প গম্পের রাজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবদুল রহমান বরফের জড়তী, আর সেই বরফই তার মাপকাঠি। সে বলল, 'নানা লোকে নানা কথা কয়, তার হিসেব-নিকেশ আমি করব কি করে? কিন্তু একটা কথা ভুলবেন না, ছজুর, এই বরফ ভেঙে শিনওয়ারীরা কিছুতেই কাবুল পৌঁছতে পারবে না। ওদের শীতের জামা নেই। বরফ গলুক, তারপর দেখা যাবে।' আমি ভিজ্জেস করলুম, 'তাই নুবি প্রবাদ, কাবুল স্বর্ণানী হোক আপসিট নেই, কিন্তু বরফহীন ফেন না হয়!'

ভেবে দেখলুম আবদুল রহমান কিছু অন্যান্য বলেনি। ইতিহাসে দেখছি, বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের বিরোধীমূলকও তেঁজা কথা গায়ে টেনে নিয়ে 'নিদ্রা যায় মনের হরিষে'।

চৌত্রিশ

এমন সময় যা ঘটল তার জন্য কেউ তৈরী ছিলেন না; অবশী অর্বাচীন কারো কোনো আলোচনায় আমি এ ব্যাপারে কোনো আভাস ইঙ্গিত পাইনি।

কেনা তখন চারটে বহর দোস্ত মুহাম্মদের বাড়ি থেকে পেরিয়ে দেখি রাস্তায় তুমুল কাণ্ড। দোকানীরা দুকড় কর বেরজাজানরা শব্দ করছে, লোকজন দ্বিপ্পদিক জলানশূ্য হয়ে ছুটোছুটি করছে, চতুর্দিকে চিৎকার, 'ও ভাই কোথায় গেলি' ও মায়া শিগগির এসো।' লোকজনের ভিত্তরে উপর দিয়ে টাঙ্গাওয়ালার গাড়ি গাড়ি, বোমাই গাড়ি এমনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চালিয়েছে যে, আমার চোখের সামনে একখানা গাড়ি ছড়মুড়িয়ে কাবুল নদীর বরফের উপর গিয়ে পড়ল, কেউ ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

সব কিছু ছাপিয়ে মারকামে কানে চিৎকার পৌঁছয়, 'বাচ্চায়ে সকাও আসছে, বাচ্চায়ে সকাও এসে পড়ল।' এমন সময় গুডুম করে রাইফেলের শব্দ হল। লক্ষ্য করলুম শব্দটা শবরের উত্তর দিক থেকে এল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপ্পদিকজলানশূ্য জনতা যেন বন্ধ উন্মাদ হয়ে পেল। যাদের হতে কাঁধে বোঁচনা-বুঁচকি ছিল তারা সে গুলো ফেলে দিয়ে ছুটলো, একদল রাস্তার পাশের ন্যায়নজুলিতে নেমে গেছে, অন্য দল কাবুল নদীতে জমে-খাওয়া জলের উপর ছুটতে গিয়ে বারে বারে পিছলে পড়ছে। রাস্তার পাশে যে অন্ধ ভিখারী বসতো সে দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে, ভিড়ের সৈলয় এদিক ওদিক ঢাল খাচ্ছে আর দুহাত শূন্য তুলে সেখানে যেন পথ খুঁজছে।

আমি কোনো গতিকে রাস্তা থেকে নেমে, নয়ানজুলি পেরিয়ে এক দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। স্থির করলুম, বিরোধ বিপ্লবের সময় পাগলা-মোড়ার চাট খেয়ে অথবা ভিড়ের চাপে ময় বন্ধ হয়ে মরব না; মরতে হয় মরব আমার হিসার গুলী খেয়ে।

এক মিনিট যেতে না যেতে আরেক ব্যক্তি এসে জুটলেন। ইনি ইটালিয়ান 'কলোনেল্লো' অর্থাৎ কর্নেল। বয়স যাটের কাছাকাছি, লম্বা করোপোটের দাড়ি।

এই প্রথম লোক পেলুম যাকে ধীরেসুস্থে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়। বললুম, 'আমি তো শুনেছিলুম ডাকাত-সর্দার বাচ্চায়ে সকাও আসবে আমানউল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়াবার জন্য। কিন্তু এ কী কাণ্ড?'

কলোনেল্লো বললেন, 'মলে হচ্ছে ভুল খবর। এ তো আসছে শহর দখল করার জন্য।' তাই যদি হয় তবে আমানউল্লার সেনারা এখনো শবরের উত্তর দিকে যাচ্ছে না কেন, এ রকম অতর্কিত বাচ্চায়ে সকাও এসে পৌঁছাই বা কি করে, তার দলে কি পরিমাণ লোকজন, শুধু নানা কালাম-টামান তাদের সঙ্গে আছে—এ সব অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর

কলোনোয়ে দিতে পারলেন না। মাঝে মাঝে শুধু বললেন, 'কী অশুভ অভিজ্ঞতা!' আমি বললুম, 'সাধারণ কাবুলী যে ভয় পেয়েছে সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়ানরা এদের সঙ্গে তুলি কেন? এরা যাচ্ছে কোথায়?'

কলোনোয়ে বললেন, 'আপন আপন রাজদুত্বাসে আশ্রয়ের সন্ধান।'

ততক্ষণ বন্দুকের আওয়াজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে—ভিড়ও দেখলুম চেউয়ে চেউয়ে যাচ্ছে, একটানা সোতের মত নয়। দুই চেউয়ের মাঝখানে আমি কলোনোয়েকে বললুম, 'চলুন বাড়ি যাই।' তিনি বললেন যে, শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি বাড়ি যাবেন না। মিলিটারি খেয়াল, তরু কর বৃথা।

বাড়ির দোরের গোড়ায় দেখি আবদুর রহমান। আমাকে দেখে তার দুশ্চিন্তা কেটে গেল। বাড়ি ঢুকতেই সে সবার দরজা বন্ধ করে তার গায়ে এক গদা ভারী ভারী পাথর চাপাল। বিচক্ষণ লোক, হিমমতের দুর্গা রক্ষা করার যে বদলেবতের প্রয়োজন সেটাকে সে করে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বেনগুয়া সাহেব কোথায়?' বললো, 'তিনি মাত্র একটি স্টুকেশ নিয়ে টাঙ্গায় করে ফ্রেঞ্চ লিগেগনে চলে গিয়েছেন।'

ততক্ষণ বন্দুকের শব্দের সঙ্গে মেশিনগানের একটানা ক্যাটক্যাট, যোগ দিয়েছে। আবদুর রহমান চা নিয়ে এসেছিল। চা নপেতে শুনে বলল, 'বাদশার সৈন্যরা গুলী আরম্ভ করেছে। বাচ্চা মেশিনগান পাবে কোথায়?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'বদশার সৈন্যরা কি এতক্ষণ বাচ্চার মুখোমুখি হল? তবে কি সে বিনা বাধ্য কাবুলে পৌছল?'

আবদুর রহমান বলল, 'দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেককেই তো জিজ্ঞেস করলুম, কেউ কিছু বলতে পারল না। বোধ হচ্ছে বাচ্চা বিনা বাধ্যই এসেছে। ওর দেশ হল কাবুলের উত্তর দিকে, আমার দেশ পানশির—তারও উত্তরে। ওদিকে কোনো বাদশাহী সৈন্যের আনাগোনা হলো আমি দেশের লোকের কাছে থেকে বাচ্চার খবর পেরুলাম। বাদশাহী সৈন্যরা সবাই তো এখন পূর্ব দিকে শিনওয়ারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গিয়েছে—আলী আহমদ খানের উত্তরে!'

গোলাগুলি চলল। সন্ধ্যা হল। আবদুর রহমান আমাকে জাভাত্তি খাইয়েদায়ই আঙনের তদারকিতে বসল। তার চোখমুখ থেকে অদাঙ্গ করলুম, সে কাবুলীদের মত ভয় পায়নি। কথানার্জ থেকে বুঝতে পারলুম, বাচ্চা যদি জেতে তবে লুটতরাজ নিশ্চয় হবে এবং তাই নিয়ে আমার মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সে ঈষৎ দুশ্চিন্তাশ্রবণ। কিন্তু এ সব ছাপিয়ে উঠে তার কৌতুহল আর উত্তেজনা—শহরে সাকাস ঢুকলে ছেলোপিলেদের যে রকম হয়।

কিন্তু এই বাচ্চায়ে সকাওটী কে? আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করতে হল না, সে নিজের থেকেই অনেক কিছু বলল এবং তার থেকে বুঝলুম যে, আবদুর রহমান বরফের জুড়ী, ফুস্ট-বাইটের ওখা, রন্ধনে ভীমসেন, ইন্ধনে নলরাজ, সব কিছুই হতে পারেন, কিন্তু বসওয়াল হতে এখনো তার ঢের রোঁ। বাচ্চায়ে সকাও সম্বন্ধে সে যা বলল তার উপরে উত্তম রযিব চড খাড়া করা যায়, কিন্তু সে বস্ত্র জলজাত্য মানুষের জীবনী বলি চালায়ে অসহব।

চোদ্দ আনা বাদ দেওয়ার পরও ঘেঁটু রইল তার থেকে বাচ্চার জীবনের এইটুকু পরিচয় পাওয়া গেল যে, সে প্রায় শাবিকের ডাকাতের সর্দার, বাদশ্বান কাবুলের ইয়োরোপে উত্তরদিকের কহিস্তানে, ধনীকে লুটে গরীবকে পরাসা বিলুয়, আমানউল্লা যখন ইয়োরোপে ছিলেন তার পরাজিত তখন এমনি বেড়ে গিয়েছিল যে, কাবুল কহিস্তানের পগা-বাহিনীর কাছ থেকে সে রীতিমত চ্যাপ্র আদায় করত। আমানউল্লা ফিরে এসে কহিস্তানের হাটে-বজারে

নোটিশ লগান, 'ডাকাত বাচ্চায়ে সকাওয়ের মাথা চাই, পুরস্কার পাঁচশ টাকা'; বাচ্চা সেগুলো সরিয়ে পাশ্চা নোটিশ লগায়, 'কাবির আমানউল্লায় মাথা চাই, পুরস্কার এক হাজার টাকা।'

আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করল, 'কর্নেলের ছেলে আমাকে শুধালো যে, আমি যদি আমানউল্লার মুণ্ডটা কাটি, আর আমার ভাই যদি বাচ্চায়ে সকাওয়ের মুণ্ডটা কাটে তবে আমার দুজনে মিলে কত টাকা পাব। আমি বললুম, 'দেড় হাজার টাকা।' সে হেসে লুটেপুটি; বলল, 'এক পরসোও নাকি পাব না।' বুঝিয়ে বলুন তো, ডজ্বর, কেন পাব না?'

আমি সাধনা দিয়ে বললুম, 'কেউ জ্যাস্ট নেই বলে তোমাদের টাকটা মারা যাবে বটে, কিন্তু কর্নেলের ছেলেকে বলা যে, তখন আফগানিস্তানের তথৎ তোমাদের পরিবারে যাবে।' আরো শুনলুম, বাচ্চায়ে সকাও নাকি দিন বেশেক আগে হঠাৎ জবলুম-দিরাজের সরকারী বড় কর্তার কাছে উপস্থিত হয়ে কোরান টুয়ে কসম খোয়েছিল যে, সে আমানউল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়াই এবং সেই কসমের জেরে শ্বানেক রাইফেল তাঁর কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়ে ফের উঠাও হয়ে গিয়েছিল।

তবে কি সেই বন্দুকগুলো নিয়েই বাচ্চার দল আমানউল্লাকে আক্রমণ করেছে? আশ্চর্য হবার কি আছে? আমানউল্লা যখন উপজাতিদের কাছ থেকে ভোলা ট্যানের পরসায় ফৌজ পুষে তাহের কাঁবুতে রাখেন, তখন বাচ্চাই বা আমানউল্লার কাছ থেকে বন্দুক বাগিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবে না কেন?

রাত তখন বারোটা। আবদুর রহমান বলল, 'আজ আমি আপনার বসবার ঘরে শোব।' আমি বললুম, 'স্মি তো ঠাণ্ডা ঘর না হলে ঘুমাতে পারো না। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাকে এত দুর্ভাবনা করতে হবে না।'

আবদুর রহমান বলল, 'কিন্তু আমি অন্য ঘরে শুলে আমার বিপদ-আপদের খবর আপনি পাবেন কি করে? আমার জান বরাবর আপনার হাতে সঁপে দিয়ে যাননি?'

কথাটা সত্যি। আবদুর রহমান আমার চাকরীতে ঢুকছে খবর পেয়ে তার বড় বাপ-ধা থেকে এসে আমাকে তার জাবের মালিক, শব্দভরতিরের তদারকদার এবং চটে গেলে খুন করবার হুক দিয়ে গিয়েছিল। আমি বুড়াকে খুশী করবার জন্য 'সিংহ ও মূমিকের' গল্প বলেছিলাম।

কিন্তু আবদুর রহমানের ফন্দিটা দেখে অবাক হলুম। সাক্ষাৎ নিউটন। এদিকে বাব্রু দুটো ফুটো করে দুটো বেরালের জন্য, অন্য দিকে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পারে—একদিকে কর্নেলের ছেলের ধাখায় বোকা বনে যায়, অন্য দিকে তরুকে বাঙালীকেও কাবু করে আনে।

আবদুর রহমান শুয়ে শুয়ে 'কতলে-আম' অর্থাৎ পাইকারী খুন-খারাবী লুটতরাজের যে বর্ণনা দিল তার থেকে বুঝলুম বাচ্চায়ে সকাও যদি শহর দখল করতে পারে তবে তার কোনোটাই বাদ যাবে না। চম্পক, নাদির রাজা-বাদশা হয়ে যখন এ সব করতে পেরেছেন তখন বাচ্চা ডাকাত হয়ে এ সব করবে না সে আশা দিমিরার রূপকথাতেও করা যায় না।

ইরান, আফগানিস্তান, চীন প্রভৃতি সভ্য দেশে সাজা দেওয়ার নানারকম বিদগ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কামানের মুখে বেধে উড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুতে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুড়ে ছুড়ে কতবিধকত করে মারা, পেট কেটে চোখের সামনে নাড়িভুড়ি বের করে মারা, জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া তুলে মারা ইত্যাদি বহুতর কদায়াদ অনেক চান্দ্রয় বর্ণনা আমি শুনেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে লম্বা পেরেক দিয়ে ঢুকানো

দেয়ালের সঙ্গে গঁথে দেওয়া। আবদুর রহমানের কাছ থেকে শোনা, সে অবস্থায়ও নাকি মানুষের পুণ্য আর মাথা বার বার খুলে পড়ে। তার সুলনায় রাইফেল-শেশনগানের শব্দ, আও গ্রেনেড নাদিরের কাহিনীশ্রবণ শ্রুতি পরিচয়। কাজেই সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়টা বীর অথবা কাপুরুষ কোনো কিছুরই দফন নয়।

সকালবেলা দেউড়ি খুলে দেখি শহরে মেলায় ভিড়। কাবুল শহরের আশপাশের গাঁ থেকে নানা রকম লোক এসে জড়ো হয়েছে, সুযোগসুবিধে পেলে বুটে যোগ দেবে বলে। অনেকের কাছেই কবু-ক, মীতের ভারী ভারী জামার ভিতর যে ছোরা পিস্তলও আছে সেটাও অনায়াসে বোঝা গেল। আবদুর রহমানের বাসা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটার তদারকতস্ত করবার জন্য।

আর্ক কাবুল শহরের ভিতরকার বড় দুর্গ-ভূমাযুনের জন্ম এই আর্কের ভিতরেই হয়েছিল। আর্ক থেকে বড় রাস্তা বেরিয়ে এসে কাবুল নদীর পারে ঠেকেছে তাকেই কাবুলের চোরগাঁ বলা যেতে পারে। সেখানে দেখি একটা বড় রকমের ভিড় জমেছে। কাছে গিয়ে বুঝলুম কেনো এক বড় রাজকর্মচারী-অফিসারও হতে পারেন-কাবুল শহরের লোকজনকে বাছার বিরুদ্ধে কড়াকড়ার জন্য সলা-মস্তগা দিচ্ছেন।

‘ওজাম দিতো আইয়া’—‘ধরো হাতিয়ার, ফ্রান্সের লোক, বাঁঘো দল, বাঁঘো দল’ ধরনের গুজবিনী ফারসিনী বক্তৃতা নথ—অনেকেরের শুকনো, কফাশে ঠোট কাঁপছে আর বিড় বিড় করে যা বলছেন দশ হাত দূর থেকে তা শোনা যাচ্ছে না।

টিমের কাপ্তান যে রকম প্র্যাঙ্কিসের পূর্বে আঁটা আঁটা হকিস্টিক বিলোয় তেমনি গান্দা গান্দা দামী অকবাক রাইফেল বিলোনে ওঠছে। বলা নেই কওয়া নেই, যার যা ইচ্ছে এক একখানা রাইফেল কাছে ঘুলিয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। শুধু লক্ষ্য করলুম উত্তর দিকে কেউই গেল না—অর্থাৎ লড়াই হচ্ছে সেই দিকেই।

রাইফেল বিলোনে শেষ হতেই ভরলোক তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। বিপজ্জনক অশ্রুকার্তব্যাক্ষ অর্ধসমাধান করে মানুষ যে রকম তড়িৎঘটি একস্থান থেকে সরে পড়ে। তখন চোখে পড়ল তার পরনে পাছামা-কুত-জুমা-পাগড়ি—দেৱশি নয়। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখি কারো পরনেই দেৱশি নয়, আর সকলের মাথায়ই পাগড়ি। আমার পরনে সুট, মাথায় হ্যাট—অশ্রুতি বোধ হতে লাগল।

এমন সময় দেখি ভিড় ঠেলে হন করে এগিয়ে আসছেন মীর আসলম। কোনো কথা না করে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে টেনে গিয়ে চললেন—আমার কোনো প্রশ্নের উত্তরে মুখ না খুলে, কোনো কথায় কান না দিয়ে। বাড়ি পৌঁছেতেই আমাদের দু'জনকে দেখে আবদুর রহমান কি একটা বলে গিলে লস্কর বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোল।

মীর আসলম আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন। এ কি আশাশা দেখার সময়, না, ইয়ার্কি করে ঘুরে বেড়াবার মোকা। তাও আমার দেৱশি পরে।

আমি শুধু বললুম, ‘কি করে জানব বলুন যে, দেৱশি পরার আইন মকুব হয়ে গিয়েছে। মীর আসলম বললেন, ‘মকুব বাড়িলের প্রশ্ন এখন কে শুধায় বাপু। যে কোনো মুহূর্তে বাছায়ে সকাও শহরে ঢুকতে পারে। কাবুলীরা তাই দেৱশি ফেলে ফের ‘মুসলমান’ হয়েছে। দেখলে না ইস্তক সর্দার—খান জোখা পরে রাইফেল বিলোনে?’

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘সে কি কথা, রাজপরিবার পর্যন্ত ভয় পেয়ে দেৱশি ছেড়েছেন?’

মীর আসলম বললেন, ‘উপায় কি বলা? বাদশাহী কোঁজ থেকে সৈন্যরা সব পালিয়েছে।

এখন আমানউল্লাহ একমাত্র ভরসা যদি কাবুল শহরের লোক রাইফেল কবু-ক নিয়ে বাছাকে ঠেকাতে পারে। তাদের খুশী করার জন্য দেৱশি বর্জন করা হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম। ‘কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন রাজধানীর সৈন্যরা কখনো বিদ্রোহ করেন না।’

‘বিশ্রোহ তারা করেনি। তারা সব পালিয়েছে। যাদের বাড়ি বড় দূরে, বরফ ভেঙে এখন যে সব জায়গায় পৌঁছানো যায় না, তারা এখনো শহরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। যারা নিতান্ত গা-ঢাকাও দিতে পারেনি, তারাও লড়তে গেছে, অস্ত্রত আমানউল্লাহ বিশেষ তাই। আসলে তারা দেহ-আফগানানোর আফগানের গায়ে বসে চরমসূর্য তাগ করে গুলী ছুঁড়ছে। বাছাকে এখনো ঠেকিয়ে রেখেছে আমানউল্লাহ দেহরক্ষী খাস সৈন্যদল।’

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, ‘কিন্তু মৌলানার বাসা তো দেহ-আফগানানোর পাছাভের গায়ে। চলুন, তার খবর নিয়ে আসি।’

মীর আসলম বললেন, ‘শান্ত হও। আমি সকালে সে দিকেই গিয়েছিলাম, কিন্তু মৌলানার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। সেখানে লড়াই হচ্ছে। আমি মোস্তা মানুষ—কাবুল শহর আমাকে চেনে। আমি যখন সেখানে পৌঁছতে পারিনি, তুমি যাবে কি করে?’

এ সংবাদ শুনে আমার মন থেকে অন্য সব প্রশ্ন মুছে গেল। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কিছু করার উপায় আছে কিনা। মীর আসলম আমাকে বাড়ি থেকে বেরতে পই পই করে বারণ করে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে আবদুর রহমান একখানা নতুন রাইফেল নিয়ে উপস্থিত। চোখেমুখে খুশী উপছে পড়ছে। বলল, ‘ভক্তুর, চট করে একখানা কাপাজে লিখে দিন আপনার রাইফেল নিয়ে। আমি আর একটা নিয়ে আসি। আমি তখন মৌলানার কথা ভাবছি—আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবদুর রহমান চলে গেল।

লুটপাট আরম্ভ হয়নি সত্য, কিন্তু হতে কতক্ষণ? সকালবেলা যখন বেরিয়েছিলাম তখন কোথাও কোনো পুলিশ দেখতে পাইনি। রাজার দেহরক্ষীরা পর্যন্ত বাছাকে ঠেকাতে গিয়েছে, এখন শহর রক্ষা করবে কে? আর এ-পরিস্থিতি আধাধান ইতিহাসে কিছু অভিনব বস্তু নয়। বাবুর বাদশাহ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কাবুল শহরে কোনো প্রকার অশান্তির উদ্ভব হলেই আশপাশের চোরে-ডাকাত শহরের আন্যোচ্চাতকো শিকারের সন্ধানে মোরাঘুরি করত। মীর আসলম আমার আরেকটা সুখবর, দিলেন যে, বাবুরের আমলে কাবুল আজকের চেয়ে অনেক বেশী সত্য ছিল। অসম্ভব নয়, কারণ বাবুর লিখেছেন, অশান্তির পূর্বাভাস দেখতে পেলেই তিনি রাস্তায় রক্তায় সেপাই মোতায়েন করতেন; আমানউল্লাহ যে পারেননি সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অশ্রুয় একটা সান্দ্রনার কথা হচ্ছে এই যে, কাবুলের বসতবাড়ি লুট করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক বাড়ি দুর্গের মত করে বানানো—চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, সেও আবার খানিকটা উঁচু ভিতরের দিকে বেকে গিয়েছে—তত সুবিধে এই যে, মই লাগিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়ার উপায় নেই। দেয়ালের গায়ে আবার এক সারি ছেদা; বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে দেয়ালের অভ্যন্তর থেকে সে ছেদা দিয়ে রাইফেল লাগিয়ে নির্বিঘ্নে বাইরে গুলী চালানো যায়। বাড়িতে ঢোকায় জন্য মাত্র লোখানা বড় দরজা—সে দরজা আঁবার শক্ত খুঁচো কাঠে তৈরী, তার গায়ে আবার ফালি ফালি লোখার পাত পেরেক দিয়ে সেটে দেওয়া হয়েছে।

মোফম বন্দোবস্ত। দুখানা রাইফেল দিয়ে পঞ্চাশজন ডাকাতকে অন্যায়সে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কারণ যারা রাস্তা থেকে হামলা করবে তাদের কোনো আচ্ছাদন আৱরণ নেই যার তলা থেকে রাইফেলের গুলী বাঁচিয়ে দেয়াল ডাক্তার বা দরজা পোড়ানোর চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ডিসেম্বরের শীতে সমস্ত রাত ছাদের উপর টহল দিয়ে নাজর রাখবে কে? বড় পরিবার হলে কথা নেই। পাল্লা দিয়ে পাছড়া দেওয়া যায়, কিন্তু এ স্থলে সেই প্রাচীন সমস্যা 'কাকা আর আমি একা, চোর আর লাঠি দু'জন'। বরফ তার চেয়েও খারাপ। চোর না হয়ে এরা হবে ডাকাত, হাতে লাঠি নয় নকল—আর সংখ্যায় এদের নারায়ণী সেনা হতেও অর্পণ নেই।

এ অবস্থায় মৌলানা আর তাঁর তরুণী ভাথাকে ভেঁকে আনি কেন বৃদ্ধিতে? কিন্তু ওদিকে তাঁরা হয়তো রয়েছেন 'আগর দি ফায়ার দুই ফৌজের মাঝখানে। স্থির করলুম, বেশী ভেবে কোনো লাভ নেই। মৌলানার পাড়ায় ঢুকবার সুযোগ পেলেই তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলে নির্বাচনের ভারটা তাঁরই হাতে ছেড়ে দেব।

আবদুর রহমান খবর দিল, বাচ্চার ডাকুয়া আরোজ্জাম দখল করে ফেলেছে বলে আমানউল্লাহ হাওয়াই জাহাজ উঠতে পারছে না।

আমি শুধলুম, 'কিন্তু আমানউল্লাহ বিশেষ থেকে যে সব ট্যাক্স সাজোয়া গাড়ি এনেছিলেন সে সব কি হল?'

নিরুত্তর।

'কাবুল বাসিন্দাদের যে রাইফেল দেওয়া হল তারা লড়তে যাবনি?'

আবদুর রহমান যা বললো তার ভলত তজ্জমা বাস্তব প্রবাদে আছে। শুধু এ স্থলে উল্লেখ্যের দুখানা পা আছে বলে দু'রাজার মাঝখানে সে যেতে রাজী হচ্ছে না। আমি বললুম, 'তাজ্জবের কথা বলব না আবদুর রহমান, বাচ্চায়ে সকাও ডাকাত, সে আবার রাজা হল কি করে?' আবদুর রহমান যা বললো তার অর্থ, বাচ্চা শব্দরবার দিন মোল্লাদের হাত থেকে তাজ পেয়েছে, খুতবার (আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে) তার নাম বাদশা হিসেবে পড়া হয়েছে, আমানউল্লাহ কামির সে ফতোয়া প্রচারিত হয়েছে ও বাচ্চায়ে সকাও বাদশাহ হবীবউল্লাহ খান নাম ধারণ করে কাবুল শহর থেকে 'কামির' আমানউল্লাহকে বিতাড়িত করবার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেছে।

অদৃষ্টের পরিহাস। আমানউল্লাহর পিতার নাম হবীবউল্লাহ। আততায়ীর হাতে নিহত হবীবউল্লাহর অতুণ প্রেতাখ্যা কি স্বীয় প্রতিহিংসার রক্ত অনুসন্ধান করছে।

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান তার শেষ বুলটিন দিয়ে গেল; আমানউল্লাহ হাওয়াই জাহাজ কোনো গতিতে উঠতে পারায় বোমা ফেলেছে। বাচ্চার দল পালিয়ে গিয়ে মাইলখানেক দূরে থানা পেড়েছে।

পরিত্রাশ

জনমানবহীন রাস্তা। অর্ধচ শান্তির সময় এ-রাস্তা গমগম করে। আমার কা ছমছম করতে লাগল।

দুসিকের দোকান-পাট বন্ধ। বসন্তবাড়ির দেউড়ী বন্ধ। বাসিন্দারা সব পালিয়েছে না ঘুপাটি মেরে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, বোঝবার উপায় নেই। যে-কুকুর-বেড়াল বাদ দিয়ে কাবুলের রাস্তায় কম্পনা করা যায় না, তারা সব গেল কোথায়? যেখানে গলি এসে বড় রাস্তায় মিশেছে, সেখানে ডাইনে-বায়ে উকি মেরে দেখি একই নির্জনতা। এসব গলি শীতের দিনেও কাছাকাছার চিংকারে গরম থাকে, মানুষের কানের ত্রো কথাই নেই, বরফের গাদা পর্যন্ত ফুটো হয়ে যায়। এখন সব নিবন্ধম, নীরব। গলিগুলোর চেহারা এমনিতেই বোঝার থাকে, এখন

জনমানবের আবরণ উঠে যাওয়াতে যেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সবাংগে ঘা-পাঁচড়া দেখাতে আরম্ভ করেছে।

শহরের উত্তরপ্রান্ত। পর্বতের সানুদেশ। মৌলানার বাড়ি এখনো বেশ দূরে। বাচ্চার একদল ডাকাত এদিকে আক্রমণ করছিল। তারা সব পালিয়েছে, না আড়ালে বসে শিকারের অপেক্ষা করছে, কে জানে?

হঠাৎ দেখি দূরে এক রাইফেলধারী। আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ডাইনে-বায়ে গলি নেই যে, চুপে পড়ব। দাঁড়িয়ে অথবা পিছনে ফিরে লাভ নেই—আমি তখন মামুলী পাখী—মারা বন্দুকের পাল্লার ভিতরে। এগিয়ে চললুম। মনে হল রাইফেলধারীও আমাকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু আমাকে, হাতিয়ারহীন দেখে কাঁধে কোলানো রাইফেল হাতে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। দু'জন মুখোমুখি হলুম, সে একবার আমার মুখের দিকে তাকালো ও না। চেহারা দেখে বুঝলুম, সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তবে কি আমারই মত কারো সন্ধান গিয়েছিল, নিরাশ হয়ে ফিরছে? কে জানে, কি?

মৌলানার বাড়ি গলির ভিতরে। সেখানে পৌছনো পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রাণীর সঙ্গের সন্ধ্যা হল না। কিন্তু এবারের নতুন বিপদ; দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে কড়া পড়ে গেল—কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি মৌলানার কেউ নেই? অথবা সে শীতে দরজা-জাল্লা সব কিছু বন্ধ বলে কড়া নাড়া, আমার চিংকার, কিছুই তাঁদের কানে পৌছছে না। কতক্ষণ ধরে চৌচামেটি করেছিলাম বলতে পারব না, হঠাৎ আমার মনে আরেক চিন্তা উদয় হল। মৌলানা যদি গুম হয়ে গিয়ে থাকেন, আর তার বট বাড়িতে খলি দিয়ে বসে আছে, স্বামী'র গলা না শুনলে দরজা বুলবেন না; অথবা একা থেকে মুচু গেলেন? আমার গলা থেকে বিকৃত চিংকারের বেরতে লাগল। নিজের নাম ধরে পরিচয় দিয়ে চৌচাছি, মনে হচ্ছে, এ আমার গলা নয়, আমার নাম নয়।

হঠাৎ শুনি মেয়াও; জিয়াউদ্দীনের বেড়াল। আর সঙ্গের সঙ্গের দরজা খুলে গেল। মৌলানা। ঢোখ ফোলা, গলা এমনিতে ভাঙ্গা—আরো বসে গিয়েছে। দুদিনে দশ বছর বৃদ্ধিয়ে গিয়েছেন।

বললেন, পরশুদিন প্রথম গোলামল শুরু হতেই চাকরকে টাঙ্গা আনতে পাঠিয়েছিলেন সে এখনো ফেরেনি। পাড়ার আর সবাই পালিয়েছে। ইতিমধ্যে বাচ্চার সেপাই দুবার রাস্তা দিয়ে নেমে এসে দুবার হটে গিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আল্লার হাতে জান সঁপ দিয়ে ডাকাতের হানার অপেক্ষা করছিলেন।

সে তো হল। কিন্তু এখন চল। এই নির্জন ভূতড়ে পাড়ায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। তখন মৌলানা যা বললেন, তা শুনে বুঝলুম, এ সহজ বিপদ নয়। তার স্ত্রী আসন্নস্রব। আমার বাড়ি পর্যন্ত হটে যাবার মত অবস্থা বলে তিনি বড় পূর্বেই চলে আসতেন।

বললুম, 'তাহলে আর বসব না। টাঙ্গার সন্ধান চললুম।' শহরে ফিরে এসে পাছু দৃষ্টি এ অন্তরাল, যে-বাগধাণীনা অনুসন্ধান করলুম। একটা ঘোড়া দেখতে পেলুম না; শুনলুম, ডাকাত এবং রেকুইজিশনের ভয়ে সবাই গাড়ি ফেলে ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে।

এখন উপায়? একমাত্র উপায় আবদুর রহমানের গায়ের জোর। সে মৌলানার বটকে কোলে-কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসতে পারবে নিশ্চয়ই, কিন্তু— না; এতে কোনো কিন্তু নেই। রাজী করতেই হবে।

কিন্তু বাড়ি ফিরে যে নয়নাভিরম দৃশ্য দেখলুম তেমনটা জীবনে আর কখনো দেখিনি।

আমার আশ্বিনা যেন শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির সামনের ঘোর-প্রাণধ্বংস; বেনুওয়া সায়েব আর মৌলানা নিকিয়ার মত দাঁড়িয়ে গল্প করানো। আবদুর রহমানও সসম্মত গলা-খাকারি দিয়ে বোঝালো, 'পুরা বধকে... জননা হয়ে।'

জিয়াউদ্দিন বললেন যে, আমি চলে আসার ঘটনাকে পরেই নাকি তাঁর চাকর টাঙ্গা নিয়ে উপস্থিত হয়। আনন্দের আতিশয্যে প্রথম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলুম না, এ-মুদ্রিণে সে টাঙ্গা পেল কোথায়।

তারপর তাকিয়ে দেখি, বেনুওয়া সায়েবের গালে দুদিনের দাড়ি, কোট-পাতলুম দুমডানো, চেহারা অধোত। ভদ্রলোক ফরাসী, হামেশাই ফিটফিট থাকেন—শান্তিনিকেতনের সবাই জানে যে, বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বাঙালী ফিট বাবুর মত ধৃতি কৃতিয়ে পরতে জানতেন, শুধু তাই নয়, বা-হাত দিয়ে কোচাটি টেনে নিয়ে খানিকটা উচুতে তুলে দরকার হলে হনহন করে হাটতেও পারতেন।

বললেন, পরশুদিন টাঙ্গা ফরাসী লিগেশনে পৌছতে পারেনি—লিগেশন শহরের উত্তরদিকে বলে পাগলা-জনতা উজিয়ে গাড়ি খানিকটে চলার পর গাড়ি—গাড়োয়ান দু'জন দিশেহারা হয়ে যায়; শেষটায় গাড়োয়ান সায়েবের কথায় কান না দিয়ে সোজা গ্রামের রাজা ধরে পুবদিকে তিন মাইল দূরে নিজের গায়ে উপস্থিত হয়। সায়েব দুম্মাশির একদিন গরীব চামার গোয়াল-ঘরে না আর কোথাও লুকিয়ে কাটিয়েছেন। দুচার বক্কা অন্তর অন্তর নাকি গাড়োয়ান আর তার ভাই-বেদারের গরুর উপর হাত চালিয়ে সায়েবকে যে বুক দিয়েছে যে, কাবুল শহরের সব ফিরিঙ্গীকে জবাই করা হচ্ছে। বেনুওয়া সায়েব ভালো সাহিত্যিক, কাজেই বর্ণনাটা দিলেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে, আপন দুশ্চিন্তা-উদ্বেগটা ঢেকে চেপে, কিন্তু চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম যে, ১৯১৪—১৮ সালের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার তুলনায় এ-অভিজ্ঞতার মূল্য তিনি কিছু কম দেননি।

মৌলানা বললেন, 'সায়েব, বড় বেঁচে গেছেন; গাঁয়ের লোক যে আপনার গলা কেটে 'গাজী' হবার লেভ সম্বরণ করতে পেরেছে, সেই ইমানের পরম সৌভাগ্য।'

বেনুওয়া বললেন, 'চেঁড়া হয়নি কিনা বলতে পারব না। যখনই দেখছি দুদিনজম মিলে ফিসফাস করছে, তখনই সন্দেহ করছি, আমাকে নিয়েই বুকি কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্वास বাড়িওয়ালা আমাকে অতিথি হিসেবে ধরে নিয়ে আমার প্রাণ বাঁচানো নিজের কর্তব্য বিবেচনা করে আর পাঁচজনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।'

আমি বললুম, 'আমি কাবুলের গায়ে এক বছর কাটিয়েছি, আমার বিশ্বাস, কাবুল উপত্যকার সাধারণ চোখ অভ্যস্ত নিরীহ। পারতকালে বুন-খারাবি করতে চায় না।' বেনুওয়া সায়েব বেশখানেক পরিবর্তন করে আপন লিগেশনে চলে গেলেন।

আমি মৌলানাকে বললুম, 'দেখলে? ফরাসী, জর্মন, রুশ, তুর্ক, ইরানী, ইতালী সবাই আপন লিগেশনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। শুধু তোমার আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

মৌলানা বললেন, 'বুট্টি লিগেশন ব্রিটিশের জন্য—বাঙলা কথা। যদিও তৈরী ভারতীয় অর্থে, চলে ভারতের পরসায়, ইন্তক হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেস্টিক মিনিস্টার লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিস নুন খান ভারত সরকারের।'

আমি বললুম, 'মিস্তর নুন; মাসে তিন চার হাজার টাকার।' দু'জনেই একবাক্যে স্বীকার করলুম যে, পরাধীন দেশের অবমাননা লাঞ্ছনা বিদেশ না গেলে সমাক হৃদয়গ্রন্থ হয় না।

জর্মন কবি গোটে বলছেন, যে বিদেশে যায়নি, সে দেশের স্বরূপ চিনতে পারেনি।

চারদিন অরাজকতার ভিতর দিয়ে কাটল। কনফুসিয়াস বলেছেন, 'বাধ হতে ভয়ঙ্কর কু-রাজার দেশ', আমি মনে মনে বললুম, 'তারও বাড়ী যবে ডাকু পরে রাজশেষ।'

আমানউল্লাহ বসে আছেন আকের ভিতরে। তাঁর ঢেলা-চামুণ্ডার শহরের লোককে সাধারণতারা করছে বাচার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য। কেউ কান দিচ্ছে না। শহর চোরডাকাতে ভর্তি। যেসব বাড়ি পাকাপোক্ত মাল দিয়ে তৈরি নয়, সেগুলো লুট হচ্ছে। একটুখানি নিরস্ত্র যাবার যো নেই—ওভারকোটের লোতে শীতকাতুরে ফিচকে ডাকাতে সব কিছু করত প্রস্তত। টাকার চেয়েও কাকাতের লোভ এ জিনিসের উপর—কারণ টাকা দিয়েও কোনো কিছু কেনার উপায় নেই। হাট বসছে না বলে দুধ, মাগে, আলু, পেঁয়াজ কিছুই কেনা যাচ্ছে না। গম-ডালের মূল্যও গাঁট হয়ে বসে আছে, নাম চড়বার আশায়—কাবুল শহর বাকী দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় বেড়াচ্ছে না; একমাত্র রুশ পাইলটরা নিত্যে শহরের মাঝখান দিয়ে ভিড় টেলে বিমানঘাঁটিতে যাওয়া-আসা করছে। হাতে রাইফেল পর্যন্ত নেই, কোমরে মাত্র একটি পিস্তল।

কিন্তু সময়েই আশ্চর্য হলুম খাস কাবুল বাসিন্দাদের ব্যবহার দেখে। রাইফেল খুলিয়েছে কাখে, বুলেটের বেগে বেঁধেছে কোমরে, কেউ পরেছে আড়াআড়ি করে পৈতের মত বুকের উপরে, কেউ-বা যাকুব বানিয়ে বাহতে, কেউ কাঁকন করে কব্জীতে, দু-একজন মল করে পায়ের।

যে অস্ত্র বিদ্রোহী, নরঘাতক, দস্যুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য দীন অফগানিস্তান নিরাম থেকে ক্রয় করেছিল, সে আজ অলংকাররূপে ব্যবহৃত হল।

কিন্তু আশ্চর্য, নগরী রক্ষা করতে এদের কোনো উৎসাহ নেই? দস্যু জয়লাভ করলে লুণ্ঠিত হবার ভয় নেই, প্রয়জনের অপর্যাপ্ততা আশঙ্কা সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন, সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এদের বিদুমদার বিচলিত করতে পারেনি?

মীর আসলম কানে কানে বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন কাবুলের বড় বড় মহল্লার সর্দার আর বাচার ভিতরে গোপনে বোম্বা-পাড়া হয়ে গিয়েছে যে, কানুলীরা যদি আমানউল্লাহ হয়ে না লড়ে, তবে বাচ্চা শহর লুট করবে না।

কথাগুলো শীঘ্রীষ্টের করাঙুলি হয়ে আমার অন্ধ্র ঘুরিয়ে লিল। মীর আসলমের খবর সত্য বলে ধরে নিলে কাবুলবাসীর নির্বিকল্প সমাধির চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু হ্যা, অন্তবলে ধীন অসুখামর্থ্যে দীন যে কাঁচা শুদ্ধ সাহসের বলে বিশ্বস্তাৎ ইংরেজকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করলেন, অনুর্বর অনুমত দেশকে যে রাজ্য প্রগতিপথে চালিত করবার জন্য আপন সুশাস্তি বিসর্জন দিলেন, বিশ্বের সম্মুখে যে নরপতি আপন দেশের সুখোজ্ঞল করলেন, তাঁকে বিসর্জন করে কাবুলের লোক বরণ করল ঘণা নীচ দস্যুকে? একেই কি বলে কৃতজ্ঞতা, নিমকহলালি?

তবে কি আমানউল্লাহ 'কাফির'?

মীর আসলম গর্জন করে বললেন, 'আলবৎ না; যে-রাজা প্রজার ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না, নামাজ, রোজা যিনি বার করেদিন, হচ্ছে যেতে জকাৎ দিতে যিনি বাধা দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মহাপাপ, তাঁর শত্রুর সঙ্গে যোগ দেওয়া তেমনি পাপ। পক্ষাধরে বাচ্চায় সকাও খুনী ডাকাতে—ওয়াজি—উল—কৎল, কতলের উপকৃত্য। সে কশ্মিরকালেও

আমীর-উল-মুমিনীন (বাসদা) হতে পারে না।

মীর আসলাম বড় শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। আমার বিবেকবুদ্ধিও তাঁর কথায় সায় দিল। তবু বললুম, 'কিন্তু আপনি আবার কবে থেকে আমানউল্লাহর খয়ের ঝাঁ হবেন?'

মীর আসলাম আরো জোর হক্কার দিয়ে বললেন, 'আমি যা বলেছি, তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক। আমি বলি, আমানউল্লাহ কাকির নয়। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না-জায়িজ অশাস্ত্রীয়।'

নাস্তিক রাশান রাজদূতবাসে গিয়ে শুনি সেখানেও ঐ মত। দেমিদফকে বললুম, 'রেভলিউশন আরক্ত হয়েছে।' তিনি বললেন 'না, রেভলিউশন।' আমি শুধালুম, 'উফাতটা কি? বললেন, 'রেভলিউশন প্রগতিশীল', 'রেভলিউশন প্রগতিপরিপুষ্টী'।

ভাবলুম মীর আসলামকে এ-খবরটা দিলে তিনি খুশী হবেন। বড়ো উল্টো গন্তীর হয়ে বললেন, 'সমরকন্দ-খুখারার মুসলিমদের উচিত রশ্বার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। রশ্ব সরকার তাদের মক্কায় হজ্জ করছে যেতে দেয় না।'

খামখেয়ালী ছোটলটে আর আগমন সন্ধান শুনে যে রকম গাঁয়েয় পণ্ডিত হতবুদ্ধি হয়ে যান, মৌলানা আর আমি সেই রকম একে অবদান মুখেই দিলে কান্যাল করে তাকাই। মৌলানার বউ যে-বড়লটিকে নিমন্ত্রণ করে বসে আলো, তিনি কোন দিন কোন গাড়িতে কি কায়দায় আসবেন, তাকে কে অভ্যর্থনা করবেন, তিনি এলে তাঁকে কোথায় রাখতে হবে, কি খাওয়াতে হবে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ আমাদের কারো হয়নি—মৌলানার বউও কিছুই জানেন না; তার এই প্রথম ব্যাড়া হচ্ছে।

শুনছি আফগানি মেয়েরা ক্ষেতের কাজ শানিকক্ষণের জন্য কান্ড দিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে সন্তান প্রসব করে—আসলামপ্রসবার জন্য আফগান পন্যবাহিনীও নাকি প্রতীক্ষা করে না। সে নাকি ব্যাড়া কোলে করে একটু পা চালিয়ে পন্যবাহিনীও এবার যোগ দেয়। মৌলানার বউ মধাবিষ্ঠ ঘরের মেয়ে; তার কাছ থেকে এরকম করণ্ড আশা করা অন্যায্য। লক্ষণ দেখেও আমরা ধাবড়ে গেলুম। কিন্তু যেতে পারেন না, রাস্তার ঘুম হয় না, সমস্ত দিন ফুলচুল চোখ, মৌলানাকে এক মিনিটের তরে সেই ফুলচুল চোখের আড়াল হতে দেন না।

অন্যের প্রার্থন গ্রহণ করা ব্যবসা হলেও প্রাণ দেবার বেলা সব মানুষের একই অচরণ। ডাক্তার কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে রস্তায় বেরতে রাজী হয় না। সেদিন তাকে যা সাধ্যসাধনা করেছিলুম, তার অর্ধেক তোমাদেবে কালো ভক্তগজ মেয়েজ জন্য বিনাপণে নিকষি নটীর মেয়ে। বাড়ি ফেরবার সময় সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ডাক্তারি পড়াব—স্বশানবৈরাগ্যের মত এ হল শ্মশানপ্রতিজ্ঞা।

সিডিল সার্জন যে রকম গরীব রোগীর অর্থ সামর্থ্যের প্রতি মুগ্ধপা না করে আড়াই গজী প্রেসক্রিপশন ঝেড়ে যান, কাবুলী ডাক্তার তেমনি পথিয়ার ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন। শুনে ভয় পেয়ে মৌলানা আর আমি খাটের তালার অশ্রুয় নিলুম। তারদিন ধরে খাচ্ছি রুটি, দাল আর বিন-দুধ চা—এ দুর্দিনে স্বয়ং আমানউল্লাহ ওসব ফেলি পথি যোগাড় করতে পারবেন না। দুঃ। আত্মহুঃ!! ভিন্ন!! বলে কি? পাগল, না মাথা খারাপ?

আবদুর রহমান সনিয়েন শিবন কল্ল, সন্ধ্যার সময় তাকে একটা রাইফেল আর দুশক্টার ছুটি দিলে সে চেষ্টা করে দেখতে রাজী আছে। ভাড়াতিতে আমার মরাল অবজেক্টরন নেই—যশিন দেশে যদাচার, ভদুপরি প্রবাসে নিয়ম নাস্তি—কিন্তু সব সময় সব ডাকাত তো আর বাড়ি ফেরে না। যদি আবদুর রহমান বাড়ি না ফেরে? তবে বাড়ি অচল হয়ে যাবে।

এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি ব্যাডায় সকাও যেন ডাক্তারের বেশ পরে স্তিতিক্ষুপ গলায় খুলিয়ে নাখা তলোয়ার হাতে করে আমাদের বলছে, 'হয় দাও আত্মহুঃ, না হয় নেব মাথা'।

সাঁইত্রিশ

চারদিনের দিন আবদুর রহমান তার দৈনিক বুলেটিনের এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে খবর জানালো, ব্যাড়া মাইল দশকে হটে গিয়েছে। দিন দশকের ভিতর শহরের ইক্ষুন-কলেজ, আপিস-আদালত মূলল।

আমানউল্লাহ মত ফেলবার ফুরসত পেলেন।

কিন্তু ব্যাডাকে ভাড়াতে পেরেও তিনি ভিতরে ভিতরে হার মেনেছেন। দেরেশির আইন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, মেয়ে-স্কুল বন্ধ করা হয়েছে আর রাস্তা-ঘাট থেকে ফক-ব্লাউজ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যে সব মেয়েরা এখন রাস্তায় বেরন তাঁরা পরেন সেই তাশু ধরনের বোরকা। হাট পরার সাহস আর পুরুষ-স্বতীলোক বাজো নেই—হয় পাগড়ি, নয় পশমের চুপি। যেসব স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা এই ডামাডোলের কারাগারে পালিয়েছিল তাদের ধরে আনবার কোনো চেষ্টা করা হল না—করার উপায়ও ছিল না কারণ পুলিশের দল তখনও 'ফেরার', আসামী ধরবে কে?

মৌলানা মিলিয়ে দেখলে বলতে হবে ভালোই হয়েছে। আমানউল্লাহ যদি এ যাত্রা বেঁচে যান তবে বুঝতে পারবেন যে দেরেশি চাপানো, পর্দা তুলে দেওয়া আর বৃহস্পতিবারে ছুটির দিন করা এই অনুমত দেশের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার নয়। বাকী রইল শিক্ষাবিস্তার আর শিল্পবাণিজ্যের প্রসার—এবং এ দুটোর বিরুদ্ধে এখনো কেউ কোনো আপত্তি তোলেন। বিপদ কটার পর আমানউল্লাহ যদি এই দুটো নিয়ে লেগে যান তবে আর সব আপনার থেকেই হয়ে যাবে।

মীর আসলাম এসে বললেন, অবস্থা দেখে বিশেষ ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। শিনওয়ারীরা এখনো মারমুখা হয়ে আছে। আমানউল্লাহ সপেণ তাঁদের সন্ধির কথাবাণী চলায়ে। তার ভিতরে দুটো শত হচ্ছে, তুর্কী থেকে কাবুলী মেয়ে ফিরিয়ে আনা আর রানী সুরাইয়াকে তালক দেওয়া। রানী নাকি বিদেশে পরশুকুনের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে মান-ইচ্ছা বুইয়ে এসেছেন।

আমরা বললুম, 'সে কি কথা? সমস্ত পৃথিবীর কোথাও তো রানী সুরাইয়া সম্বন্ধে এ রকম বদনাম রটেনি। ভারতবর্ষের লোক পর্দা মানে, তারা পর্যন্ত রানী সুরাইয়ার প্রশংসা ভিন্ন নিন্দা করেনি। শিনওয়ারীর এ আজগুবি খবর পেলো কোথেকে আর রটাচ্ছে কোন লজ্জায়!'

মীর আসলাম বললেন, 'শিনওয়ারী মেয়েরা বিনা পর্দায় খেতেও কাজ করে বটে কিন্তু পরশুকুনের দিকে আড়াননে তালকেও তাদের কি অবস্থা হয় সে কথা সবকলেই জানে—আমানউল্লাহও জানেন। তবে বল দেখি, তিনি কোন বুদ্ধিতে সুরাইয়াকে বল নাচে নিয়ে গেলেন? জলালাউল্লাহর মত জলী শহরেও দু-একখানা বিদেশী শব্বরের কাগজ আছে—তাতে ছবি বেরিয়েছে রানী পরশুকুনের গলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটা কে কতদূর মারাত্মক আমানউল্লাহ এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি—তাঁর মা পেরেছেন, তিনি আমানউল্লাহকে পীড়াপীড়ি করছেন সুরাইয়াকে তালক বোঝার জন্য।'

রানী-মার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। উল্লসিত হয়ে বললুম, 'রানী-মা ফের আসরে

নেমেছেন? তাহলে আর ভাবনা নেই; শিনওয়ারী, খদিয়ানী, বাচ্চা, কাক্কা সবাইকে তিনি তিনদিনের ভিতর চাটনি বানিয়ে দেবেন।

মীর আসলম বললেন, “কিন্তু আমানউল্লা তার উপদেশে কান দিচ্ছেন না।”

শুনলে অত্যন্ত নিরাশ হলুম। মীর আসলম যাবার সময় বললেন, ‘তোমাকে একটা প্রাচীন ফার্সী প্রবাদ শিখিয়ে যাই। রাজা চালনা হচ্ছে, সিংহের পিঠে সওয়ার হয়ে জীবন কাটানো। ভেবেচিন্তেই বললুম, জীবন কাটানো—অর্থাৎ সে-সিংহেয় পিঠ থেকে এক মুহূর্তের জন্য নামবার উপায় নেই। যতক্ষণ উপরে আছ, সিংহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাকেও অহরহ সজাগ থাকতে হবে। আমানউল্লা সন্ধির কথাবার্তা তুলেছেন অর্থাৎ সিংহের পিঠ থেকে নেবে দুদগু জিরোতে চান—সেটা হবার জো নেই। শিনওয়ারী-সিংহ এইবার আমানউল্লাকে গিলে ফেলবে।’

আমি চুপ করে কিছুক্ষণ ভেবে বললুম, ‘কিন্তু আমার মনে হয় প্রবন্ধটার জন্মভূমি এদেশে নয়। ভারতবর্ষেই তৎখণ্ডে “সিংহাসন” বলা হয়। আফগানিস্তানে কি সিংহ জানোয়ারটা আছে?’

এমন সময় আবদুর রহমান এসে খবর দিল পাশের বাড়ির কর্নেল এসেছেন দেখা করতে। যদিও প্রতিবেশী তবু তার সঙ্গে আমার অলাপ পরিচয় হয়নি। বাড়ির-যত্ন করে বসাতেই তিনি বললেন যে, লড়াইয়ে যাবার পূর্বে আমাদের আশীর্বাদ মগ্পল-কামনা ভিক্ষা করতে এসেছেন। মীর আসলম তৎখান্দে হাত তুলে লোয়া (আশীর্বাদ-কামনা) পড়তে আরম্ভ করলেন, আমরাও দু’হাত তুলে ‘আমেন, আমেন’, (তথাস্ত, তথাস্ত) বললুম। আবদুর রহমান তামাক নিয়ে এসেছিল, সেও মাটিতে বসে প্রার্থনায় যোগ দিল।

কর্নেল চলে গেলেন। মীর আসলম বললেন, ‘পাড়া-প্রতিবেশীর আশীর্বাদ ও ফন্না ভিক্ষা করে যুদ্ধযাত্রা করা আফগানিস্তানের রওয়াজ।’

আক্রমণের প্রথম ধাক্কা বাচ্চা কাবুল শহরের উত্তর প্রান্তে শহর-আরায় ঢুকতে পেরেছিল। সেখানে হাবীবিয়া ইস্কন্দর। ডাকাতদলের অগ্রদূত—বাচ্চা। ‘আফগান বাগডোয়া’ ছড়ার তারাই ‘অগ্রভোজ’ বা ভানগার্ড—ইস্কান্দার হস্টলের প্রথম রাত কাটায়ে। বেশীর ভাগ ছেলেই ভয়ে পালিয়েছিল, শুধু বাচ্চার জন্মস্থান কুহিস্তানের ছেলেরা ‘দেশের ভাই, শুকর মুহাম্মদের’ প্রতীক্ষায় আগুন জ্বলে তৈরী হয়ে বসেছিল। ডাকাতরা হস্টলের চারদিক দিয়ে পোলাও রাঁধে, ইস্কান্দার বেকিটেরিয়াল, স্টাইনগাস ভলান্টের মোটা মোটা অভিধান, ছেলেরদের পঠাবাই খাতাপত্র দিয়ে উলু জ্বালায়। তবে সবচেয়ে তারা নাকি পছন্দ করছিল ক্যান্ডিস আর কাঁচের তৈরী রোল করা মানচিত্র।

আমানউল্লা ‘কাফির’, পুঁথিপত্র ‘কাফিরী’, চেয়ার টেবিল ‘কাফেরীর’ সরঞ্জাম—এসব পুড়িয়ে নাকি তাদের পূণ্যসম্বন্ধ হয়েছিল।

ডাকাতেরও ধর্মজ্ঞান আছে। হস্টলের ছেলেরা যদিও কাফির আমানউল্লার তালিম পেয়ে কাফির হয়ে গিয়েছে তবু তারা তাদের অভুক্ত রাখেনি। শুধু বাগওয়ার সময় একটু অতিরিক্ত উৎসাহের চোটে তাদের পিঠে দুদরটে লাথি চাটী মেরেছিল। বাচ্চার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে নাকি হস্টল-বাসিন্দা ছিল; সে মামার হয়ে ফপার দালালি করেছে; তবে বাচ্চার পলায়নের সময় অবস্থানটি বিবেচনা করে ‘কাফিরী তালিম’ ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে ‘গাজীহ’ লাভ করেছে।

বাড়ি ফেরার সময় দেখলুম ছোট ছোট ছেলেরা রাষ্ট্র থেকে বুলেটের খোসা কুড়াচ্ছে।

খবর পেলাম, ব্রিটিশ রাজদূত স্যার ফার্নিস হামফ্রিসের মতে কাবুল আর বিদ্যমানের

জনা নিরাপদ নয়। তাই তিনি আমানউল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এদেশ থেকে সরিয়ে ফেলবার বন্দোবস্ত করলেন। আমানউল্লা সহজই সম্মতি দিয়েছেন, কারণ তিনিও চাননি যে, বিদেশীরা আফগানিস্তানের এই বয়েয়া ব্যাপারে অনর্থক প্রাণ দেয়। কাবুল বাকী পৃথিবী থেকে তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে আরোহেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

আরোহেন এল। প্রথম মেয়েদের পালা। ফরাসী গেল, জর্মন গেল, ইতালিয় গেল, পোল গেল—এককথায় দুনিয়ার অনেক জাতের অনেক স্ত্রীলোক গেল, শুধু ভারতীয় মেয়েদের কথা কেউ শুধালো না। আরোহেনগুলা ভারতীয় অর্থে বেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা যায়। অর্থাৎ সবচেয়ে বিপদ ভারতীয় মেয়েরাই—অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা আপন আপন লিগেশনের আশ্রয়ে ছিল, কিন্তু ভারতীয়দের দেখে কে? প্রফেসর, দোকানদার, ডাইভারের বটকে ব্রিটিশ লিগেশনে স্থান দিলে স্যার ফার্নিস বিদেশী সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে? বামুনসের জাত পেল প্রায়শ্চিত্ত আছে, আর মুসলমানদের জো জাত যায় না। কিন্তু ইংরেজের জাতিভেদ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। তার দেশে যেরকম কাগজে কলমে লেখা, আইনে বাঁধা কঙ্গটিউশন নেই ঠিক তেমনি তার জাতিভেদপ্রথা কোনো বাইবেল-প্রচারবুকে আত্মবাক্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অর্থাৎ সে জাতিভেদ রবীন্দ্রনাথের ভূতের কানমলার মত—সে কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নাশিল, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার। দর্শন, অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হোন, মার্কসিজমের দিগ্বিজয়ী কোটিলিই হোন, অথবা কয়লার খনির মজুরই হোন, এই কানমলা স্বীকার করে করে হোস অব লর্ডসে না পৌঁছানো পর্যন্ত দর্শন মিথ্যা, মার্কসিজম, ভুল, শ্রমিকসম্প্রের দেওয়া সম্মান ভণ্ডুল। যে এই কানমলা স্বীকার করে না ইংরেজের কাছে সে আধপাণল। তার নাম বার্নাড শ।

বাজাবাড়ি করছি? মোটেই না। খান ভানতে শিবের গীত? তাও নয়। বিচ্ছববিরোধ রক্তপাত—রাজধানী মাত্রই রক্তের ডাঙবন্ডা—এতক্ষণ সে কথাই হচ্ছিল, এখন তার নন্দীত্বশী-সম্বন্ধের পালা।

ইংরেজের এই ‘আভিজাত্য’ এই ‘সুবারি’ ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে ব্রিটিশ রাজদূতের মনোবৃত্তির মুক্তিদ্রুত অর্থ করা যায় না। ব্রিটিশ লিগেশনের যা আকার তাকে কাবুলের বাবাবাকী সব কটা রাজদূতবাস আনয়াসে ঢুকে যেতে পারে। একখানা ছোটখাট শহর বললেও অত্যুক্তি হয় না—নিজের জলের কল, ইলেকট্রিক পাওয়ার—হোস, এমন কি ফায়ার-ব্রিগেড পর্যন্ত মৌখিক। শীতলকালে সায়েব-সুবাদের খেলাধুলার জন্য চা-বাগানের পাতারকাঁবার ঘরের মত যে প্রকাণ্ড বাড়ি আছে তারই ভিতরে সমস্ত ভাড়বী আশ্রয়প্রার্থীর জায়গা হতে পারত। আহমাদি? ব্রিটিশ লিগেশন কাবুল থেকে পালিয়ে আসার সময় যে চিনের খাদ্য ফেলে এসেছিল তাই দিয়ে মেয়েদের পাকা ছমাস চপাতে পারত।

ফ্রেঞ্চ লিগেশনের যে মিনিষ্টারকে বেনগুড়া সায়েব রিসিক্ত করে ‘মিনিষ্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন’ বললেন তিনি পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থী ফরাসীদের মন চাচ্চা করার জন্য ভাণ্ডার উজাড় করে শ্যাম্পেনে বাইয়েছিলেন।

ভাঙার আসে না, অম জুটছে না, পথ্যের অভাব, দাঁ নেই, আসমপ্রসবার আশ্রয় জুটছে না; তাহলে কোথেকে ভারতীয় পয়সা কেনা হাওয়াই জাহাজ ভারতবর্ষে যাবে ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, সকল জাতের মেম সায়েবদের নিয়ে! হে প্রৌদীশরণ, চক্রশরণ, এ প্রৌদীশ যে অন্তঃসদা!

উত্তরদিক থেকে কাবুল শহর আক্রমণ করতে হলে ব্রিটিশ রাজদূতবাস অতিক্রম করে

আরো এক মাইল ফাঁকা জায়গা পেরতে হয়। বাচ্চা তাই করে শহর-আর হাষ্টলে পৌঁছেছিল। সুবে আফগানিস্তান জানে সে সময় পাকা চারদিন ব্রিটিশ রাজদূতাবাস তথা মহামান্য স্যার ফ্রান্সিসের জীবন বাচ্চার হাতের তেলোয় পুঁটি মাছের মত এক গধুখ জলে বাবি থাকছিল। বাচ্চা ছেলে করলেই যে কোনো মুহুর্তে লিগেশনকে কচু-কাটা করতে পারত—একটু ওদাসীনা দেখালেই তার উদ্ভবীষ সঞ্জীরা সবাইকে কতল করে বাদশাহী লুট পেত, কিন্তু জলকরতকবাহীর তৎপরপূর্ণ অভিজাততনয়ের প্রাণ দান করল। তবু দস্যুদত্ত করুণালব্ধ সে-প্রাণ বিপন্ন। নারীর দৃষ্টিতে বিগলিত হল না।

গল্প শুনেছি, জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর নাতিকে নিয়ে খোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পথে এক নিগ্রো হ্যাট তুলে দুজনকে নমস্কার করল। ওয়াশিংটন হ্যাট তুলে প্রতিশ্রুত নমস্কার করলেন, কিন্তু নাতি নিগ্রোকে তাক্ষিণ্য করে নমস্কার গ্রহণ করল না। জর্জ ওয়াশিংটন নাতিকে বললেন, 'নগণ্য নিগ্রো তোমাকে গুজরায় হার মানানো।' দয়া দাক্ষিণ্যে, করুণা ধর্ম মহামান্য সম্রাটের অভিমান্য প্রতিভ হিচ্চ এক সেলেন্ডি লেফটেনেন্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিসকে হার মানানো ডাকুর বাচ্চা।

চিরকুট পেলুম, দেমিদফ লিখেছেন রাশান এম্পেরিতে যেতে। এ রকম চিঠি আর কখনো পাইনি, কারণ কোনো কিছুই দরকার হলে তিনি নিজেই আমার বাড়িতে উপস্থিত হতেন। চেহারা দেখেই বুঝলুম কিছু একটা হয়েছে। দোরের গোড়াতেই বললুম, 'কি হয়েছে, বলুন।' দেমিদফ কোনো উত্তর না দিয়ে আমাকে ঘরে এনে বসালেন। মুখামুখি হয়ে বসে দু'হাত দু'জানুর উপর রেখে সেজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলশফ মারা গিয়েছেন।' আমি বললুম, 'কি?'

দেমিদফ বললেন, 'আপনি জানতেন যে, ব্রিজো আরজ হতেই বলশফ নিজের থেকে আমানউল্লাহ কাছে উপস্থিত হয়ে বাচ্চায় সকাওয়ার দলের উপর অ্যারোপেন থেকে বোমা ফেলার প্রস্তাব করেন।' কাল বিকেলে—'

আমি ভাবছি, বলশফ কিছুতেই মরতে পারে না, অবিশ্বাস্য।
—কাল বিকেলে অন্য দিনের মত বোমা ফেলে এসে এম্পেরির ক্লাব ঘরে দাবা খেলতে বসেছিলেন। ব্রিটেনের পকেটে ছোট্ট একটা পিস্তল ছিল; বা হাত দিয়ে ধুঁটি চালাচ্ছিলেন, ডান হাত পকেটে রেখে পিস্তলের খোড়াতা নিয়ে খেলা করছিলেন—,জানেন তো, বলশফের স্বভাব, কিছু একটা নাড়াচাড়া না করে বসতে পারতেন না। হঠাৎ ট্রিগারে একটু বেশী চাপ পড়তেই গুলী পেটের ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছ পর্যন্ত চলে যায়। ফটা ছয়ক বেঁচে ছিলেন, ডাক্তার কিছু করতে পারলেন না।

আমার তখনও কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বলশফের মত বটগাছ কি করে বিনা কড় পড়ে যেতে পারে। এত লড়াই লাড়ে, এত জখম কাটিয়ে উঠে শেষে নিজের হাতে—?

দেমিদফ বললেন, 'আপনার খুব লাগবে আমি জানতুম তাই সফেক্সে বললুম; আর যদি কিছু জানতে চান—?' আমি বললুম, 'না।'

চলুন, দেখতে যাবেন।'

আমি বললুম, 'না।' বাড়ি যাবার জন্য উঠলুম। মাদাম ডাঁড়াডাডি আমার সামনে পথ বন্ধ করে বললেন, 'এখানে থেকে যান।'

আমি বললুম, 'না।'

টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে বেরবার সময় হঠাৎ যেন শুনতে পেলুম বলশফের গলা,

'জঙ্গাসভূহীয়তে, মই প্রিয়াতেল—এই যে বন্ধু, কি রকম?' চমকে উঠলুম। আমার মন তখনো বিশ্বাস করছে না, বলশফ নেই। এই টেনিস কোর্টেই ওরা সপ্তাহে প্রথম আলাপ হয়েছিল আর এই যে দেউড়ি দিয়ে বেরছি এইরই ভিতর দিয়ে কতবার তাঁর সঙ্গে প্রথম বেড়াতে বেঁজিয়েছি।

বাড়ি এসে না থেয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার অজ্ঞানতে মন সমস্ত রাত বলশফের কথা ভেবেছে। ঘুম ভাঙতেই যেন শুধু সচেতন হলুম। মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে শেষ কথাবার্তা। ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'বলশফ তুমি আমানউল্লাহ হয়ে লুণ্ঠ কেন? আমানউল্লাহ রাজা, বাচ্চার দল প্রলেতারিয়েস্ট অব দি প্রলেতারিয়া। তোমার উচিত বাচ্চার দলে যোগ দিয়ে লড়া।'

বলশফ বলেছিল, 'বাচ্চা কি করে প্রলেতারিয়া হল? সেও তো রাজার মুকুট পরে এসেছে। রাজায় রাজায় লড়াই। এক রাজা শ্রমতিপট্টী, আরেক রাজা প্রগতিশীল শত্রু। চিরকাল প্রগতির জন্য লড়েছি, এখনো লড়ছি, তা সে ব্রহ্মসিংহ নেতৃত্বেই হোক আর আমানউল্লাহ আদেশই হোক।' আমানউল্লাহ সেই চরম দুর্দিনে সব বিদেশীর মধ্যে একমাত্র বলশফের কর্তৃত্ব রাশান পাইলটরাই তাঁকে সাহায্য করেছিল, বাচ্চা জিতলে তাদের কি অবস্থা হবে সে সম্বন্ধে একদম পরোয়া না করে।

দিন পরনো পরে খবর পেলুম, অ্যারোপেন কাবুল থেকে বিদেশী সব স্ত্রীলোক কাচ্চা-বাচ্চা বেঁটায়ে নিয়ে গিয়েছে; বিদেশী বলতে এখন বাকী শুধু ভারতীয়। তিন লক্ষের ব্রিটিশ লিগেশনে উপস্থিত হয়ে মৌলানার বউয়ের কথাটা সন্ধানত সর্বিনয় নিবেদন করলুম। ব্রিটিশের দয়া অসীম। ভারতবাসিনী-লাদাই উজোজাহাজের প্রথম ক্ষেপেই তিনি স্থান পেলেন। পুনরাপি তিন লক্ষের বাড়ি পৌঁছে আশ্বিনা থেকেই চিৎকার করে বললুম, 'মৌলানা, কেত্কা করো, সীট পেয়ে গিয়েছি। বউকে বলা তৈরী হতে। এখন ওজন কমাতে নিয়ে যেতে হবে,—কর্তারা ওজন জানতে চান।'

মৌলানা নিরুত্তর। আমি অবাক। শেষায় বললেন, যে, তাঁর বউ নাকি একা যেতে রাজী নন, বলছেন, মরবার হলে এদেশে স্বামীর সঙ্গেই মরবেন। আমি শুধালুম, 'তুমি কি বলছ? মৌলানা নিরুত্তর। আমি বললুম, 'দেখ মৌলানা, তুমি পাঞ্জাবী, কিন্তু শাস্তিনিকেতনে থেকে থেকে আর গুরুদেবের মোলোয়ণ গান গেয়ে গেয়ে তুমি বাঙালীর মত মোলায়েম হয়ে গিয়েছ। 'বাঁধুন যে রাখি-টাণ্ডা, এখন বাদ দাও।' মৌলানা তবু নিরুত্তর। চটে গিয়ে বললুম, 'তুমি হিন্দু হয়ে গিয়েছ, তাও আবার ১৮১০ সালের—সতীদাহের—বিশ্বাস করো। কিন্তু জানো, যে গুরুদেবের নাম শুনে অজ্ঞান হও, তাঁরই ঠাকুরা দ্বারকানাথ ঠাকুর টাকা দিয়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে বিলতে মোকাদ্দমা লড়িয়েছিলেন। মৌলানা নিরুত্তর। এবারে বললুম, 'শোনে বাদার, এখন ঠাট্টামস্করার সময় নয়, কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার বউয়ের কবে বাচ্চা হবে, তার হিসাব—টিসব রাখোনি—না হয় বন্ডি পেলুম, যদি পেলুম, কিন্তু যদি বাচ্চা জন্মায় পর তোমার বউয়ের—' বার তিনেক গলা-খাঁকারি দিয়ে বললুম—'তাহলে আমি দুধ যোগাড় করব কোথা থেকে? বাজারে ফের কবে দুধ উঠবে, তার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।'

মৌলানা বউয়ের কাছে গেলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কায়ার শব্দ শুনতে পেলুম। মৌলানা বেরিয়ে এসে বললেন, 'রাজী হচ্ছেন না।'

তখন মৌলানাকে বাইরে রেখে ভিতরে গেলুম। বললুম, আপনি যে মৌলানাকে ছেড়ে যেতে চাইছেন না, তার কারণ যে আমি বুঝতে পারছিলাম তা নয়; কিন্তু ভেবে দেখুন তো, আপনার না যাওয়াতে তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? আপনি যদি চলে যান, তবে তিনি যেখানে খুশী কোনো ভাল জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবেন; শুধু তাই নয়, অজ্ঞা যদি

আরো খারাপ হয়, তবে হয়ত তাঁকেও এদেশ ছাড়তে হবে। আপনি না থাকলে তখন তাঁর পক্ষে সব কিছুই অনেক সহজ হয়ে যাবে। এসব কথা তিনি আপনাকে কিছুই বলেননি, কারণ এখন তিনি নিজের কথা আদর্শই ভাবছেন না, ভাবছেন শুধু আপনার মঙ্গলের কথা। আপনি তাঁর স্ত্রী, আপনার কি এদিকে খেয়াল করা উচিত নয়?'

ওকালতি করছি আর ভাবছি মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ব্যারিস্টারি পড়ার। মেহে হলে আমানউল্লাহর মায়ের হাতে দেখব।

ওখুধ ধরল। ভারত নারীর শ্মশানচিকিৎসা স্বামীর স্বার্থের দোহাই পাড়া। পরদিন সকালবেলা মৌলানা বউকে নিয়ে আরোহাড্রোমে গেলেন। বিপদ-আপদ হলে আবদুর রহমানের কাঁধ কাজে লাগবে বলে সেও সঙ্গে গেল। আমি রইলুম বাড়ি পাহারা দিতে। দিন পরিস্কার ছিল বলে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলুম, পূব থেকে প্রকাণ্ড ভিকারুস্ বমার এল, নামল, ফের পূব দিকে চলে গেল। মাটিতে আধ ঘণ্টার বেশী দাঁড়ায়নি—কাবুল নিরাপদ স্থান নয়।

জিয়াউদ্দীন ফিরে এসে মুখ মামর করে উপরে চলে গেলেন। আবদুর রহমান বলল, 'মৌলানা সাহেবের বিবির জমা-কাপড় দেখে পহিলট বলল যে, আরোপ্চেনে যখন আসামনে অনেক উপরে উঠবে, তখন ঠাণ্ডায় তাঁর পা ভসে যাবে। তাই বেগম হয় তারা সঙ্গে বড় এনেছিল—মৌলানা সাহেব সেই খণ্ড দিয়ে তাঁর বিবির দুপা বেশ করে পেঁচিয়ে দিলেন—দেখে মনে হল যেন বড় জড়োয়ানো বিলিতি সিরকার বোতল। সব মেয়েদেরই পা একরকম কায়ায়ায় সফর-দুরন্ত করতে হল।'

আমরা দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে একটা মড়া নিয়ে কয়েকজন লোক চলে যাচ্ছে দেখে আবদুর রহমান হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ভারবাহী আমার প্রতিবেশী কর্নেলের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ান। আবদুর রহমান কড়া নাড়ল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নারীকন্ঠের তীব্র, আতঙ্কিত সুরে যেন তাঁর মত বাতাস ছিড়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছেল—মড়া দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকাতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণ গলার পর গলা সে আত্নদানে যোগ দিতে লাগল। চিৎকারে মানুষের দেহনা যেন সপ্তম স্বর্গে ভগবানের পায়ের কাছে পৌঁছেতে চাইছে।

কান্না যেন হঠাৎ কেউ লাগি গিলে বন্ধ করে দিল—মড়া বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই নিশ্চিন্ততা তখন যেন আমাকে কান্নার ঢেয়ে আরো বেশী অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে গিয়ে মৌলানার ঘরে ঢুকলুম। আবদুর রহমান এসে খবর দিল, 'কর্নেল লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন!'

মৌলানা দু'হাত তুলে দোয়া পড়তে আরম্ভ করলেন। আবদুর রহমান আর আমি যোগ দিলাম। দোয়া শেষে মৌলানা বললেন, 'লড়াইয়ে যাওয়ার আগে কর্নেল আমাদের দোয়া মাজতে এনেছিলেন, আমাদের উপর এখন তাঁর হুকু আছে।' তাঁরপর মৌলানা ওজু করে কুরান শরীফ পড়তে আরম্ভ করলেন।

দুপুরবেলা মৌলানার ঘরে গিয়ে দেখি, কুরান পড়ে পড়ে তাঁর চেহারাটা অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছে। আসন্নপ্রসঙ্গা স্ত্রীর বিরহ ও তাঁর সম্বন্ধে দুঃখিতা মন থেকে কেটে গিয়েছে।

কর্নেলের প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা জাগল। কোনো কোনো মানুষ মরে গিয়েও অন্যের মনে শান্তির উপলব্ধি হয়ে যান।

কিন্তু আমার মনে খেদও জেগে রইল। যে-মানুষটিকে পাঁচ মিনিটের জন্য চিনেছিলুম তাঁর মৃত্যুতে মনে হল যেন একটা শিশু-সন্তান অকালে মারা গেল। আমাদের পরিচয় তার পরিপূর্ণতা পেল না।

আফগান প্রবাদ 'খাপ-আ যখন গদ গদ হয়ে বলেন, 'আমাদের ছেলে বড় হচ্ছে' তখন একথা ভাবেন না যে, ছেলের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও ঘোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।' আমানউল্লা শুধু তাঁর স্ত্রিয় সংস্কার-কর্মের দিকেই নজর রেখেছিলেন, লক্ষ্য করেননি যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজহরের দিনও ঘুরিয়ে আসছে। কিন্তু শুধু আমানউল্লাকে দেখে দিয়ে লাভ নেই—তাঁর উজির-নাজির স্বস্তী-সাহাও রাস্তার আর পাঁচজন বাচ্চার পালিয়ে যাওয়াতে অনেকটা আশঙ্ক হয়ে হের্দিশন জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টাতে ছিল।

বাচ্চার আক্রমণের ঠিক একঘণ্টা পরে—জানুয়ারীর কঠোর শীতের মাঝামাঝি—একদিন শরীর খারাপ ছিল বলে লেপমুন্ডি দিয়ে শুয়ে আছি, এমন সময় এক পাগলারী অধ্যাপক দেখা করতে এলেন। শহর তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দিনের বেলা চলাফেরা করতে বিশেষ বিপদ নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর শুনেছেন?'

আমি শুধলাম, 'কি খবর?'

বললেন, 'তাহলে জানেন না, শুনুন। এরকম খবর আফগানিস্তানের মত দেশেও রোজ রোজ শোনা যায় না।'

'ভোরবেলা চাকর বলল, রাজপ্রাসাদে কিছু একটা হচ্ছে, শহরের বহুলোক সন্দিগ্ধে যাচ্ছে। গিয়ে দেখি প্রাসাদে আফগানিস্তানের সব উজির, তাদের সহকারী, ফৌজের বড় বড় অফিসার এবং শহরের কয়েকজন মাতাম্বর ব্যক্তিও উপস্থিত। সকলের মাঝখানে মুহূ-উস-সুলতানে ইনায়েরতউল্লা খান ও তাঁর বড় ছেলে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি যে শহরের এত বড় মজলিসের মাঝখানে আমানউল্লা নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করার আগেই এক ভদ্রলোক—পুষ্টে সম্ভব রইস-ই-শুবারাই (প্রেসিডেন্ট অব দি কৌন্সিল) হবেন—একথানা ফরমান পড়তে আরম্ভ করলেন। দুয়ে ছিলুম বলে সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাইনি; কিন্তু শেষের কথাগুলো পাঠক বেশ জোর দিয়ে চোঁচিয়ে পড়লেন বলে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। আমানউল্লা সিংহাসন ত্যাগ করেছেন ও বড় ভাই মুহূ-উস-সুলতানে ইনায়েরতউল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন।'

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'হঠাৎ? কেন? কি হয়েছে?'

'শুনুন; ফরমান পড়া শেষ হলে কাবুলের এক মাতাম্বর ব্যক্তি আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে ইনায়েরতউল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তখন ইনায়েরতউল্লা অত্যন্ত শাস্ত এবং নিজীব কণ্ঠে যা বললেন, তার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, তিনি কখনও সিংহাসনের উপর হেরেননি—দশ বৎসর পূর্বে যখন সন্নরউল্লা আমানউল্লাহর রাজ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তখন তিনি অযথা রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখে আপন অধিকার ত্যাগ করেছিলেন।'

অধ্যাপক দম নিয়ে বললেন, 'তারপর ইনায়েরতউল্লা যা বললেন সে অত্যন্ত খাটি কথা। বললেন, দেশের লোকের মঙ্গলচিন্তা করেই আমি একদিন নায্যা সিংহাসন গ্রহণ করিনি; আজ যদি দেশের লোক মনে করেন যে, আমি সিংহাসন গ্রহণ করলে দেশের মঙ্গল হবে তবে আমি শুধু সেই কারণেই সিংহাসন গ্রহণ করতে রাজী আছি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমানউল্লা?'

অধ্যাপক বললেন, 'তখন খবর নিয়ে শুনলুম, আমানউল্লাহর ফৌজ কাল রাতে লড়াই হেরে গিয়ে পালিয়েছে। খবর ভোরের দিকে আমানউল্লাহর কাছে পৌঁছায়; তিনি উৎফল্গ

ইনায়েতউল্লাকে ডেকে সিংহাসন নিতে আদেশ করেন। ইনায়েত নাকি অবস্থাত বুঝে প্রথমটির রাজী হননি—তখন নাকি আমানউল্লা তাঁকে পিস্তল তুলে ভয় দেখালে পর তিনি রাজী হল।

‘আমানউল্লা ভোরের দিকে মোটর করে কন্দাহার রওয়ানা হয়েছেন। যাবার সময় ইনায়েতউল্লাকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, পিতৃপিতামহের দুদরানী ভূমি কন্দাহার তাকে নিরাশ করার নয়। তিনি শীঘ্রই ইনায়েতউল্লাকে সাহায্য করার জন্য সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হবেন।’

আমানউল্লা তাহলে শেষ পর্যন্ত পালালেন। চুপ করে অবস্থাত হৃদগতম করার চেষ্টা করতে লাগলুম।

অধ্যাপক হেসে বললেন, ‘আপনি তো টেনিস খেলায় ইনায়েতউল্লার পার্টনার হন। শুনেছি, তিনি তাঁর বিরাট বপু নাড়াচাড়া করতে পারেন না বলে আপনি কোর্টের বয়োজ্ঞান জমি সামলান—এইবার আপন আফগানিস্থানের বারোজ্ঞান না হোক অন্তত দুচারজ্ঞান চেয়ে নিন।’

আমি বললুম, ‘তাতে বটেই। কিন্তু বাচ্চার বুলেটের অন্তত দুচারজ্ঞান ঠেকাবার ভার তাহলে আমার উপর পড়বে না তো?’

অধ্যাপক বললেন, ‘তওবা, তওবা। বাচ্চা এখন আর লড়বে কেন, বলুন। তার কাছে ইতোমধ্যে শোরবাজারের হাজারত আর সর্দার ওসমান খান ইনায়েতউল্লার পক্ষ থেকে খবর নিয়ে গিয়েছেন যে, ‘কাফির’ আমানউল্লা যখন সিংহাসন ত্যাগ করে পালিয়েছে তখন আর মুক্ত বিগ্রহ করার কোনো অর্থ হয় না। বাচ্চা যেন বাড়ি ফিরে যান—তাঁর সঙ্গে ইনায়েতউল্লার কোনো শত্রুতা নেই।’

অধ্যাপক চলে গেলে পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর্কের দিকে চললুম।

এবারে শহরের দৃশ্য আরো অদ্ভুত। বাচ্চার প্রথম ধাক্কার পর তবু কাবুল শহরে রাজা ছিলেন, তিনি দুর্বল না সর্বল, সাধারণ লোকে জানত না বলে রাজদণ্ডের মর্যাদা তখনো কিছু কিছু ছিল কিন্তু এখন যেন আকাশেবাতাসে অরাজকতার বিজয়লাভন অতিক্রম। যারা রাস্তা দিয়ে চলেছে তারা স্পষ্টত কাবুলবাসিন্দা নয়। তাদের চোখে মুখে হত্যাচ্যুতের প্রতীক আর লুক্কায়িত নয়। এরা সব দল বেঁধে চলেছে—কেউ ক্লোথ ও একবার আরম্ভ করলে এদের আর ঠেকানো যাবে না।

ঘণ্টায্যানেক ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু একটামাত্র পরিচিত লোককেও দেখতে পেলুম না। তখন ভালো করে লক্ষ্য করলুম যে, প্রায় সবই দল বেঁধে চলছে, ডিখারী—আতুর ছাড়া একলা একলা আর কেউ বেরায়নি।

বাটী খবর দিতে পারে এমন একটি লোক পেলুম না। আভাসে আদ্যেজ বুঝলুম, ইনায়েতউল্লা আর্কের ভিতর অশ্রয় নিয়ে দুর্গ বন্ধ করেছেন। আমানউল্লার কি পরিমাণ সৈন্য ইনায়েতউল্লার বশ্যতা স্বীকার করে দুর্গের ভিতরে আছে তার কোনো সন্ধান পেলুম না।

শোস্ত মুখশদ আমানউল্লার হয়ে লড়তে গিয়েছেন জানতুম, তাই একমাস ধরে তাঁর বাড়ি বন্ধ ছিল। ভাবলুম, এবার হয়ত ফিরেছেন, কিন্তু সেখানে গিয়েও নিরাশ হতে হল। বাড়ি ফিরে দেখি মৌলানা তখনো আসেননি, তাই পাকাপাকি খবরের সন্ধানে মীর আসলমের বাড়ি গেলুম।

বুড়ো আবার সেই পুরোনো কথা দিয়ে আরম্ভ করলেন, যখন কোনো দরকার নেই তখন এই বিপজ্জনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করি কেন?

আমি বললুম, ‘সামলে কথা বলবেন, স্যার। জানেন, বাদশা আমার পার্টনার। চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার কি চাই বলুন, যা দরকার বাদশাকে বলে করিয়ে দেব।’

মীর আসলম অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন, ফাসীতে একটা প্রবাদ আছে, রানো,

‘রাজত্বধুরে বেই করে আলিগলন
ত্রীক্ষ—ধার অসি পরে সে দেয় চুষন।’

‘কিন্তু তোমার বাদশাহ অদ্ভুত। সাধারণ বাদশাহ কামানবন্দুক চালিয়ে অন্তততাপক্ষে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে সিংহাসন দখল করে, তোমার বাদশাহ ইনায়েতউল্লা পিস্তলের ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসনের উপরে গিয়ে বসলেন।’

আমি বললুম, ‘কিন্তু দেখুন, শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে যার হুক ছিল তিনিই বাদশাহ হলেন। কাবুলের লোকজন তো আর ভুলে যায়নি যে, ইনায়েতউল্লা শহীদ বাদশাহ হবীবউল্লার বড় ছেলে।’

মীর আসলম বললেন, ‘সে কথা ঠিক কিন্তু হক্কের এত মাল এত দেৱীতে পৌঁছেছে যে, এখন সে মালের উপর আর পাঁচজনকে নজর পড়ে গিয়েছে। শুনেছ বোধ হয় শোরবাজারের হাজারত বাচ্চাকে ফেরাতে গিয়েছেন। তোমার কি মনে হয়?’

আমি বললুম, ‘ইনায়েতউল্লা তো আর ‘কাফির’ নন। বাচ্চা ফিরে যাবে।’

মীর আসলম বললেন, ‘শোরবাজারের হাজারতকে চেন না—তাই একথাটা বললে। তিনি আফগানিস্থানের সবচেয়ে বড় মোল্লা। আমানউল্লা বিদ্রোহের গোড়ার দিকেই তাঁকে জেলে পুরেছিলেন, সাহস সঞ্চয় করে ফাসী দিতে পারেননি। আজ শোরবাজার স্বাধীন, কিন্তু ইনায়েতউল্লা বাদশাহ হতে তাঁর লাভ? আজ না হয় তিনি বিপদে পড়ে শোরবাজারের হাতে—পায়ে ধরে তাঁকে দলে করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বাচ্চা যদি ফিরে যায় তবে দুর্দিন বাদে তাঁর শক্তি বাড়বে; সিংহাসনে কয়েম হয়ে বসার পর তিনি আর শোরবাজারের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। রাজার ছেলে রাজা হলেন, তিনি রাজত্ব চালাতে জানেন, শোরবাজারকে দিয়ে তাঁর কি প্রয়োজন?’

‘পক্ষান্তরে বাচ্চা যদি ইনায়েতউল্লাকে তড়িয়ে দিয়ে রাজা হতে পারে তবে তাতে শোরবাজারের লাভ। বাচ্চা ডাকাত, সে রাজতালনার কি জানে? যে মোল্লাদের উৎসাহে বাচ্চা আজ লড়ছে সেই মোল্লাদের মুকুটমণি শোরবাজার তখন ফিরেও কণ্ঠধরি হবেন।’

‘কিন্তু তারা চেয়ে বড় কারণ রয়েছে, বাচ্চা কেন ফিরে যাবে না। তার যে—সব সঙ্গী—সাথীরা এই একমাস ধরে বরফের উপর কখনো লাড়িয়ে কখনো শুয়ে লড়ল, বাচ্চা তাদের শুধুহাতে বাড়ি ফেরাবে কি করে? কাবুল লুটের লালসা দেখিয়েই তো বাচ্চা তাদের আপন আগুর তলায় জড়ো করেছে।’

আমি বললুম, ‘বাঃ। আপনিই তো সেদিন বললেন, বাচ্চা মহল্লা—সর্গারদের কথা দিয়েছে যে, কাবুলীরা যদি আমানউল্লার হয়ে না লড়তে তবে সে কাবুল লুট করবে না।’

মীর আসলম বললেন, ‘এরই নাম রাজনীতি। ইংরেজ বেরকম লড়াইয়ের সময় আরবদের বলল তাদের প্যালেস্টাইন দেবে, ইহুদীদের বলল তাদের দেশ দেবে।’

বাড়ি ফিরে এসে দেখি পাশ্চাতী অধ্যাপকরা দল বেধে মৌলনাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে আড্ডা জমিয়েছেন। আমাকে নিয়ে অনেক হাসি—ঠাট্টা করলেন, কেউ বললেন, ‘দাদা, আমার ছাম্পের ছুটিস প্রয়োজন’, কেউ বললেন, ‘পাঁচ বছর ধরে প্রোমেশন পাইনি, বাদশাহকে সেই

কথাটা শ্রমণ করিয়ে দেবেন।' মৌলানা আমার হয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, 'স্বপ্নেই যদি পোলাও খাবেন তবে ঘি ঢালতে কল্পসি করছেন কেন? যা চাইবার দরাজ-দিলে চেয়ে নিন।'

সেখলুম, এদের সকলেরই বিশ্বাস বাচ্চা শুধু-হাতে বাড়ি ফিরে যাবে আর কাবুলে ফের হারুন-অর-রশীদের রাজত্ব কয়েম হবে।

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান বুলেটিন বেড়ে গেল, বাচ্চা ফিরতে নারাজ, বলছে, 'সে-তাজ পাঁচজন আমাকে পরিয়েছেন, সে তাজ আমার শিরোধার্য।' বুকলুম, মীর আসলম ঠিকই বলেছেন, 'রাজা হওয়ার অর্থ সিংহের পিঠে সওয়ার হওয়া—একবার চড়লে আর নাবার উপায় নেই।'

সে রাতে বাড়িতে ডাকু হানা দিল। আবদুর রহমান তার রাইফেল ব্যবহার করতে পেয়ে যত না গুলী ছুঁড়ল তার চেয়ে আনন্দে লাফাল বেশী। ফিচকে ডাকাতিই হবে, আবদুর রহমানের রনাল শুনে পালান।

আবদুর রহমান তার বুলেটিনের মাল-মসলা সংগ্রহ করে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে। রাস্তা দিয়ে যে যায় তাকেই ডেকে পই পই করে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে—আমানউল্লা চলল যাওয়ার তার শেষ ডর ভয় কেটে গিয়েছে। তবে এখন বাচ্চায়ে সকাও না বলে সম্মানভরে হবীবউল্লা খান বলে।

দুপুরবেলার বুলেটিনের খবর 'ইনায়েতউল্লা খান আর্ক মূর্গের ভিতর বসে আমানউল্লায় কাছ থেকে সাহায্যের প্রতীক্ষা করেছেন। বাচ্চা তাকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিয়েছে। না হলে সে কাবুল শহরের কাউকে ক্রান্ত রাখবে না—ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। ইনায়েতউল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কাবুলবাসীদের প্রচুর রাইফেল আর অপর্যাপ্ত বুলেট আর্কে, তাই দিয়ে তারা যদি আত্মরক্ষা না করতে পারে তবে এসব ভেড়ার পালের মরাই ভালো।'

মৌলানা বললেন, 'বাচ্চা এখন আর কাবুলের মহান্না-সর্গারদের কেয়ার করে না।' তারপর আবদুর রহমানকে পালিমেন্টি কায়দায় সলিমেন্টরি শুভালেন, 'আর্কে কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আছে? সৈন্যরা টিকতে পারবে কতদিন?' আবদুর রহমান কাঁচা ভিন্ডোমো—নোটিসের হুমকি দিল না। বলল, 'অন্তত ছয় মাস।'

তৃতীয় দিনের বুলেটিন 'বাচ্চা' বলেছে, ইনায়েতউল্লা যদি আত্মসমর্পণ না করেন তবে যে-সব আমীর-ওমরাহ সেপাই-সাত্তী তার সঙ্গে আর্কে আশ্রয় নিয়েছে, তাঁদের শত্রীপুত্রপরিবারকে সে খুন করবে। ইনায়েতউল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কুছ পরোয়া নেই।'

ফলতো প্রশ্ন, 'বাচ্চা দুর্গ আক্রমণ করছে না কেন?'
অবজ্ঞাসূচক 'উত্তর, 'রাইফেলের গুলী দিয়ে পাথরের দেয়াল ভাঙা যায় না।'

সে সন্ধ্যায় ব্রিটিশ লিগেশনের এক কেরানী প্রাপ্তে ভয়ে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। শহরে এসেছিলেন কি কার্জে; বাচ্চার ফৌজ দলে দলে শহরে ঢুকছিল বলে লিগেশনে ফিরে যেতে পারেননি। রাতে তার মুখে শুনলুম যে, দুর্গের ভিতরে বন্ধ আমীর-ওমরাহদের শত্রীপুত্রপরিবার দুর্গের বাইরে। ইনায়েতউল্লা পরিবার দুর্গের ভিতরে। আমীরগণ ও বাদশাহের স্বার্থ এখন আর সম্পূর্ণ এক নয়। আমীরগণ তাঁদের পরিবার বিচাযার জন্য আত্মসমর্পণ করতে চান। ইনায়েতউল্লা নাকি নিরাশ হয়ে বলেছেন, যে-সব আমীর-ওমরাহদের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছায় রাজা হয়েছিলেন, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন তিনি আর দুর্গ রক্ষা করতে রাজী নন।

আবদুর রহমান সভাস্থলে উপস্থিত ছিল। বলল, 'আমি শুনেছি, সেপাইরা দুর্গ রক্ষা করতে রাজী, যদিও তাদের পরিবার দুর্গের বাইরে। তারা বলেছে, 'উষাভাচার জ্ঞান আমানত

দিয়ে তো আর ফৌজে ঢুকিনি।' ভয় পেয়েছেন অফিসার আর আমীর-ওমরাহদের দল।

কেরানী বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু কোনটা খাটি কোনটা কুটা বুঝবার উপায় নেই। মোদ্দা কথা, ইনায়েতউল্লা সিংহাসন ত্যাগ করতে তৈরী, তবে তার শর্ত ঃ কোনো তৃতীয়পক্ষ যেন তিনি আর তার পরিবারকে নিরাপদে আফগানিস্তানের বাইরে নিয়ে যাবার ক্রিস্টিয়ানিটি না। স্যার ফ্রান্সিস রাজী হয়েছেন।'

আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'স্যার ফ্রান্সিসের কাছে প্রস্তাবটা পাড়ল কে?'
'বলা শক্ত। শোরবাজার, ইনায়েতউল্লা, বাচ্চা—থুড়ি—হবীবউল্লা খান—তিনজনের একজন, অথবা সকলে মিলে। এখন সেই কথাবার্তা চলছে।'

সেখানেই অনেকক্ষণ অবধি মৌলানা আর কেরানী সায়েবেতে আফগান রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক হল।

সকালবেলা আবদুর রহমান হাতে-সেঁকা ক্রটি, নুন আর বিনা দুধ চিনিতে চা দিয়ে গেল। আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভদ্রলোক কিছুই পশ্প করতে পারেননা না। প্রবাদ আছে, 'কাজীর বাড়ির বাঁদীও তিন কলম লিখতে পারে।' বুঝতে পারলুম, 'ব্রিটিশ রাজদূতবাসের কেরানীরা রাজভোগ খায়—এই দুর্ভিক্ষে?'

দুপুরের দিকে কেরানী সায়েবের সঙ্গে শহরে বেরলুম। বাচ্চার সেপাইয়ে সমস্ত শহর ভরে গিয়েছে। আর্কের পাশের বড় রাস্তায় তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি—তিনি লিগেশনে যাবেন, আমি বাড়ি ফিরব—এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই এক সঙ্গে শ' খানেক রাইফেল আমাদের চারপাশে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, রাস্তার লোকজন বাহাজনশূন্য হয়ে যে বেদিকে পারে সেদিকে ছুটছে। আশ্রয়ের সন্ধান নিশ্চয়ই, কিন্তু কে কোন দিকে যাচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য না করে। চতুর্দিকে বাচ্চার ডাকাতি, তাই সবাই ছুটেছে দিশেহারা হয়ে।

বাচ্চার প্রথম আক্রমণের দিনে শহরে যা দেখেছিলুম তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। সৈনিকার কাবুলী ভয় পেয়েছিল যেন বাবের ডাক শুনে এবারকার জাস হঠাৎ বাবের ধবার সামনে পড়ে যাবার। কেরানী সায়েব পেশাওয়ানের পাঠান। সাহসী বলে খ্যাতি আছে। তিনি পর্যন্ত আমাকে টেনে দিচ্ছে ছুটে চলছেন—মুশকিল—আনানই জানেন কোন দিক দিয়ে। পিশ দিয়ে গা ধোঁয়ে একটা ঘোড়া চলে গেল। নয়ানজুলিতে পড়তে পড়তে ভাকিয়ে দেখি, ঘোড়-সওয়ারের পা জিনের পদামে ধোঁয়ে গিয়ে মাথা নিচের দিকে ঝুলছে আর ঘোড়ার প্রতি গ্যালপের সঙ্গে সঙ্গে মাথা রাস্তার শানে ঠোঁকর খাচ্ছে।

ততক্ষণে রাস্তার মূর্-রিয়ালিস্টিক ছবিতার এলোপাতাড়ি দাগ আমার মনে কেমন যেন একটা আবছা অর্থ এনে দিয়েছে। কেরানী সায়েবের হাত থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে বালস করে দাঁড়িয়ে গেলুম। ছবিতার যে জিনিস আমার অবচেতন মন ততক্ষণে লক্ষ্য করে একটা অর্থ খাড়া করেছে, সে হচ্ছে যে ডাকুরা কাউকে মারার মতলবে, কোনো 'কথলে আম' বা পাইকারী কচু-কাটার তালো নয়—তারা গুলী ছুঁড়ছে আকাশের দিকে। কেরানী সায়েবের দৃষ্টিও সেদিকে আকর্ষণ করলুম।

ততক্ষণে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে শুধু বাচ্চার ডাকাত দল, কেরানী সায়েব আর আমি; বাদবাকী নয়ানজুলিতে, দোকানের বারাদায়া, না হয় কাবুল নদীর শক্ত বরফের উপর উঁচু পাড়ির গা ঘেঁষে।

তিন চার মিনিট ধরে গুলী চলল—আমরা কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আমার সবাই এক একজন করে আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এল। ডাকাতের দল ততক্ষণে হা হা করে হাসতে আরম্ভ করেছে—'তাদের 'শাদিয়ানা' শুনে কাবুলের লোক এরকম ধারা

ভয়পেয়ে গেল। 'কিসের শদিয়া'?' জানো না খবর, ইন্যোয়েতউল্লা তথৎ ছেড়ে দিয়ে হাওয়াই জাহাজে করে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন। তাই বাচ্চা—থুড়ি—বাদশাহ হবীবউল্লা খান হুকুম দিয়েছেন রাইফেল চালিয়ে 'শাদিয়ানা' বা বিজয়েল্লাস প্রকাশ করার জন্য।'

জিন্দাবাদ 'বাদশাহ' 'গাজী' হবীবউল্লা খান।

বর্বরদেশে নতুন দলপতি উদ্বলন বসলে নরবলি করার প্রথা আছে। আফগানিস্তানে এরকম প্রথা থাকার কথা নয়, তবু অনিচ্ছায় গোটা পাঁচকে নরবলি হয়ে গেল। 'শাদিয়ানা'র হাজার হাজার বুলেট আকাশ থেকে নামার সময় যাদের মাথায় পড়ল তাদের কেউ কেউ মরল—পুরু মীর আসলমী পাগড়ি মাথায় প্যাঁচানো ছিল না বলে।

পাগড়ি নিয়ে হেলাফেলা করতে নেই। গরীব আফগানের মামুলী পাগড়ি নিয়ে টানাচাঁচড়া করতে গিয়ে আমানউল্লার রাজমুকুট খসে পড়ল।

উনচালিশ

ডাকাত সোটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পড়ল।

মোন্সারা আশীর্বাদ করলেন।

পরদিন ফরমান বেরলো। তার মূল বক্তব্য, আমানউল্লা কাকির, কারণ সে ছেলেদের এলজেরা শেখাত, ভূগোল পড়াত, বলত পৃথিবী গোল। বিশ শতাব্দীতে এ রকম ফরমান বেরতে পারে সে কথা কেউ সহজ্ঞ বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বাচ্চার মত ডাকাত যখন তথৎ-নশীন হতে পারে তখন এরকম ফরমান আর অবিশ্বাস করার কোনো উপায় থাকে না। শুধু তাই নয়, ফরমানের তলায় মোন্সাদের সেই ছাড়াও দেখতে পেলুম সেই রয়েছে আমানউল্লার মস্ত্রীদের।

মীর আসলম বললেন, 'পেটের উপর সঙ্গীন ঠেকিয়ে সহিওলা আদায় করা হয়েছে না হলে বোলা, কোন্ মুখ লোক বাচ্চাকে বাদশাহী দেবার ফরমানে নাম সহি করতে পারে, রাগের চোটে তাঁর চোখ-মুখ তখন লাল হয়ে গিয়েছে, দাড়ি ডাইনে-বামে ছড়িয়ে পড়েছে। গর্জন করে বললেন, 'ওয়াজিব-উল-কল-প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যাকে দেখা মাত্র কতল করা সে কিনা বাদশাহ হল।'

আমি বললুম, 'আপনি যা বলছেন তা খুবই ঠিক; কিন্তু আশা করি এসব কথা যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো, সৈয়দ মুজতবা আলী, আমানউল্লার নিন্দা যখন আমি করছি তখন সকলের সামনেই করছি; বাচ্চায়ে সকাওয়ের বিরুদ্ধে যা বলবার তাও আমি প্রকাশ্যে বলি। তুমি কি ভাবছ কবুল শহরের মোন্সারা আমাকে চেনে না, ফরমানের তলায় আমার সহি লাগাতে পারলে ওরা খুশী হন না? কিন্তু ওরা ভালো করেই জানে যে, আমার বা হাত কেটে ফেললেও আমার ডান হাত সহি করবে না। ওরা ভালো করেই জানে যে, আমি ফতোয়া দিয়ে বসে আছি, "বাচ্চায়ে সকাও ওয়াজিব-উল-কল-অবশ্য বধা।"

মীর আসলম চলে যাওয়ার পর মৌলানা বললেন, 'যতদিন আফগানিস্তানে মীর আসলমের মত একটি লোকও বেঁচে থাকবেন ততদিন এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'হক কথা, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা এই বেলা একটু ভেবে নিলে ভালো হয় না?'

দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম; কখনো মুখ ফুটে কখনো যার যার আপন মনে। বিষয়ঃ বাচ্চা তার ফরমানে আমানউল্লা যে কাকির সে কথা সপ্রমাণ করে বলেছে, "এবং যেসব দিশী-বিদেশী মাস্টার প্রফেসর আমানউল্লাকে এ সব কর্মে সাহায্য করতো, তাদের ডিসমিস করা হল; স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল।"

শেষটায় মৌলানা বললেন, 'অত ভেবে কদু হবে। আমরা ছাড়া আরো লোকও তো ডিসমিস হয়েছে—দেখাই যাক না তারা কি করে।' মৌলানার বিশ্বাস দশটা গাধা মিললে একটি ঘোড়া হয়।

কিন্তু এসব নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা।

আবু হোসেন নাটক ঘারা দেখেছেন, তাঁরা হয়ত ভাবছেন যে, কাবুলে তখন জোর রগড়। কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় তখন আমীর ফকির সকলেরই রসকষ কাবুল নদীর জলের মত জমে গিয়ে বরফ হয়ে গিয়েছে। বাচ্চাও শহরবাসীকে সন্দেহের দোদুল দোলায় বেশিক্ষণ দোলালে না। হুকুম হলো আমানউল্লাহ মস্ত্রীদের ধরে নিয়ে এসো, আর তাদের বাড়ি লুণ্ঠ করা।

সে লুণ্ঠ কিস্তিতে কিস্তিতে হল। বাচ্চার খাস-পেয়ারারা প্রথম খবর পেয়েছিল বলে তারা প্রথম কিস্তিতে টাকা-পয়সা, গয়নাগাটা দামী টুকটাকি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় কিস্তিতে সাধারণ ডাকাতরা আসবাবপত্র, কাপেট, বাসন-বাসন, জামাকাপড় বেছে বেছে নিয়ে গেল, তৃতীয় কিস্তিতে আর সব ব্যক্তির মুখে উড়ে গেল—শেষটায় রাস্তার লোক কাঠের দরজা-জানালা পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গিয়ে শীত ভাঙলো।

মস্ত্রীদের বালি পায়ে বরফের উপর দাঁড় করিয়ে হরেকরকম সম্ভব অসম্ভব অত্যাচার করা হল গুপ্তদল বের করবার আশায়। তার বর্ণনা কোন্ কবুলের লোক পর্যন্ত শিউরে উঠেছিল—মৌলানা আর আমি শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলাম।

তারপর আমানউল্লার ইয়ারবর, ফৌজের অফিসারের পালা। বন্ধ দোর-জানালা ভেদ করে গাভীর রায়ে চিংকার আসত—ডাকু পড়েছে। সে আবার সরকারী ডাকু—তার সঙ্গে লড়াই করার উপায় নেই, তার হাত থেকে পালানবার পথ নেই।

কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেল—রাস্তার উপর শীতে জমে-যাওয়া রক্ত, উলঙ্গ মড়া, রায়ে ভীত নরনারীর আঁত চিংকার সবই সহ্য হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, অভ্যাস হল না শুধু শুকনো রুটি নুন আর বিনা দুধ চিনিতে চা খাওয়ার। মায়ের কথা মনে পড়ল; তিনি একদিন বলেছিলেন, চা-বাগানের কুলীরা যে প্রচুর পরিমাণে বিনা দুধ চিনিতে লিকার খায় সে পানের তৃপ্তির জন্য নয়, ক্ষুধা মারবার জন্য। দেখলুম অতি সত্যি কথা, কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কাবুলে ম্যালেরিয়া নেই, থাকলে তারপর চা-বাগানের কুলীর যা হয়, আমরাও তাই হত এবং তার পরমা গতি কোথায়, বাঙালীকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। মৌলানাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'না বেতে পেয়ে, বুলেট পেয়ে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে, এ তিন মার্গের ভিতর মরার পক্ষে কোনটা প্রশস্ততম বোলা তো।'

মৌলানা কবিতা আওড়ালে আরেক মৌলানার-কবি সাদীর—

চুন আহলো রফতুন কুনদ জানে পাক,
চি বর তথৎ মুরদন চি বর তথৎ থাক?

পরমাণু যাব প্রস্তুত হয় মহাপ্রস্থান তারে
একই মৃত্যু—সিংহাসনেতে অথবা ধূলির পরে।

বাচ্চার ফরমান জারির দিনসাতকে পরে ভারতীয়, ফরাসী, জার্মান শিক্ষক অধ্যাপকেরা এক ঘরোয়া সভায় স্থির করলেন, স্যার ফ্রান্সিসকে তাদের দুরবস্থা নিবেদন করে হাওয়াই জাহাজে করে ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য বন্দোবস্ত ডিক্কা করা।

অধ্যাপকেরা বললেন, কাবুল থেকে ফেরবার রাস্তা চতুর্দিকে বন্ধ: স্যার ফ্রান্সিস বললেন হ্যাঁ; অধ্যাপকেরা নিবেদন করলেন, কাবুলে কোনো ব্যাকক নেই বলে তাদের জমানো যা কিছু সম্ভল তা পেশাওয়ায় এবং সে পরস্যা আনবার কোনো উপায় নেই; স্যার ফ্রান্সিস বললে, হুঁ; অধ্যাপকেরা কাতর অনুনয়ে জানালেন, শ্রী-পরিবার নিয়ে তারা অনাহারে আছেন; সায়েব বললেন, অ; অধ্যাপকেরা মরীয়া হয়ে বললেন, এখানে থাকলে তিলে তিলে মৃত্যু; সায়েব বললেন, আ।

একদিকে ফুল্লরার বারমাসী, অন্যদিকে সায়েবের অ, আ করে বর্ণমালা পাঠ। ক্রাশ সিম্পসন ছেলে আর প্রথম ভাগের খোকাবুসু যেন একই ঘরে পড়াশোনা করছেন।

বর্ণমালা যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন সায়েব বললেন, 'এখানকার ব্রিটিশ লিগেশন ইংলেণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র। ভারতবাসীদের সুখ-সুবিধে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লিগেশনের কর্তব্য নয়। আমি যদি কিছু করতে পারি, তবে সেটা 'ফেবার' হিসেবে করব, আপনাদের কোনো রাইট নেই।'

যাত্রাগোবিন্দ দুর্যোধন দেখেছি। সায়েবের চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, না, কিছু কিছু গরমিল রয়েছে। দুর্যোধন 'ফেবার, রাইট' কোনো হিসেবেই পাঁচখানা গা দিতে রাজী হানি, হিনী 'ফেবারেল কনসিডারেশন' করতে রাজী আছেন।

এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ হলে হয়ত তিনি বগল বাড়িয়ে সুখের দেবার জন্য পাণ্ডবশিবিরে ছুটে যেতেন, কিন্তু আমার মনে পড়ল যুধিষ্ঠিরের কথা। একটি মিথ্যা কথা বলবার জন্যে তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। ভাবলুম, এদিকে দুর্যোধন, ওদিকে বাচ্চায়ে সকাও, এর মাঝখানে যদি সাহস সঞ্চয় করে একটিনাবের মত এই জীবনে সত্যি কথা বলে ফেলতে পারি তবে অন্তত একবাবের মত স্বর্ণ দর্শন লাভ হলে হতে পারে।

বললুম, 'হাওয়াই জাহাজগুলো ভারতীয় পরসায় কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তমখা যায়, পেশাওয়ায়ের বিমানঘাটি ভারতের নিজস্ব—এ অবস্থায় আমাদের কি কোনো হক নেই?' ব্রিটিশ লিগেশন যে ভারতীয় অর্থে তৈরী, সায়েব যে ভারতীয় নিমক খান, সেখকা আর অতটা করে বললুম না।

সায়েব ভয়ঙ্কর চটে গেলেন, অধ্যাপকরাও ভয় পেয়ে গেলেন। বুঝলুম, জীবনমরণের ব্যাপার—ভারতীয়েরা কোনো গতিতে দেশে ফিরে যেতে গেলে রক্ষা পান—মেহেরবানী, হক' নিয়ে নাইক তরু করে কোনো লাভ নেই। বললুম, 'আমি যা বলেছি, সে আমার ব্যক্তিগত মত। আমি নিজে কোনো 'ফেবার' চাইনে, কিন্তু আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেন আর পাঁচজনের স্বার্থে আঘাত না করে।'

এর পর কথা কাটাকাটি করে আর কোনো লাভ নেই। আমার যা বক্তব্য সায়েব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, আর সায়েবের বক্তব্য ভারতবাসীর কাছে কিছু নূতন নয়—'ফেবার' শব্দ দরখাস্তে যিনি যত ইনিয়ে-বিনিয়ে পারেন, তাঁকেই আমরা ভারতবর্ষে গেল একশ বছর ধরে ইংরিজীতে সুপণ্ডিত বলে সেলাম করে আসি।

সেই সন্ধ্যায়ই খবর পেলুম, যে সব ভারতবাসী যাদের ফিরে যেতে চান, তাঁদের একটা ফিরিশ্ত তৈরী করা হয়েছে। সায়েব স্বহস্তে আমাদের নামে চ্যারা কেটে দিয়েছেন।

আবদুর রহমান এখন শুধু আগুনের তদারকি করে। বাদাম নেই যে, খোসা ছাড়াবে,

কালি নেই যে, ভুতো পালিশ করবে। না খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে, দেখলে দুখ হয়।

মৌলানা শুভে গিয়েছেন। আবদুর রহমান ঘরে ঢুকল। আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, সব দিকে তো জাকাতের পাল রাস্তা বন্ধ করে আছে। পানিশিরে ঘাবার উপায় আছে?'

আবদুর রহমান আমার দু'হাত আপন হাতে তুলে নিয়ে শুধ চুমো খায়, আর চোখে চোখে ধরে; বলে 'সেই ভালো ভালো, সেই ভালো। চলুন আমরা দেশে।' এরকম শুকনো রুটি আর নুন খেলে দুদিন বাদে আপনি আর বিজানা থেকে উঠতে পারবেন না। তার চেয়ে ভালো খাওয়ার জিনিস আমাদেরই বাড়িতে আছে। কিছু না হোক, বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, আঞ্জীর, মোলায়েম পনীর, আর তজ্জুর, আমার নিজের তিনটে দুখা আছে। আর একটি ধান, জোরে দেড় মাস, তারপর বরফ গলতে আরম্ভ করলেই আপনাকে নদী থেকে মাছ ধরে এনে খাওয়াব। ভেজে, সেক, পুড়িয়ে যেরকম আপনার ভালো লাগে। আপনি আমাকে মাছের কত গল্প বলেছেন, আমি আপনাকে খাইয়ে দেখাব। আরামে শোবেন, ঘুমবেন, জানলা দিয়ে দেখবেন—'

আবদুর রহমানকে বাধা দিতে কষ্টবোধ হল। বেচারী অনেকদিন পরে অধার প্রাণ খুলে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, পানিশিরের পুরানো স্বপ্নের নূতন রঙ লাগিয়ে আমার চোখে চটক লাগাবার চেষ্টা করেছে; তার মাঝখানে জোয়ের কাকের কক্ষ কা-কা করে তার মুখ-স্বপ্ন কেটে ফেলতে অত্যন্ত বাধা বাধে ঠেকল। বললুম, 'না, আবদুর রহমান, আমি যা না, আমি বলছি, তুমি চলে যাও। জানো তো আমরা ঢাকারী গেছে, তোমাকে আইনে ঘোরতর আশ্রয় দেবে। ডাল-চাল ফুরিয়ে গিয়ে গমে এসে ঠেকেছে, তাও তো আর বেশী দিন চলবে না। তুমি বাড়ি চলে যাও, খুশা যদি ফের সুদিন করেন তবে আবার দেখা হবে।'

ব্যাপ্তি বুঝতে আবদুর রহমানের একটি সময় লাগল। যখন বুঝল, তখন চুপ করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমারও মন ব্যাপ্র হয়ে গেল, কিন্তু করিই বা কি? আবদুর রহমানের সঙ্গে বহু সন্ধ্যা বহু যামিনী কাটিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, সে যদি নিজের থেকে কোনো জিনিস না বাসে, তবে আমার যুক্তিতর্ক তার মনের কোনো কোনো ঠাঁই পায় না। আমরা বাধ্যস্তা যে তার আদর্শই পশ্চদ হয়নি, সেটা বুঝতে পারলুম, কিন্তু আমি আশা করেছিলাম, সে আপত্তি জানাবে, আমি তাহলে তর্কাতর্কি করে তাকে যাকিনটা শায়েস্তা করে নিয়ে আসব। দেখলুম তা নয়, সরল লোক আর সোজা সুপারি গাছে মিল রয়েছে; একবার পা হড়কাতে আপত্তি-অজুহাদের শাখা-প্রশাখা নেই বলে সোজা ভূমিতে অবতরণ।

যাকিনফশ পরে নিজের থেকেই ঘরে ফিরে এল। মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি নিজের হাতে মেপে সকালবেলা দুমুঠো আটা দেবেন। আমার তাইতই চলবে।'

কি করে লোকটাকে বোঝাবে যে, আমার অজানা নয় সে মাসখানেক ধরে দুমুঠো আটা দিয়েই দুবেলা চালাচ্ছে। আর খাবারের কথাই তো আসল কথা নয়—আমার প্রস্তাবে যে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করবে, সেটা জানার কি করে? যুক্তিতর্ক তো বৃথা-পূর্বই বলেছি, ভাবলুম, মৌলানাকে ডাকি। কিন্তু ডাকতে হল না। আবদুর রহমান বলল, 'যখন সবকিছু পাওয়া যেত, তখন আমি এখানে যা খেয়েছি, আমার বাবা তার শস্তর বাড়িতেও সেরকম খায়নি।' তারপর বেশ একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'আর আজ কিছু জুটছে না বলে আমাকে খেদিয়ে দিত চান? আমি কি এতই নিমকহরাম?'

আনেক কিছু বলল। কিছুটা যুক্তি, বেশীর ভাগ জীবনশ্রুতি, অক্ষপাতিস্তর ভংগনা, সবকিছু ছাপিয়ে অভিমানে। কথনো বলে, 'দেবশির করিয়ে দেবনি', কখনো বলে, 'নূতন পেপ কিনে দেবনি—কম্বুলের কটা সর্দারের ওরকম লেপ আছে, আমি গেলে বাড়ি পাহারা দেবে কে,

আমাকে তাড়িয়ে দেবার হুক আপনার সম্পূর্ণ আছে— আপনার আমি কি খেদমত করতে পেরেছি ?

যেন পানশিরের বরফপাত। গাদা-গাদা, পাঁজা-পাঁজা। আমি যেন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, আর আমার উপর সে বরফ জমে উঠেছে। আবদুর রহমানই আমার প্রথম পরিচয়ের দিন বলেছিল, তখন নাকি সেই বরফ-আস্তরণের তিতর বেশ গম্ভীর হয়। আমিও আরাম বোধ করলুম।

কিন্তু না খেতে পেয়ে আবদুর রহমানের পানশিরী তাকত মিহিয়ে গিয়েছে। সাতদিন ধরে বরফ পড়ল না—মিনিটখানেক বর্ণকণ্ঠেই আবদুর রহমান খেয়ে গেল। আমি বললুম, 'তা তো বাটেই, তুমি চলে গেলে আমাকে বাঁচাবে কে ? অতীত ভেবে বেশিদি।'।

আবদুর রহমান তদগেই খুশ। সরল লোককে নিয়ে এই হল মস্ত সুবিধে। তদুনি হাসিমুখে আগুনের তদারকিতে বসে গেল।

তারপর মন থেকে যে শেষ গ্লানিটুকু কেটে গিয়েছে সেটা পরিস্কার বুঝতে পারলুম শুতে যাবার সময়। ভোষকের তলায় লেপ গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'জানেন, সায়েব, আমি যদি বাড়ি চলে যাই তবে বাবা কি করবে ? প্রথম আমার কাছ থেকে একটা বুলেটের দাম চেয়ে নেবে ; তারপর আমাকে গুলী করে মারবে। কতবার আমাকে বলেছে, 'তোমার মত হতভাগাকে মারবার জন্য যে গাঁটের পয়সায় বুলেট কেনে সে তোর চেয়ে হতভাগা'।

আমি বললুম, 'ও, তাই বুঝি তুমি পানশিরে যেতে চাও না ? প্রাণের ভয়ে ?'

আবদুর রহমান প্রথমটায় ধতমত খেয়ে গেল। তারপর হাসল। আমারও হাসি পেল—যে আবদুর রহমান এতদিন ধরে শুষ্ক কাষ্ঠে তিষ্ঠিত অগ্নি রূপ ধারণ করে বিরাজ করত আমার আলবাল-সিঙ্কনে সে যে একদিন রসবোধকিশলয়ে মুকুলিত হয়ে সরসতরুরব হতে সে আশা করিনি।

আবদুর রহমান একখানা খোলা-চিঠি দিয়ে গেল ; উপরে আমানউল্লাহর পলায়নের তারিখ।

কমরত ব শিকান—

এতদিন বাদে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আগা আহমদের মাইনের পাঁচ বছরের জমানো তিন শ' টাকা আর তার ভাইয়ের রাইফেল-লেপাট মেরে অগ্নিদী মুহুরে চললুম। সেখানে গিয়ে পিতৃ-পিতামহের ব্যবসা ফাঁদব। সন্মতে পাই খাইবারপাসের ইংরেজ অফিসার পাকড়ে পাকড়ে খালাসীরা পয়সা আদায় করার প্রাচীন ব্যবসা উপযুক্ত লোকের অভাবে অত্যন্ত দুর্বলস্থায় পাড়েছে।

কিন্তু আচ্ছা হিরঞ্জী জানেনওয়লা একজন দোভাষীর আমার প্রয়োজন—আমার হিরঞ্জী বিশেষ তো জান। তোমার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে তবে পত্রপাঠ জলালাবাদের বাজারে এসে আমার অনুসন্ধান করো। মাইনে ? কাবুলে এক বছরে যা কামাও, আমি এক মাসে তোমাকে তাই দেব। কাবুলের ডাকাতের চাকর হওয়ার চেয়ে আমার বেয়াদব হয়ে ইমান-হিনসাফে কামানো পয়সার বখরাবদার হওয়া ঢের ভালো।

আমানউল্লাহ নেই—তবু ফী আমানিরা।

দোস্ত মুহম্মদ

* 'আমানউল্লাহ' কথার অর্থ 'আম্রার আমানত' এবং 'ফী আমানিরা' কথার অর্থ (তোমাকে) আম্রার আমানতে রাখলুম।

পুত্র। আগা আহমদ সঙ্গে আছে। কাঁপে আমানউল্লাহর বিনি করা একখানা উৎকৃষ্ট মাইজার রাইফেল।

রাস্তা হয়ে ভিঁটিওয়ালার ডাকাত ছেলে ইচ্ছাঅনিচ্ছায় রাজপ্রাসদে কি রঞ্জনস করল তার গল্প আস্তে আস্তে বাতায়ময় ছড়াতে আরম্ভ করল। আধুনিক ঐপনাসিকের বালীধপ্পের কাপনিক ডাইনিজরমে পাড়ার্থেয়ে ছেলে যা করে তারই রাজসম্প্রকরণ। নৃতনর কিছু নেই—তবে একটা গল্প আমার বড় ভালো লাগল। মৌলানার কপি রাইট।

আমানউল্লাহ লণ্ডনে পঞ্চম জর্জের সঙ্গে যে রোলস-রয়েস চড়ে ক্যা-কাওয়াজ পালাপরবে যেতেন রাজা জর্জ সেই বজ্রবার মত মোটার আমানউল্লাহকে বিদায়-ভেট দেন। সে গাড়ি রাস্তাসের মত তলে তলে বেলে আমানউল্লাহ পালাবার সময় সেখানা কাবুলে ফেলে যান।

বাচ্চা রাজা হয়ে বিশেষ করে সেই মোটারই পাঠল বাগ্যগেয়ে বড়কে নিয়ে আসবার জন্য। বউ নাকি তখন বাচ্চার বাচ্চার মাথার উকুন বাছছিল। সারা গায়ের ফলফুলের মাঝখানে বাচ্চার বউ নাকি ডাইভারকে বলল, 'তোমার মনিবকে নিয়ে বোলো, নিজে এসে আমাকে খচ্চরে বসিয়ে থাকি নিশে যায়।'

দিমিঞ্জর করে বুদ্ধদেব যখন কপিলবস্ত্র ফিরেছিলেন তখন যশোধরা এমনি ধারা অভিমান করেছিলেন।

চল্লিশ

ফরাসাডাণ্ডার জরিপেও বুড়ি, গরদের পাঞ্জাবী আর ফুরফুরে রেশমী উড়ুনী পড়ে বসে আছি। কব্জিতে গোড়ে, গোঁফে অতর। চাকর ট্যান্সি আনতে গিয়েছে—বায়স্কেপে যাব।

সত্যি নয়, তুলনা দিয়ে বলছি।

তখন যেমন ট্যান্সির অপেক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে মন দেওয়া যায় না আমাদের অবস্থা হল তখন তাই। তফাত শুধু এই, স্যার ফ্রান্সিসের হাতে হাওয়াই ট্যান্সি রয়েছে—কিন্তু সাকেরবেলা শিখ ডাইভার যে রকম মদমস্ত হয়ে 'চমক দুইজা রাজা কইয়া, এজ্ঞা চিঙ্কর দিয়া' বলে 'নই জায়েকো', সায়েব তেমনই বাখিচারণপ্রমত্ত হয়ে বলছেন—চুলায় যাকগে কি বলছেন।

অপেক্ষা করে করে একমাস কাটিয়ে দিয়েছি।

চা ফুরিয়ে গিয়েছে—ছুধা মারবার আর কোনো দাওয়াই নেই। এখন শুধু রুটি আর নুন—নুন আর রুটি। রুটিতে প্রচুর পরিমাণ নুন দিলে শুধু রুটিতেই চলে কিন্তু ভোজনের পদ বাড়াবার জন্য আবদুর রহমান নুন রুটি আলাদা আলাদা করে পরিবেশন করত।

সপ্তাহ তিনেক হল বেনগোল সায়েব আরোপ্পেলন করে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন। পূর্বই বলেছি, তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলে কি হয়। পাসপোর্টখানা তো ফরাসী দেশে—এবং তার রঙটা তো সাদা। তাই ভারতীয় বিমানে তিনি জায়গা পেলেন না। বেহাতে। আমাদে তাতে বিন্দুমাত্র দুখ নেই কিন্তু সব ফরাসীরা জানা তো আর এরকম দরাজর্ডিল হতে পারব না।

যাবার আগের দিন বেনগো বাড়িতে এসে মৌলানা আর আমাকে গোপনে এক টিন ফরাসী তরকারি দিয়ে যান—সার্ডিন টিনের সাইজ। বৎকাল ধরে রুটি ভিন্ন অন্য কোনো বস্ত্র পেটে পড়েনি; মৌলানাকে আমাত সেই তরকারি গো-প্রাসে গোপ্তেলার পদ্ধতিতে খেয়ে পেটের অসুখে সপ্তাহখানেক ভুগলুম। আমাদের ভুগুতি অনেকটা গরীব চাবীর ম্যালেরিয়ায় ভোগার

মত হল। চাষী যে রকম ভোগার সময় বিলম্বন বুঝতে পারে কৃষিনিদ্রা ফুটনিদ্রা কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই, সাতদিন পোত ভরে খেতে পেলে দুনিয়ার কাজে জ্বর কেড়ে ফেলে উঠতে পারবে, আমরা ভেমন ঠিক জানাই, তিনদিন পোত ভরে খেতে পেলে আমাদেরও পেটের অশুখ আমানউল্লাহর সৈন্যবাহিনীর মত কপূর হয়ে উবে যাবে।

সেই আনহার আর অশুখের দরুন মৌলানা আর আমার মেজাজ তখন এমনি ভিন্নিচ্ছা হয়ে গিয়েছে যে, বেরালটা কার্পেটের উপর দিয়ে ছেঁটে খেলে তার শব্দে লাক দিয়ে উঠি (অথচ শব্দ্য জিনিসটা এমনি অদ্ভুত যে, বন্দুকগুলীর শব্দে আমাদের নিভা ভগ্ন হয় না), কথায় কথায় দু'জনাতে তক লাগে, মৌলানার দিকে তাকালেই আমার মনে হয় ওরকম জড়লী নাড়ি মানুষ রাখে তখন, মৌলানা আমার চেহারা সম্বন্ধে কি ভাবনো জানিনে, তবে প্রকাশ করলে খুব সম্ভব খুশনুগ্ন হয়ে যেত। মৌলানা পাঞ্জাবী, কিন্তু আমিও তো বাঙালি।

মৌলানা লোকটা ভারী কুর্কট করে। আমি যা বললুম সে কথা তাবৎ দুনিয়া সৃষ্টির আদিম কাছ থেকে স্বীকার করে আসছে। আমি বললুম, 'সরু চালের তাত আর ইলিশ মাছ ভাতার চেয়ে উপাদেয় খাদ্য আর কিছুই হতে পারে না।' মুখ বলে কিনা বিরায়ানী-কুর্মা তার চেয়ে অনেক ভালো। পাঞ্জাবীর সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিকতার আর কি উদাহরণ দিই বলুন। শাস্তিনিকেতনে থেকেও লোকটা মানুষ হল না। যে নারায়ণ ইলিশ মাছের অপমান করে তার মুখশ্রদ্ধা করা মহাপাপ, অথচ দেখুন, বাঙালীর চরির কী উদার, কী মহান :-আমি মৌলানার সঙ্গে মাত্র তিনদিন কথা বন্ধ করে ছিলাম।

আর শীতটা যা পড়েছিল। বায়স্কেপে উত্তর গরমের ছোজার ফুটি বর্ণনা দেখা যায়, কিন্তু মারাত্মক শীতের বয়ান তার তুলনায় বহুৎ কম। কারণ বায়স্কেপ, বানানো হয় প্রধানত সাবেবসুদের জন্য আর তেনারা শীতের তরুলিফ বাবতে ওকিবহাল, কাজেই সে-জিনিস তাঁদের দেখিয়ে বস-আপিস ভরবে কেন? আর যদি বা দেখানো হয় তবে শীতের সঙ্গে হামেশাই ঝড় বা ব্লিভার্ড জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে যেমন কালবৈশাখী বিপজ্জনক হলেও তার সঙ্গে দিনের পর দিনের ১১২ ডিগ্রীর অত্যচারের তুলনা হয় না, তেমনি বরফের ঝড়ের চেয়েও মারাত্মক দিনের পর দিনের ১০ ডিগ্রীর অত্যচার।

জামা ধুয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দিলেন। জামার জল জমে বরফ হল, রোদ্দুরে সে জল শুকানো দুইরকম বরফ পরন্ত গলল না। রোদ থাকলেই টেম্পারেচার ফ্রিজিভের উপরে ওঠে না। জমাতা জমে তখন এমনি শব্দ হয়ে গিয়েছে, যে, এক কোণে ধরে রাখলে সমস্ত জামাটা খাড়া হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে এনে আগুনের কাছে ধরলে পর জামা হুসে গিয়ে জ্বলুথু হয়।

বলবেন বানিয়ে বলছি, কিন্তু ভিশে ভ্রমণের হলপ, দোতারা থেকে থুথু ফেললে সে থুথু মাটি পৌছার পরেই জমে গিয়ে পঁজা বরফের মত হয়ে যায়। আবদুর রহমান একদিন দুটো পেঁয়াজ খোঁগাড় করে এনেছিল—বুদায় মানুষ চুরি না ডাকাতি করে—কেটে দেবি পেঁয়াজের রস জমে গিয়ে পরতে পরতে বরফের গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।

সেই শীতে জ্বালানী কাঠ ফুরাল।

বাইরাত আবদুর রহমান দিল বেলা বারোটার সময়। বাইরের কড়া রৌদ্র তখন বরফের উপর পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, আমরা কিন্তু সে-সংবাদ শুনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলুম। সে সবেও টেম্পারেচার তখন ফ্রিজিঙপয়েন্টের বড় নিচে।

সে রাতে গরম বানিয়ান, ফুদোলের শাট, পুন-ওভার, কোট, ইস্তক ওভারকোট পরে গুলুম। উপরে দুখানা লেপ ও একখানা কাপোট। মৌলানা তাঁর প্রিয়তম গান ধরলেন,

'দারগা ছাড়াপায়ে
হলয়া হুয়ায় হানো'

আমি সাধারণত বেসুদো পোঁ ধরি। সে রাতে পারলুম না, আমার দাঁতে দাঁতে করতাল বাজছে।

ভানালার ফাঁক দিয়ে ব্যাভাস ঢুকে পল সারিয়ে দিল। আকাশ তারায় তারায় ভরা। রবীন্দ্রনাথ উপাধা দিয়ে বলেছেন,

'আমার ছিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যা তারায় লুকিয়ে মেঘের কাঁকে,
সন্ধ্যানীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার আসে।'

ফরাসী কবি অন্য তুলনা দিয়েছেন; আকাশের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে তারা হয়ে গিয়েছে। আরেক নাম-না-জানা বিদেশী কবি বলছেন; মৃত্যু ধরণীর কবিনের উপর সাজানো মোমবাতি গলে-যাওয়া জমে-ওঠা ফোঁটা ফোঁটা মোম তারা হয়ে গিয়েছে।

সব বাজে বাজে হলনা, বাজে বাজে কাব্যি।

হে দিগম্বর বোমকমল, তোমারা নীলাম্বরদের নীলকম্পল যে লক্ষ লক্ষ তারার ফুটোয় কাঁজরা হয়ে গিয়েছে। তাই কি তুমিও আমারই মতন শীতে কাঁপছ? কাবুলে যে শাশান আলিয়েছ তার আগুন পোয়াতে পারো না?

তিনদিন তিনরাতির লেপের তলা থেকে পারতপক্ষে বেরইনি। চতুর্থ দিনে আবদুর রহমান অনুন্স করে বলল, 'ওরকম একটানা শুয়ে থাকলে শরীর ভেঙে পড়বে সাবেব; একটু চলাফেরা করুন, গা গরম হবে।'

আমাদের দেশের গরীব কেহানীকে যে রকম ডাক্তার প্রাতঃভ্রমণ করার উপদেশ দেয়। গরীব কেহানীই মতন আমি টি চি করে বললুম, 'বহু কিম্বে পায় যে। শুয়ে থাকলে কিম্বে কম পায়।'

ডাকাতি করলে আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব এ কথা আবদুর রহমান জানত বলেই সে তখনো রাইফেল নিয়ে রাজভোগের সন্ধানে বেরোয়নি। আবদুর রহমান মাথা নিচু করে চুপ করে চলে গেল।

বেড়াল পারতপক্ষে বাস্তবতা ছাড়ে না। তিনদিন ধরে আমার বেড়াল দুটো না-পাশা। তার থেকে বুললুম, আমার প্রতিবেশীর নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালো খাওয়ানোয় করছে। তারা বিচ্ছল, রাষ্ট্রবিদগ্ধে ওকিবহাল। গোলমালের গোড়ার দিকেই সবকিছু কিনে রেখেছিল।

শীতের দেশে নাকি হাতী বেশীদিন বাঁচে না। অবু আমানউল্লাহ শখ করে একটা হাতী পুনেছিলেন। কাবুলে কলাগাছ আনারস গাছ বনাবাদাও নেই বলে সে কালো হাতীকে পুনেতে প্রায় সাদা হাতী পোষার খচাই লাগত। কাবুলে তখন কাঠের অভাব; তাই হাতী-ঘরে আর আগুন জ্বালানো হত না। বাচ্চার ডাকাত ভাই-বোরাদরের শখ চেপেছে হাতী চাপার। সেই দুদাত শীতে তারা হাতীকে বের করেছে চড়ে নগরপ্রদক্ষিণ করার জন্য। তাকিয়ে দেখি হাতীর চোখে কোণ থেকে লম্বা লম্বা আইসিকল বা বরফের ঝুঁত ঝলছে—হাতীর চোখের আঁদতা জমে গিয়ে।

আমি জানতুম, হাতীটা ত্রিপুরা থেকে কেনা হয়েছিল। ত্রিপুরার সঙ্গে সিলেটের বিদ্যে-সাদী লেন-দেন বন্ধকালের—সিলেটের জমিদার খুন করে ফেরারী হলে চিরকাল

ত্রিপুরার পাহাড় টিপরাঙ্গের মাঠে আশ্রয় নিয়েছে।

হাতীরা কষ্ট আমার বৃকে বাজলো। তখন মনে পড়ল রোমানের চাষা বন্দুকগুলি অগ্রহা করে ট্রেনের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, জখমী যোড়াকে স্থলি করে মেঝে তাকে তার যন্ত্রণা খেমে নিশ্চুতি দোবার জন্য।

কুকুরের চোখেমুখে বেদনা সহজেই ধরা পড়ে। হাতীকে কাতরা হতে কেউ কখনো দেখেনি, তাই তার বেদনাবোধ যখন প্রকাশ পায় তখন সে দৃশ্য বড় নিদারুণ।

আমানউল্লাহর বিস্তার মোটারগাড়ি ছিল। বাচ্চার সঙ্গীসখীরা সেই মোটর গুলো চড়ে চড়ে তিনিদিনের ভিতর সব পেটল শেষ করে দিল। শহরের সর্বত্র এখন দামী দামী মোটর পড়ে আছে—যেখানে যে গাড়ির পেটল শেষ হয়েছে বাচার ইয়াররা সেখানেই সে গাড়ি ফেল চলে দিয়েছে। জনালায় কাঁচ পর্যন্ত তুলে দিয়ে যায় নি বলে গাড়িতে বৃষ্টি বরফ ঢুকছে; পাড়ার ছেলপিলেরা গাড়ি নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করতে দু'একটা নরমায় কাহ হয়ে পড়ে আছে।

আমাদের বাড়ির সামনে একখানা আদেকল্লা বীঘুইক বলমল করছে। আবদুর রহমানের ভারী শব্দ গাড়িখানা বাড়ির ভিতরে ঢেলে আনার। বিদ্রোহ শেষ হলে চড়বার ভরসা সে রাখে।

আমানউল্লাহ জো সেই কোন ফরাসী রাজার মত 'আপ্রে মণ্ডা ল্য দেলুজ' (হুম গয়া জগ গয়া) বলে কলদাহার পালালেন,—আবদুর রহমান বলে, 'আপ্রে ল্য দেলুজ, অতমবিল' (বন্নার পর পলিমাটি)।

আমাদের কাছে যেমন সব ব্যাটা গোয়ার মুখ একরকম মনে হয়, আবদুর রহমানের কাছে তেমন সব মোটরের এক চেহারা। কিছুতেই বীকার করবে না যে, 'দেলুজের' পর রাজবন্দির লোক চোরাই-গাড়ির সন্ধান বেঁচিয়ে গাড়িখানা চিনে নিয়ে সেখানা পুরবে গারাজে আর তাকে পুরবে জেলে।

অপটিমিস্ট।

কাবুলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। অনেকটা শিলগুর মত। হলে সবাই ছুটে ঘর থেকে বেরায়।

দুপুরবেলা জোর ভূমিকম্প হল। আমি আর মৌলানা দুই খাটে শুয়ে ধুকছি। কেউ খাট ছেড়ে বেকলুম না।

একচল্লিশ

যেন অতীহীন মহাকাল ভ্যাজর ভ্যাজর করার পর এক ভাষণবিলাসী আপন বক্তৃতা শেষ করে বললেন, 'আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় অজানাতে নষ্ট করে ফেলছি বলে মাপ চাইছি। আমার সামনে ঘড়ি ছিল না বলে সময়ে আদালত রাখতে পারিনি।' শ্রোতাদের একজন চটে গিয়ে বলল, 'কিন্তু সামনের দেয়ালের যে ক্যালেন্ডার ছিল, তার কি? সেদিকে তাকালে না কেন?'

মৌলানা আর আমি বহুদিন হল ক্যালেন্ডারের দিকে তাকানো বন্ধ করে দিয়েছি। তবু ভ্রমে-যাওয়া হাড় ক্ষণে ক্ষণে সূর্যগ্রহণে দেয় যে, এখনো শীতকাল।

ইতিমধ্যে ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি বিদেশী পুরুষেরা ভারতীয় স্লেমে কাবুল ত্যাগ

করেছেন—স্ট্রীলোকেরা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন। শেষটায় গুলুম ভারতীয় পুরুষদের কেউ কেউ স্যার ফ্রান্সিসের ফেবারে বদশে চলে যেতে পেরেছেন। আমার নামে তো চার্যা, কাজেই মৌলানাকে বললুম, তিনি যদি স্লেমে চাপবার মোক্ষ পান তবে যেম পিছন পানো না তাঁকায়ে যুদ্ধিঙ্গিরের মত সোজা পিতৃলোক চলে যান। অনুজ যদি অনুগ হবার সুবিধে না পায় তবে তার জন্য আপেকা করলে ফল পিতৃলোকে প্রত্যাগমন না হয়ে পিতৃলোকে মহাপ্রাণাঘাত হবে। চাপক্য বলেছেন, উৎসবে বাসনে এবং রাষ্ট্রবিলম্বে যে দাঁড়ায় সে বান্ধব। এক্ষেত্রে সে—নীতি প্রযোজ্য নয়, কারণ চাপক্য স্বদেশে রাষ্ট্রবিলম্বে কথাই ভাবছিলেন, বিদেশের চক্রবর্তের খাচার ইন্দুরের মত না খেয়ে মরবার উপদেশ দেননি।

অল্প অল্প আরের অবচেতন অবস্থায় দেখি দরজা দিয়ে উর্দিয়ার এক বিরাট মূর্তি ঘরে ঢুকছে। দুর্বল শরীর, মনও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ভাবলুম বাচ্চায়ে সকাওয়ার জল্লাদই হবে; আমার সন্ধানে এখন আর আসবে কে?

নাঃ। জনন রাজদূতবাসের পিয়ন কিন্তু আমার কাছে কেন? ওদের সঙ্গে তো আমার কোনো দহরমমহরম নেই। জার্মান রাজদূত আমাকে এই দুর্দিনে নিমন্ত্রণই বা করবেন কেন? আবার পলপই করে লিখেছেন, বজ্র জরুরী এবং পত্রপাঠ যেন আসি।

দুমাইল বরফ ভেঙে জার্মান রাজদূতবাস। যাই কি করে, আর গিয়ে হবেই বা কি? কোনো ক্ষতি যে হতে পারে না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কারণ আমি বসে আছি সিঁড়ির শেষ ধাপে, আমাকে লাখি মারলেও এর নিচে আমি নামতে পারি না।

শেষটায় মৌলানার ধাক্কাধাক্কিতে রুগুনা হলুম।

জনন রাজদূতবাস যাবার পথ সুদিনে অভিসারিকাদের পক্ষে বড় প্রশস্ত—নির্জন, এবং বনবীকারের ঘনপল্লবে মর্মরিত। রাস্তার একপাশ দিয়ে কাবুল নদী একেবেঁকে চলে গিয়েছে; তারই বসে সিক্ত হয়ে থেওয়া নর-কুণ্ড, হোথায় পক্ষ-চিনার। নিতান্ত অরসিকজনও কম্পনা করে নিতে পারে যে লুকাচুরি রসকলির জন্য এর চেয়ে উত্তম বন্দোবস্ত মানুষ চেষ্টা করেও করতে পারত না।

কিন্তু এ—দুর্দিনে সে—রাজা চোরজাকাতের বোহেশ, পদাতিকের গোরস্তান। আবদুর রহমান বেরবার সময় ছোট পিস্তলটা জোর করে ওয়ারকাটের পকেটে পুরে দিয়েছিল। নিতান্ত ফিলেল চোর হলে এটা কাজে লেগে যেতেও পারে।

এবার রাস্তায় হঠাৎ হয় সগৰ্বে, সদস্ত ভাইনে বায়ে না তাকিয়ে মাথা খাড়া করে। কিন্তু আমার সে তাকত কোথায়? তাই শিথ দিয়ে দিয়ে চললুম এমনি কায়ালায় যেন আমি নিতিনিভি এ—পথ দিয়ে যাওয়া আসা করি।

পথের শেষে পাহাড়। বেশ উচুতে রাজদূতবাস। সে—চড়াই ভেঙে যখন শেষটায় রাজদূতের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম তখন আমি ভিত্তে ন্যাকড়ার মত নেতিয়ে পড়েছি। রাজদূত মুখের কাছে বাড়ির গোলশ ধরলেন। এত দুঃখেও আমার হাসি পেল, মুসলমান মরবার পূর্বে মদ খাওয়া ছাড়ে, আমি মরবার আগে মদ খবর নাকি? মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালুম।

জার্মান কাজের লোক। ভগিনা না করেই বললেন, 'বেনওয়া সায়েবের মুখে শোনা, আপনি নাকি জার্মনিতে পড়েই যাবার জন্য টাকা কামাতে এদেশে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ'।

'আপনার সব টাকা নাকি এক ভারতীয় মহাজনের কাছে জমা ছিল, এবং সে নাকি বিপ্লবে মারা যাওয়ায় আপনার সব টাকা খোয়া গিয়েছে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ'।

রাজদূত খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর ভিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি বিশেষ করে কেন জমিনতেই যেতে চেয়েছিলেন, বলুন তো।’

‘আমি বললুম, “শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে কাজ করে ও বিশ্বভারতীর বিদেশী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষার জন্য আমার পক্ষে জমিনই সবচেয়ে ভালো হবে।’

এ ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল, সেটা বললুম না।

রাজদূতেরা কখন খুশী কখন বেজার হয় সেটা বোঝা গেলে নাকি তাঁদের চাকরী যায়। ব্যতীতই আমি তাঁর প্রশ্নের কারণের তাল ধরতে না পেরে, ব্যাঁতবলা কোলে নিয়ে বসে রইলুম।

বললেন, ‘আপনি ভাববেন না এই কাঁট খবর সঠিক জানবার জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনিয়েছি। আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই, আমাদের যদি আপনার জন্ম যোগ্যর কোনো সুবিধা হয় তবে আমি আপনাকে সে সাহায্য আনন্দের সঙ্গে করতে প্রস্তুত। আপনি বলুন, আমি কি প্রকারে আপনার সাহায্য করতে পারি?’

আমি অনেক ধন্যবাদ জানালুম। রাজদূত উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন, কিন্তু আমার চোখে কোনো পয়সাও পড়ছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—খোদা আছেন, গুরু আছেন—বললুম, ‘জমিন সরকার প্রতি বৎসর দু’-একটি ভারতীয়কে জমিনতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেন। তারই একটা যদি যোগাড় করে দিতে পারেন তবে—’

বাধা দিয়ে রাজদূত বললেন, ‘জমিন সরকার যদি একটি মাত্র বৃত্তি একজন বিদেশীকেও দেন তবে আপন সেটি পাবেন, আমি কথা দিচ্ছি।’

আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, ‘পোয়েট টেগোরের কবিত্বে আমি পড়েছি, তিনি খুব সম্ভব আমাকে সাটিফিকেট দিতে রাজী হবেন।’

রাজদূত বললেন, ‘তাহলে আপনি এত কষ্ট করে কাবুল এলেন কেন? টেগোরকে জমিনতে কে না চেনে?’

আমি বললুম, ‘কিন্তু পোয়েট সবাইকে অকাতরে সাটিফিকেট দেন। এমন কি এক তেগ-কোম্পানীকে পর্যন্ত সাটিফিকেট দিয়েছেন যে, তাদের তেল ব্যবহার করলে নাকি টাকে চুল গজায়।’

রাজদূত মৃদুস্বরে করে বললেন, ‘টেগোর, বড় কবি জানতুম, কিন্তু এত সহৃদয় লোক সে কথা জানতুম না।’

অন্য সময় হলে হয়ত এই খেঁচ ধরে ‘জমিনতে স্বাধীনতা’ প্রবন্ধের মালমশলা যোগাড় করে নিতুম, কিন্তু আমার দেহ তখন বাড়ি ফিরে যাতে শোবার জন্য আঁকুর্বাঁকু লাগিয়েছি।

ওঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ‘এ দুদিন যে আপনি নিজের থেকে আমার অনুসন্ধান করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি। বৃত্তি হলে ভালো, না হলেও আমি সয়ে নিতে পারব। কিন্তু আপনার সৌজন্যের কথা কখনো ভুলতে পারব না।’

রাজদূতও ওঠে দাঁড়ালেন। শেকহাওয়ার সময় হাতে সহৃদয়তার চাপ দিয়ে বললেন, ‘আপনি নিশ্চয় বৃত্তিটা পাবেন। নিশ্চয় থাকুন।’

দুতবাস থেকে বেরিয়ে বাড়িটার দিকে আরেকবার ভালো করে তাকালুম। সমস্ত বাড়িটা আমার কাছে যেন মধুময় বলে মনে হল। তীর্থের উপপত্তি কি করে হয় সে-সম্বন্ধে আমি কখনো কোনো গবেষণা করিনি; আজ মনে হল, সহৃদয়তা, করুণা মৈত্রীর সন্ধান যখন এক মানুষ অন্য মানুষের ভিতর পায় তখন তাঁকে কখনো মহাপুরুষ কখনো ‘অবতার’ কখনো

‘দেবতা’ বলে ডাকে এবং তাঁর পাদপীঠকে ‘জড় জেনেও পূণ্যার্থী’ নাম দিয়ে অজ্ঞারামর করে তুলতে চায়। এবং সে-বিচারের সময় মানুষ উপকারের মাত্রা দিয়া কে ‘মহাপুরুষ’ কে ‘দেবতা’ সে কথা যাচাই করেন না, তার স্পর্শকাতর হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতার বন্যায় সব তর্ক সব যুক্তি সব পরিপ্রেক্ষিত, সব পরিমাণজনন ভাসিয়ে দেয়।

শুধু একটি পরিমাণজনন আমার মন থেকে তখনো ভেসে যায়নি এবং কল্মিন কালেই যাবে না—

যে ভঙ্গলোক আমাকে এই দুদিনে সুরাণ করলেন তিনি রাজদূত, স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিসও রাজদূত।

কিন্তু আর না। ভাবপ্রবণ বাঙালী একবার অনুভূতিগত বিষয়বস্তুর সন্ধান পেলে মূল বক্তব্য বেবাক তুলে যায়।

তিতিমু পাঠক, এখানে আমি করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। জমিন রাজদূতের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কাহিনীটা নিত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং তার বয়ান ভ্রমণ কাহিনীতে চাপানো মুক্তিযুদ্ধ কিনা সে-বিষয়ে আমার মনে বড় ঝিঝা রয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে হিমাগুণ পায়ে সত্যস্বরূপ রস লুকাইত আছেন তার ব্যক্তি-হিরণ আপন চাকচিক্য দিয়ে আমার চোখ এমনি ধারিয়ে দিয়েছে যে, তাই দেখে আমি মুগ্ধ, সে-পুষ্প চোখের যিনি পাত্রাবীর উদ্‌মানন করে আমার সামনে নৈবান্তিক, আনন্দদান, চিত্রস্তন রসসত্তা তুলে ধরবেন?

বিন্যাসের একাদশী, ইংরেজ রাজদূতের বিনয়, বরবরতা, জমিন রাজদূতের অযাচিত অনুগ্রহ অনাত্মীয় বৈরস্যাে নিরীক্ষণ করা তো আমার কর্ম নয়।

জমিন রাজদূতাবাস থেকে বেরিয়ে মনে পড়লো, বারো বৎসর পূর্বে আফগানিস্তান যখন পরাধীন ছিল তখন আমীর হাবীবউল্লাহ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে এই বাড়িতে রেখে অতিবিশংসকার করেছিলেন। এই বাড়ির পাশেই হিন্দুস্থানের সম্রাট বাবুর বাদশার কবর। সে কবর দেখতে আমি বহুবীর গিয়েছি, আজ যাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেন জানিলে, পা দুখানা আমাকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে গেল।

খোলা আকাশের নিচে কয়েকফালি পাখর দিয়ে বানানো অত্যন্ত সাদাসিধে করব। মোগল সরকারের নগণ্যতম মুহুরিবের কবরও হিন্দুস্থানে এর চেয়ে বেশী জৌলম ধরে। এ কবরের তুলনায় পুত্র তাজমহলের বড়ো আকর্ষণের বাড়া। আর আকবর জাহাঙ্গীর যে-সব স্থাপত্য রেখে গিয়েছেন সে সব তো বাবুরের স্বপ্নও ছাড়িয়ে যায়।

বাবুরের আত্মজীবনী যারা পড়েছেন তাঁরা এই কবরের পাশে দাঁড়ালে যে অনুভূতি পাবেন সে-অনুভূতি হুমায়ূন বা শাহজাহানের কবরের কাছে পাবেন না। বাবুর মোগলবংশের পত্তন করে গিয়েছিলেন এবং আরো বহু বহু বীর বহু বহু ভাবশ্রম পত্তন করে গিয়েছেন কিন্তু বাবুরের মত সুসাহিত্যিক রাজা-রাজভাদের ভিতর তো নেই-ই সাধারণ লোকের মধ্যেও কম। এবং সাহিত্যিক হিসেবে বাবুর ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ মাটির মানুষ এবং সেই তব্বতি তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় বার বার গাড়ে। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয় আমি আমারই মত মাটির মানুষ, যেন এক আত্মজনের সমাধির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমাদের দেশের একজন ঐতিহাসিক সীতারের আত্মজীবনীর সঙ্গে বাবুরের আত্মজীবনীর তুলনা করতে গিয়ে প্রথমটির প্রশংসা করেছেন বেশী। তাঁর মতে বাবুরের আত্মজীবনী এশেণীর লেখাতো দ্বিতীয় স্থান পায়। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। কিন্তু এখানে সে তর্ক জুড়ে পাঠককে আর হরয়ান করতে চাইনি। আমার বক্তব্য শুধু এটুকু—৬ দৃষ্টি

আত্মজীবনী সাহিত্যসৃষ্টি, নীরস ইতিহাস নয়। এর মধ্যে ভালোমদ বিচার করতে হলে ঐতিহাসিক হবার কোনো প্রয়োজন নেই। যে-কোন রসগু পাঠক নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে নিতে পারবেন। তবে আপসোস শুধু এটুকু, বাবুর তাঁর কেতাব জগতাই তুর্কীতে ও সীরাতে লাতিনে লিখেছেন বলে এই দুখানি মূল পড়া আমাদের পক্ষে সোজা নয়। সান্দ্রনা এইটুকু যে, আমাদের লব্ধপ্রাপ্তি ঐতিহাসিকও কেতাব দুখানা অনুবাদে পড়েছেন।

পূর্বেই বলেছি কবরটি অত্যন্ত সাদামাটা এবং এতই অলংকারবর্জিত যে, তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু জ্বরদন্ত অলংকারিকই। কারণ, বাবুর তাঁর দেহাঙ্কি কিভাবে রাখা হবে সে সম্পক্ষে এতই উদাসীন ছিলেন যে, নূর-ই-জাহানের মত

‘গরিব-গোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিও না

কেউ ভুলে—

শামা পোকার না গোড়ে পাখ, দায়া না পায়ে

বুলবুলে।’

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

কবিত্ব করেননি, বা জাহান-আরার মত

বহুমূল্য অভরণেকরিয়ে না সুসজ্জিত

কবর আমার

তৃণ শ্রেষ্ঠ অভরণ দীনা আত্মা জাহান-আরা

সম্রাট কন্যার।*

বলে পাঁচজনকে সাবধান করে দেবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তবে একথা ঠিক, তিনি তাঁর শেষ শয্যা যেমন কর্মভূমি ভারতবর্ষে গ্রহণ করতে চাননি ঠিক তেমনি জন্মভূমি ফরগানা থেকে মৃত্যুকালে সুরণ করেননি।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—

“The foxes have holes and the birds of the air have nest ; but the Son of man hath not where to lay his head”

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

বিশ্বজগৎ আমারে মার্গিলে

কে মোর আত্মপার ?

আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে

কোথায় আমার ঘর ?

জীবিতাবস্থায়ই যখন মহাপুরুষের আশ্রয়স্থল নেই তখন মৃত্যুর পর তাঁর জন্মভূমিই বা কি আর মৃত্যুস্থলই বা কি ?

ইংরাজী ‘সার্ভে’ রুখটা গুজরাতীতে অনুবাদ কর হয় ‘সিংহাবলোকন’ দিয়ে। ‘বাবুর’ শব্দের অর্থ সিংহ। আমার মনে হল এই উচ্চ পাহাড়ের উপর বাবুরের গোর দেওয়া সার্থক হয়েছে। এখান থেকে সমস্ত কাবুল উপত্যকা, পূর্বে ভারতমুখী গিরিশ্রেণী, উত্তরে ফরগানা যাবার পথে হিন্দুকুশ, সবকিছু জাহানে বায়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সিংহাবলোকনে দেখছেন সিংহরাজ বাবুর।

* অনুবাদকের নাম ভুলে যাওয়ায় তাঁর কাছে লজ্জিত আছি।

নেপোলিয়নের সমাধি-আশ্রয় নিয়মান করা হয়েছে মাসিহি পত করে সমতল-ভূমির বেশ খানিকটা নিচে। স্থপত্যকে এরকম পরিকল্পনা করার অর্থ রেবাতে অনুগোহ করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘যে-সম্রাটের জীবিতাবস্থায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হত, মৃত্যুর পরও তাঁর সামনে এলে সব জাতিকে যেন মাথা নিচু করে তাঁর শেষশয্যা দেখতে হয়।’

ফরগনার গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে যে-বাবুর সিংহাবলোকন দিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যে-সিংহাবলোকনদক্ষতা বাবুরের শিরে হিন্দুস্থানের রাজমুকুট পরিয়েছিল, সেই বাবুর মৃত্যুর পরও কি সিংহাবলোকন করতে চেয়েছিলেন ?

জীবনমরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই কি বাবুর কাবুলের গিরিশিখরে দেহাঙ্কি রাখার শেষ আদেশ দিয়েছিলেন ?

কিন্তু কি পরস্পরবিরোধী প্রলাপ বকছি আমি ? একবার বলছি বাবুর তাঁর শেষশয্যা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, আর তাঁর পরক্ষণেই ভাবছি মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর বিহারস্থলের সম্মোহন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবে কি মানুষের চিন্তা করার কল মগজে নয়, সেটা পেটে ? না-থেকে পেয়ে সে যন্ত্র স্টিয়ারিং ভাঙা মোটরের মত চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগিয়েছে ?

পিছন ফিরে শেষ বারের মত কবরের দিকে তাকাতো আমার মনের সব ঘন্ঘরে অবসান হল। বরফের শুভ্র কবলে ঢাকা ফকীর বাবুর খোদাতালাব সামনে সেজদা (ভূমিস্তম্ভ প্রণাম) নিয়ে যেন অন্তরের শেষ কামনা জন্মেছেন। কী যে সে কামনা ?

ইংরেজ-ধর্মিত ভারতের জন্য মুক্তি-মোক্ষ-নজাত কামনা করছেন। শিবাজী-উৎসবে গুরুবনে গিয়েছিলেন,

‘মৃত্যু সিংহাসনে আজি বসিয়াছে অমরমুরতি

সমুদ্র ভালে

যে রাজকিরীট শোভে নুকারে না তার দিবাভ্যোতি

কন্তু কোনেকালে।

তোমারে চিনেছি আজি চিনেছি চিনেছি হে রাজন,

তুমি মহরাজ

‘তব রাজকর লয়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন

দাঁড়াইবে আজ।’

প্রথম সেটি অশ্রুতি করল্লু ; তারপর কুরানশরীফের আয়াত পড়ে, পরলোকগত আত্মার সদগতির জন্য মোনাজাত করে পাহাড় থেকে নেমে নিচে ‘বাবুর-শাহ’ গ্রামে এলুম।

শুনেনি মানস-সরোবর যাবার পথে নাকি তীর্থযাত্রীরা অসহ্য কষ্ট সত্ত্বেও মরে না,—মরে ফেরার পথে—শীত, বরফ, পাহাড়ের চড়াই-ওংরাই সহ্য হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। তখন নাকি তাদের সম্মুখে আর কোনো কামবাগ থাকে না বলে মনের জোর একদম লোপ পেয়ে যায়। ফিরে জো যেতে হবে সেই আপন বাসভূমি, সৈনন্দিন দুগ্ধমস্তকা, আশানিরশার একটানা জীবনস্রোতে। এ-বিরাট অভিজ্ঞতার পর সে-পতন এতই ভয়াবহ বলে মনে হয় যে, তখন সামান্যতম সঙ্কটের সামনে তীর্থযাত্রী ভেঙে পড়ে আর বরফের বিছানায় সেই যে শুয়ে পড়ে তার থেকে আর কখনো ওঠে না।

আমার পা আর চলে না। ভেঙে পড়ছে। মাথা ঘুরছে।

শীত হাতপায়ের আঁচড়লের উষ্ণা জমে আসছে। কান আর নাক অনেকফল হয় সম্পূর্ণ অতেনা হয়ে গিয়েছে। জোরে হেঁটে যে গা ঘরম করবে সে শব্দটি আমার শরীর আর নেই।

নিজন রাস্তা। হঠাৎ মোড় ঘুরতেই দেখি উল্টা দিক থেকে আসছে গোটাসোটক উল্লীপরা সোপাই। ভালো করে না তাকিয়েই বুঝতে পারলুম, এরা বাতায় সকাওয়ার দলের ডাকাত—আমানউল্লাহর পলাতক সৈন্যদের ফেল-সেওয়া উল্লী পরে নয়া শাহানশাহ বাদশার হুঁহুফেঁড় ফৌজের গণ্যমান্য সদস্য হয়েছেন। পিঠে চকচকে রাইফেল কোলানো, কোমরে বুলেটের বেল্ট আর চোখমুখে যে জ্বর, লোবুপ ভান, তার সংগে তুলনা দিতে পারি এমন চেহারা আমি জেলের বাইরে ভিতরে কোথাও দেখিনি। জীবনের বেশীর ভাগ এরা কাটিয়েছে লোকচন্দ্রের অন্তরালে হয় গোরস্তানে, নয় পর্বতগুহার আধা-আলো-আন্ধকারে। পুণ্ড্রীভূত আশঙ্ক পুরীয়স্থাপকে শূকর উল্টেপাল্টে দিলে যে বীভৎস দুর্গন্ধ বেরায়, রাইবন্দারবে উৎকণ্ঠ এই দস্যুদল আমার সামনে সেই রূপ সেই গন্ধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

ডাকাতগুলায় পায়ে ওভারকোট নেই। সেই লোভেতেই তো তারা আমাকে খুন করতে পারে। নির্জন রাস্তায় নিরীহ পথিককে খুন করে তার সবকিছু লুটে নেওয়া তো এদের কাছে কোনো নতুন পুণ্যসম্ভব নয়।

আমার পালানোর শক্তি নেই, পথও নেই। তার উপরে আমি গাঁয়ের ছেলে। বাঘ দেখলে পালাই, কিন্তু বুনা শ্যোয়ের সামনে থেকে পলাতে কেমন যেন যেমা বোধ হয়। পলাই অবশ্য দূর অবস্থাতেই।

আমার থেকে ডাকাতরা যখন প্রায় দশ গজ দূরে তখন তাদের সর্গার হঠাৎ ত্রুক্ষু দিল 'দাঁড়া'। সঙ্গে সঙ্গে আঁকন লোক ডেড হট করলে। মলপতি বলল, 'নিশান কর'। সঙ্গে সঙ্গে আঁচানা রাইফেলের গোল ছাঁদা আমার দিকে ত্রিরাপুটে তাকালো।

ততক্ষণে আমিও থমকে দাঁড়িয়েছি কিন্তু তারপর কি হয়েছিল আমার আর ঠিক ঠিক মনে নেই।

আমার স্মরণশক্তির ফিল্ম পরে বিস্তার ডেভালাপ করেও তার থেকে এতটুকু আঁচড় বের করতে পারিনি। আমার চৈতন্যের শাটায় তখন বিলকুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মনের সুপার ভলল এগও কোনো ছবি তুলতে পারিনি।

আঁচানা রাইফেলের অক্ষকোটির আমার দিকে তাকিয়ে আর আমি ঠায় দাঁড়িয়ে, এ দৃশ্যটা আমি তারপর বারকয়েক স্বপ্নেও দেখেছি, কাজেই আমার হৃদয় বার বার বলতে পারব না কোন ঘটনা কোন চিন্তাটা সত্যি বাস্তব শাহ গ্রামের কাছে বাস্তবে ঘটেছিল আর কোনটা স্বপ্নের কম্পনা মাত্র।

আবছা আবছা শুধু একটি কথা মনে পড়ছে, কীভাবে বলছি হলপ করতে পারব না।

আমার ডান হাত ছিল ওভারকোটের পকেটে ও তাকে ছিল আবদুর রহমানের গুঁজে দেওয়া ছোট পিস্তলটি। একবার বোধ করি লোভ হয়েছিল সেই পিস্তল বের করে অস্ত্রত এক ব্যাটা বদমাশকে খুন করার। মনে হয়েছিল, মরব যখন নিশ্চয়ই তখন স্বর্ণে বাবার পূজাটো ও জীবনের শেষ মুহুর্তে সন্তুষ্ট করে নিই।

আজ আমার আর দুখের সীমা নেই, কেন সেদিন গুলি করলুম না।

'পাগলা বাদশা মুহম্মদ তুগলক তাঁর প্রজাদেয় বাবাহারে, এবং প্রজারা তাঁর বাবাহারে এতই ত্রিক্তবিরত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি যখন মারা গেলেন তখন তুগলকের সহচর ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী বলেছিলেন, 'মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বাদশা তাঁর প্রজাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি

পেলেন, প্রজারা বাদশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল।'

সেদিন পুণ্যসম্ভবের লোভ যদি গুলী ঢালাতুম তাহলে সংসারের পাঁচজন আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন, আমিও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতুম।

হাঃ শুনি অইহাস্য। 'তরসীদ', 'তরসীদ', সবাই চেঁচিয়ে বলছে, 'তরসীদ—অর্থাৎ 'ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে, লোকটা ভয় পেয়েছে রে।' আর সংগে সংগে সবাই হেসে কুটকুট। কেউ মোটা গলায় বক-বক করে, কেউ বন্ধুকটা বগললবায় চেপে খ্যাক খ্যাক করে, কেউ ছুইফেলুবিহারীদিয়ে মত দু'হাত তুলে কলরব করে, আর দু'একজন আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মিটমিটিয়ে।

একজন হেঁড়ে গলায় বলল, 'এই মুরগিটাকে মারার জন্য আঁচটা বুলেটের বাজ্ঞে বর্টা। ইয়া আল্লা!'

আমার দৈর্ঘ্যপ্রহর বর্ণনা দেব না, কারণ বাঙালীকে 'মুরগি' বলার হক্ অন্যের আছে।

'মুরগি' ছিঁ আর মোরগই হই আমি কসাইয়ের হাত থেকে খালস পাওয়া মুরগির মত পালতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু পেটের ভিতর কি রকম একটা অজুত বাধা আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে অতি আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলুম।

অফগান রসিকতা হাস্যরস না রক্তরসের পথ্যে পড়ে সে বিচার আলঙ্কারকেরা করবেন। আমার মনে হয় রসটা বীভৎসতা-প্রধান বলে 'মহামাৎসরের' গুঞ্জে এটাকে 'মহাসর' বলা যেতে পারে।

কিন্তু এই আমার শেষ পরীক্ষা নয়।

বাড়ি থেকে ফাল্গুনখানেক দূরে আরেকদল ডাকাতের সঙ্গে দেখা; কিন্তু এদের সঙ্গে বকমকে নৃতন যুনিফর্ম-পরা একটি ছোকরা অফিসার ছিল বলে বিশেষ দৃষ্টিস্বাস্ত্য হ়লুম না। দলটা যখন কাছে এসেছে, তখন অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে চেনা চেনা বলে মনে হল। আরে। এ—তো দু' দিন আগেও আমার ছাত্র ছিল। আর পড়াশোনায় এতই উড্ডন এবং আকর্ষণীয় ছিল যে, তাকেই আমি আমার মাস্টারি জীবনে বকবকা করেছি সবচেয়ে বেশী।

সেই কথাটা মনে হতেই আমি আবার আঁচা রাইফেলের চোঙা চোখের সামনে দেখতে 'পেলুম। জাইনে গলি ছিল; বোল্ডা গুলির মত গোঙা খেয়ে সেদিকে টু লিলাম। ছেলোটা যদি দাদ তোলায় তলে থাকে, তবে অক্লী না হোক কপালে বেইজ্জতি তো নিশ্চয়ই। (হে মুরসীদ, কি কৃপণেই না এই নৃশূনের পুরীয়ে এসেছিলুম। হে মৌলা আলীর নেহেরশন, আমি জোঁবা বকী—

'পিছনে শুনি মিলিটারি বুটের ছুটে আসার শব্দ। তবেই হয়েছে। মুরসীদ, মৌলা সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছেন। ইংরেজী প্রবাদেরই তবে আশ্রয় নিই—'ইডন দি ওয়াম টার্নস'।' ঘুরে দাঁড়ান। ছেলোটা চোঁচছে 'মুখাম্মি সায়েব, মুখাম্মি সায়েব।' কাছে এসে আবদুর রহমানী কয়লায় সে আমার হাতদুখানা তুলে ধরে বার বার চুমো খেল, কুশল জিজ্ঞেস করল এবং শেষটায় বেমত্কা ঘোরাঘুরির জন্য মুকবির মত দাব-তান্বীও করল। আমি 'হে হে, বিলফব, বিলফব, তা আর বলতে, অলহমদুলিল্লাহ, অলহমদুলিল্লাহ তওবা তওবা' বলে পেলুম—কখনো তাগ-মফিক ঠিক জায়গায়, কখনো ভয়র ধকল কাটতে গিয়ে উল্টোপাল্টা।

ফাঁড়া কেটে যাওয়ায়, আমারও সাহস বেড়ে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এ বেশ কোথায় পেলেন, বৎস?'

বাবুর-শাহ পাহাড়ের মত বুক উঁচু করে বৎস বলল, 'কর্নাইল শুদম' অর্থাৎ আমি কনোই হয়ে গিয়েছি।

ইয়া আছা! উনিশ বছর বয়সে রাতারাতি কর্ণেল। আমাদের সূরেশ বিশ্বাস—চেনার মধ্যে তো ঘনিষ্ঠ আমাদের নীলমণি—তো এত বড় কদরও দেখাতে পারেননি। আমার লোভ বেড়ে গেল। শুধালুম, ‘জেনারাইল হবার দিল্লী কাদুর?’

গভীরভাবে ‘দূর নীত’।
খুদা তাল্লা মোহেরবান, বিপ্লবটা বড়ই পরামত।
কলেব সায়েব বুঝিয়ে বললেন, ‘আমীর হবীবউল্লা খান আমার পিসির দেবরের মামাশুর।’

সম্পর্কটা ঠিক কি বলেছিল, আমার মনে নেই, তবে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠ নয়। আমি অত্যন্ত গর্ব বোধ করলুম; ধন্য আমার মাস্টারি, ধন্য আমার শিষ্য, ধন্য এ বিপ্লব, ধন্য এ উপবাস। আমার শিষ্য রাতারাতি কর্ণেল হয়ে গেল। বরীদানাথও ঠিক এই অবস্থায়ই পেয়েছিলেন—

‘এতদিনে জানালেম, যে কাদন কাদলেম

সে কাহার জন্য,

ধন্য এ—জাগরণ, ধন্য এ—ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য!’

স্থির করলুম, ফুরসৎ পাওয়া মাত্রই ‘প্রবাসী’তে বঙ্গের বাহিরে বাঙালী’ পর্যায়ে আমার কীর্তির খবরটা পঠাতে হবে। এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের বাঙালী দারোয়ান মাঝ গেলে যখন সাড়ম্বর খবর বেরতেপারে, তখন আমার এ—কীর্তি উড়ে বলে কি বাবুন নয়? পরের বাড়ী জলছে সতি, তাই বলে সে আগুনে আমি সিগারেট ধরাবো না? আদার?

বললুম, ‘তাহলে বৎস, যদি অনুমতি দাও তবে বাড়ি যাই!’
মিলিটারি কণ্ঠে বলল, ‘আপনাকে বাড়ি পৌছিয়ে দিচ্ছি। রাস্তায় অনেক ডাকু।’ বলে অজানায় সে আপন সঙ্গীদের দিকেই তাকালো। তাই সহ। দান উল্টে গিয়েছে। এখন তুমি গুত্র, আমি শিষ্য।

আমাকে বাড়িতে পৌছিয়ে দিয়ে আমার বসবার ঘরে কর্ণেল দু’দণ্ড রসালান করলেন, আমানউল্লাকে শাপমনিয় ও মৌলানাকে মিলিটারি স্ট্যাটোজি সম্পর্কে তালিম দিলেন।

আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় কর্ণেল আবদুর রহমানের খাস কামরায় ঢুকল। কবুলের ছাত্রের গুরুগৃহে ভূতাতর সঙ্গেশ্ব ধূমপান করে। কিন্তু আবদুর রহমান তো বিশপে পড়ল, বড়কাল থেকে তার তামাক বাড়ন্ত। লোকটা আবার ধামা দিতে জানে না,—আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি? বনমালীও গুরুদেবের সঙ্গেশ্ব বাস করে কবিতা লিখতে শেখেনি।

মৌলানা বললেন, ‘সমস্ত সকাল কাটালুম ব্রিটিশ লিগেশন আর বাচ্চার পররাষ্ট্র-দফতরে। ক্যারাকটিও কম করিনি। দাড়িতে হাত রেখে শপথ করে বললুম, ‘দু’মাস হল শুকনো কুটি ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। আসছে পরশ থেকে সে—কুটিও আর জুটেবে না।’ ব্রিটিশ লিগেশনে বললুম, ‘কবুলের পিজরা থেকে মুক্তি দাও’। পররাষ্ট্র-দফতরে বললুম, ‘দু’মাসে অন্ন দাও’।

আমি বললুম, ‘পররাষ্ট্র-দফতর আর মুদির লোকান এক প্রতিষ্ঠান নাকি? তোমার উচিত ছিল বলা—

‘মুরগে সহীদাত তু অম্ম ইফতাদে অম দর দামে ইশক।

ইয়া ব কুশ, ইয়া দানা দেহ অজ কফস আজাদ কুন।’

‘পাখির মতন বাধা পড়ে গেছি কঠিন প্রেমের দাঁদ।’

হয় মেরে ফেলো, নয় দানা দাও, নয় খোলো এই বাধ।’।

‘তুমি তো মাত্র দুটে পল্লী বাথলাজে? হয় দানা দাও, নয় খোলো বাধ। তৃতীয়া বললে না কেন? নয় মেরে ফেলো। আশুবাকোর বিকলাঙ্গ উদ্ভিৎ গোবধের ন্যায় মহাপাপ।’

মৌলানা বললেন, ‘তাই সহ। শিক—কাবাব করে খাবো।’

শীত ঝুকছি, যেন কম্প দিয়ে মালেরিয়া জ্বর। মাঝে মাঝে তন্দ্রা লাগছে। কখনো মনে হয় খাট থেকে পড়ে যাবি। সপ্তে সপ্তে পা দুটো ঝাঁকনি দিয়ে হঠাৎ সটান লম্বা হয়ে যায়। কখনো চীংকার করে উঠি, আবদুর রহমান, আবদুর রহমান, কেউ আসে না। কখনো দেখি আবদুর রহমান খাটের বাজুতে হাত দিয়ে মাথা চিট করে বসে; কিন্তু কই, তাকে তো ডাকিনি। শুনি, যে দুচারটে সামান্য মন্ত সে জানে তাই বিভ্রিভ করে পড়ছে।

তার সঙ্গেশ্ব দুঃখশ্ব; আরোপ্লেনে বসে আছি, বাচ্চার ডাকাতল আটটা রাইফেল বারিয়ে ছুটে আসছে, আরোপ্লেন খামবার জন্য, এজিন স্টার্ট নিচ্ছে না। এক সপ্তে আটটা রাইফেলের শব্দ। ধুম জেগে যায়। শুনি সত্যিকার রাইফেলের আওয়াজ আর চিংকার। পাড়ায় ডাক পড়েছে।

আর দেখি মা ইলিশমাহ ভাজছেন।

মাগো।

অন্ধকার হয়ে আসছে। আবদুর রহমান পাঁজের পিদিন দেখাচ্ছে না কেন? ওঃ, ভুলেই গিয়েছিলুম, কোয়েলিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর কী—ই বা হবে তেল দিয়ে, জীবনপ্রদীপ যখন—। চুলায় যাকগে কবিতা।

কিন্তু সামনে একি? প্রকাণ্ড এক কুড়ি। তার ভিতরে আটা, রগুন, মটন, আলু, পেঁয়াজ, মুরগি আরো কই? তার সামনে বসে ভুইফোড় কর্ণেল; মিট—মিটিয়ে হাসছে। ভারী বয়সদ। আবার আবদুর রহমানের মুখ এত পাডাশ কেন? আমার মুখ ভাঙছে না দেখে ভয় পেয়েছে? নাঃ, এ তো ঘুম নয়, স্বপ্নও নয়।

আবদুর রহমান বলল, হজুর কাবাইল সায়েব সওগাত এনেছেন।

একদিনে মানুষ কত উত্তেজনা সহিতে পারে?

আবদুর রহমান আবার তড়াতড়াি বলল, ‘হজুর, আমাকে দেখ দেবেন না আমি কিছু বলিনি’।

কর্ণেল বলল, ‘হজুর যে কত কষ্ট পেয়েছেন তা আপনার চেহারা থেকেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সবই খুদাতালার মরজি। এখন খুদাতালার মরজিতেই আপনার সঙ্গেশ্ব আমার দেখা হয়ে গেল। আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করতেন, সেখানো কি আমি ভুলে গিয়েছি?’

আমি বললুম, ‘সে কি কথা। তোমাকেই তো আমি সবচেয়ে বেশী বকেছি।’

কর্ণেল ভারী সুখী। ‘হা, হা, হজুর সেই কথাই তো হচ্ছে। আপনারও তা হলে মনে আছে। আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ না করলে সবচেয়ে বেশী বকলেন কেন?’ তারপর মৌলানার নিকৈ তাকিয়ে খুশীতে গদগদ হয়ে বলল, ‘জানেন সায়েব, একদিন মুআল্লিম সায়েব আমার উপর এমনি চটে গেলেন যে, আমাকে বললেন একটা বেত নিয়ে আসতে। ক্লাসের সবাই তাকব হয়ে গেল। আমাদের দেশের মাস্টার বেত আনায় কান্ডনাকে দিয়ে, না হয় দুটো ছেলের দুশমনাকে দিয়ে। সে তখন বেছে বেছে তেজ বেত নিয়ে আসে। আমি তখন কি করলুম জানেন? ভাবলুম, মুআল্লিম সায়েব যখন আর কাউকে কখনো চাপুক মরকোনি, তখন তাঁর বউনিতে ফাঁকি দিলে আমার অমকাল হবে। নিয়ে এলুম একখানা পয়লা নাম্বারের বেত।’

তারপর কনলে মৌলানার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, 'মুআল্লিম সায়েব তখন কি করলেন, জানেন? বেতখানা হাতে নিয়ে আমাকে ভিজ্জেস করলেন, 'বেতের কটাগুলো কেটে ফেলিসনি কেন?' ছেলের সবাই বলল, 'তাহলে লাগবে কি করে?'

মৌলানা বললেন, 'সৈদাম মার খেয়েছিলেন বলেই তো আজ কনলে হয়েছে।'

কনলে অপশোস করে বলল, 'না, মুআল্লিম সায়েব মারেননি। আমি তো তৈরি ছিলাম। আমার হাতে বেত লাগে না।' বলে তার হাত দুখানা মৌলানার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল।

চারার ছেলের হাত। সম্প্রবয়স থেকে কহিতানের (কুৎসর্পবৃত্ত) শব্দ জমিষ্ঠ হাল ধরে ধরে দুখানা হাতে কড়া পড়ে গিয়ে চেহারা হয়েছে মোয়ের কাপের মত। নখে চামড়ায় কোনো তফাত নেই, আর হাতের রেখা দেখে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আমার ভক্তি বেড়ে গেল।

লাঙলের ঘঘায় হাতে অবশিষ্ট রয়েছে কুলে দেখুখানা রেখা। আয়ুরেখা তেলোর ইস্পার উপর, হেডলাইন নেই, আর হার্ট লাইন তেলোর মধ্য-খানে এসে আচলিত মরুপথে হারালে ধারা। বাসু! এই দেখুখানা লাইন নিয়ে সে সংসার চালাচ্ছে, জুপিটার, ভিনাস, সন্মনের মার্জিট—রেখা কোনো কিছুই বলাই নেই। আর আঙুলগুলো এমনি কুঠরোগীর মত এড়ো-থোঁড়ো ঘেঁ, হাতের আকার জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। না পড়ারই কথা, কারণ ডালাড-গুস্তির ছেলে কনলে হয়েছে সবসুদ্ধ কটা, আর ডানের সম্পর্কে এসেছেন কজন বরাহ মিহির কজন কেহরো?

আবদুর রহমান খুড়ির সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে।

মৌলানা কনলেকে ধন্যবাদ দিয়ে আবদুর রহমানকে খুড়ি রামাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। সে খুড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ঘর থেকে বেরল না। আমি নিরুপায় হয়ে কনলেকে বললুম, 'রাতে এখানেই খেয়ে যাও।'

আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ রামাঘরে চলে গেল।

কনলে বলল, 'আমাকে মাফ করতে হবে ছজুর। বাদশার সঙ্গে আমার রাতে খানা খাওয়ার হুকুম।'

মৌলানা শুধালেন, বদশা কি খান?

কনলে বললেন, 'সেই রুটি পনির অর কিসমিস। কুচিৎ কখনে দুমুঠো পোলাও। বলেন, যে-খানা খেয়ে আমানউল্লা কাপুরুষের মত পালান, আমি সে-খানা খেলে কাপুরুষ হয়ে যাব না?' তারপর দুটুহাসি হেসে বলল, 'আমি ওসব কথায় কান দিই না। আমানউল্লাহ বাবুটাই এখনো রাজবাড়িতে রাখে। আমি তাই পেট ভরে খাই।'

কনলে যাবার সময় বলে গেল, আমি যেন আহারাটি সম্পর্কে আর দুরুস্তি না করি।

দশ মিনিটের ভিতর আবদুর রহমান কনলের আনা কাটা দিয়ে গরু আগুন জ্বেলে দিল। আমি সে-আগুনের সামনে বসে সরঞ্জাম, মাংসে রান্ধা, রান্ধে, হাড়, মজার, শ্যামুতে শ্যামুতে যে শরীরবীহির অভিযান অনুভব করলুম, তার তুলনা বা বর্ণনা দিতে পারি এমনতরো শারীরিক অভিজ্ঞতা বা আলংকারিক ক্ষমতা আমার নেই। গোলে-ফাটা জমি যে রকম সেতের জালি ফাটলে ফাটলে ছিদ্রে ছিদ্রে, কণায়কণায় শুয়ে নেয়, আমার শরীরের অণুরমাণু যেন ঠিক তেমনি আগুনের গরম শুয়ে দিল। আমার মনে হল, ভগ্নীত্ব যে-রকম জুহাদায় ঠিক সধরাজের সহস্র সন্তানের প্রাধান্য করার বিজয়অভিযানে বেরিয়েছিলেন স্বয়ং ধ্বংসের ঠিক সেইরকম সূক্ষ্মশরীর ধারণ করে বহিরাগত সঞ্চে নিয়ে আমার অঙ্গে প্রবেশ করলেন।

মুদ্রিত নয়নে শিররেণে শিরহায়ে অনুভব করলুম প্রতি ভাস্কর্যায় জঙ্ঘাশার স্পর্শ, আমার শিরিবিজ্ঞ অচেতন অণুতে অণুতে কশানুর নীপ স্পর্শের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অভিযেক।

সমস্ত দেহমন দিয়ে বৃথলুম আর্য ঐতিহ্য, ভারতীয় সভ্যতা। সনাতন ধর্মের প্রথম শব্দব্রুৎ ঋগ্বেদের প্রথম পদে কেন

'অগ্নিমিড়ে পুরোহিতম'

রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

এবং সেমিতি ধর্মজগতেও তো তাই। ইহুদী, খ্রীষ্ট, ইসলাম তিন ধর্মই সম্মিলিত কণ্ঠে স্বীকার করে, একমাত্র যিনি পরমেশ্বরের সস্মৃদ্বীয় হয়েছিলেন তিনি মুসা (মোজেস) এবং তখন পরমেশ্বরের তার প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রুদ্ররূপ বা 'তজরিতে'। মুসা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, যখন রূদ্রান ঘিরে পেলেন, তখন দেখলেন তার সামনের সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

গ্রীক দেবতা প্রমিথিযুস ও দেবরাজ জুপিটারের কলহ হয়েছিল অগ্নি নিয়ে। মানব-সভ্যতা আরম্ভ হয় প্রমিথিযুসের কাছ থেকে পাওয়া সেই অগ্নি দিয়ে। নলরাজ ইফন প্রজ্ঞালনে সূচনীয় ছিলেন বলেই কি তিনি দেবতারের দ্বিভাজন হলে? 'নল' শব্দের অর্থ 'চোড়া', প্রমিথিযুসও আগুন চুরি করেছিলেন চোঙার ভিতরে করে।

ভারতীয় আর্য, গ্রীক আর্য দুই গোষ্ঠী, এবং তৃতীয় গোষ্ঠী ইরানী আর্য জরথুষ্ট্রী—সকলেই অগ্নিকে সন্মান করেছিলেন। হয়ত এরা সকলেই এককালে শীতের দেশে ছিলেন এবং অগ্নির মূল্য এরা জানতেন, কিন্তু সেমিতি ভূমি উষ্ণপ্রধান, সেখানে অগ্নিমাছাত্মা কেন? তবে কি মরুভূমির মানুষ সূর্যের একচ্ছত্রাধিপত্য সম্পর্কে এতই সচেতন, বিশ্ববৃদ্ধাণ্ডের একচ্ছত্রাধিপতির রুদ্ররূপ বা 'তজরিতে' অগ্নিরই আভাস পায়?

আগুনের পরশমণির ছোয়া লেগে শরীর ক্ষেপে ক্ষেপে শিহরিত হচ্ছে আর ওদিকে মগজে দৃশ হুশ করে থিয়োরির পর থিয়োরি গড়ে উঠছে; নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি এতই গভীর শ্রদ্ধা হল যে, 'সাধু সাধু' বলে নিজের পিঠে নিজেই চাপড়াতে গিয়ে হাতটা মচকে গেল। এমন সময় হঠাৎ যান পড়ে গেল, শয়তান, ডেভিল, বিয়াজিব্বার, লুসিফর সবাই আগুনের তৈরি; তারা আগুনের রাজা। নরকের আবহাওয়া আগুন দিয়ে ঠাণ্ডা, এদের শরীর আগুনে গড়া না হলে এরা সেখানে থাকতেন কি প্রকারে?

হায়, হায়, আমার বহু মূল্যবান থিয়োরিখানা শয়তানের পাল্লায় পড়ে নরকের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

কোথায় লাগে নরগিস, চামেলিয়াবে বাখানিয়া কবিতা লেখে কোন মূর্খ! বিরয়ানি—কোর্মা—কাবাব—মুসল্লম থেকে যে খুশবাই বেয়েয় তার কাছে সব ফল হারাতা মানেই, প্রিয়র চিকুরসুবাণ্ড তার কাছে নাসি।

চোখ মলে দেখি, আবদুর রহমান বেনকুটে সাজিয়েছে। মৌলানা ফপারলালি করছেন আর আমার বেলাল দণ্ডি একমাস অজ্ঞাতবাস করে ফের খানা-কামরায় এসে উমাসিক হয়ে মাইডিয়ার মাইডিয়ার আওয়াজ বের করছে।

আবদুর রহমান আমাদের পরিচয়ের পয়লা রাঙিরে যে ডিনার ছেড়েছিল এ ডিনার সে মালেরই সিক্ত ঝালা, শ্রিয়জনদের উপহারোপযোগী, পুজোর বাজারের রাজ-সংস্করণ। জনাতি তর হয়ে গেল। মৌলানা হজ্বার দিয়ে উঠলেন,

'জিন্দাবাদ গাজী আবদুর রহমান খান।'

আমি গলা এক পর্দা চড়িয়ে লোভ মুহাম্মদী কায়দায় বললুম,

‘কমরং ব শিকান্দ, খুদা তোরা কোর সজদ, ব পুন্দী, ব তরকী’ (তোরা কোমর ভেঙ্গে দুটুকুরে ছোক, খুদা তোরা দু’ চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে ওঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকুরা টুকুরা হয়ে ফেটে যা)।’

মৌলানা বজ্রাহত। গুণীলোক, এসব কটু-কাটাবের সন্ধান তিনি পাবেন কি করে? কিন্তু বলাই দূর করবার এই জনপদপদ্ম আবদুর রহমান বিলক্ষণ জানে। ‘অদশা সাবানে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, ‘হাত ধুয়ে নিন সায়েব, গরম জল আছে।’

কি বললে? গরম জল! আ-হা-হা। কতদিন বাদে গরম জলের সুখস্পর্শ পাব। কোথায় লাগে তার কাছে নববর্ষের বিপুলনিতম্বা বসন্তসেনার ভলাভিক্ষেপ, কোথায় লাগে তার কাছে মুগ্ধ চারুদন্তের বিতুল প্রশস্তি। বললুম, ‘বরাদুর আবদুর রহমান, এই গরম জল দিয়ে তুমি যেন তোমার ডিনারখানা সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিলে।’

আবদুর রহমানের খুশী অস্ত নেই। আমার কোনো কথাই উত্তর দেয় না, আর বেশী প্রশংসা করলে শুধু বলে, ‘অলহামদুলিল্লা’ অর্থাৎ ‘খুদাতালাকে ধন্যবাদ।’ যতক্ষণ এটা গুছোচ্ছিল আমার বার বার নিজের পড়ছিল তার হাত দুখানা কি রকম শুকিয়ে গিয়েছে, আর বাসন-বর্ডন নাড়াছাড়া করার সময় অল্প অল্প কাঁপছে।

মৌলানা আমাকে সাবধান করে দিলেন, প্রতি গ্রাস যেন বত্রিশবার চিবিষে খাই। কাজের বেলা দেখা গেল, ভাঙ্গগাড়ি থেকে নেমে গোরারা যে-রকম রিফ্রেশমেন্টরুমে খানা খায় আমরা সেই তালেই খাচ্ছি। পেটের এক কোণ ভর্তি হতেই আমি আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললুম, ‘এরকম রান্না পেলে আমি আরো কিছুদিন কাবুলে থাকতে রাজী আছি।’ সে-দুদিনে এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি করা যায়।

কিন্তু মৌলানা প্রোথিত-ভার্য। পেট খানিকটা ভরে যাওয়ার তাঁর বিরহযন্ত্রণাটা যেন মাথা খাড়া করে দাঁড়াল। বললেন, ‘না,

সনগে ওত্ন অজ্ঞ তখতে সুলেমান বেশতর,
খারে ওত্ন অজ্ঞ গুলে রেহান বেহতর,
ইউনুফ কি দর মিসর পাদশাহী মীকরদ
মীওক্‌ ‘গদা বুদনে কিনান খুশতর।’

দেশের পাখর সুলেমান শার
তখতের চেয়ে বাড়়া,
বিদেশের ফুল হার মেনে যায়
দিশী কাঁটা প্রাণ কাড়া।

মিশর দেশের সিংহাসনেতে
বসিয়া ইউনুফ রাজা
কহিত, ‘হায়রে, এর চেয়ে ভালো
কিনানে ভিখারী সাজা।’

আমি সাধুনা দিয়ে বললুম,

ইউনুফে গুম গশতে বাজ় আয়দ ব কিনান,
গম্‌ ম খুর।
কুলবয়ে ইহজান শওদ কজ্জি গুলিস্তান,
গম্‌ ম খুর।

দুখ করো না হারানো ইউনুফ
কিনানে আবার আসিবে ফিরে
দলিত শুখ এক মরু পশ্চ
হয়ে গুলিস্তা হাসিবে ঘীরে।

(কাজী নজরুল ইসলাম)

কিন্তু বয়েত-বাজী বা কবির লড়াই বেশীক্ষণ চলল না। সাতারের সময় পয়লা দম ফুরিয়ে যাবার খানিকক্ষণ পরে মানুষ যে রকম দুরারাম দম পায়, আমরা ঠিক সেই রকম খানিকক্ষণ ক্ষান্ত দিয়ে আবার মাথায় গামছা বেঁধে খেতে লেগেছি। এদিকে দেখি সবকিছু ফুরিয়ে আসছে—প্রথম পরিবেশনে কম মেকদারে দেওয়ার তালিমা আবদুর রহমান আমার কাছ থেকেই পেয়েছে—কিন্তু আর কিছু আনছে না। থাকতে না পেরে বললুম ‘আরো নিয়ে এস।’ আবদুর রহমান চুপ। আমি বললুম, ‘আরো নিয়ে এস।’ তখন বলে কিনা সবকিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মৌলানা আর আমি তখন যেন রক্তের স্বাদ পেয়ে হনো হয়ে উঠেছি। আমি ভায়ফর চটে গিয়ে বললুম, ‘তোমার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন। যাও, তোমার নিজের জন্য যা রেখেছ তাই নিয়ে এস। আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বললে, সে সবকিছুই পরিবেশন করে দিয়েছে, নিজে রুটি পনির খাবে।

আমি তার কল্পসি দেখে দ্বিগুণ প্রায়। উমাদ, মূর্খ, হস্তী হেনো শব্দ নেই যা আমি গালাগালে বাবহার করিনি। মৌলানা শান্ত প্রকৃতির লোক, কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না। তিনি পর্যন্ত আপন বিরক্তি সুস্পষ্ট ফাসী ভাষায় জানিয়ে দিলেন। আবদুর রহমান চুপ করে সবকিছু শুনল। হাসল না সত্যি কিন্তু কই, মুখখানা একটু মলিনও হল না। আমি আরো চটে গিয়ে বললুম, ‘তোমাকে চাকর রাখার বকমারিটা বোঝাবার এই কি মোকা? এর চেয়ে তো শুকনো রুটি আর নুনই ভালো ছিল।’ কথা যতই বলছি চটে যাচ্ছি ততই বেশী। শেষটায় বললুম, ‘আমি মরে গেলে আচ্ছা করে খানা রেখে—আর প্রচুর পরিমাণে, হুগলে তো?—মসজিদে নিয়ে গিয়ে আমার ফাতেহা বলিযো।’ অর্থাৎ আমার পিঁঠি চটকিয়ে।

তখন মৌলানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দুলহমা সন্স করুন, পেট আপনার থেকেই ভরে যাবে।’

মৌলানা পর্যন্ত রেগে টং। পুরুষ পাঠার মত ঘোঁষ ঘোঁষ করে পাঠী সায়েবেরা গায়ে ঢুকে ক্ষমাভুর চাষাচ্ছে এই রকম উপদেশ দেয় বটে। ‘ক্ষণরাজা ফরণরাজা’ কি সব বলে। কিন্তু আবদুর রহমান খালি পেটে উপদেশটা দিয়েছে বলে মৌলানা দাঁড়িয়ে হাত রেখে অভিসপাত্য দিতে দিতে খেমে গেলেন। আমি বললুম, ‘বিরোধে কতলোক গুলী খেয়ে মরল, তোমার জন্য—’

ততক্ষণ আবদুর রহমান বেরিয়ে গিয়েছে। একেই বলে কতজ্ঞতা। যে আবদুর রহমানকে

পাঁচ মিনিট আগে সুলেমানের তখত বসবার জন্য ল্যাজারসে সিংহাসন অর্ডার দেব দেব করেছিলুম সেই আবদুর রহমানকে তখন জাহাঙ্গামে পাঠাবার জন্য টিকিট কটাবার বন্দোবস্ত করছি।

আবদুর রহমান নিশ্চয়ই ফলিতজ্যোতিষ জানে। দুমিনিটের ভিতর পুছা গেল। পাঁচ মিনিট পরে পোঁতের ভিতর মহারানীর রাজস্ব—বিলকুল ঠাণ্ড। কিন্তু তার পর আরস্ত হল বিপ্লব। সে কি অসম্ভব ইচ্ছা পাঁচড় আর আইহাই। বাটে শুয়ে পড়েছি, অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করছি আর গরমের চোট কপাল দিয়ে ঘাম বেরছে। মৌলানারও একই অবস্থা। তিনিই প্রথম বললেন, বজ্র বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

প্রণ যায় আর কি। আর বেশী খেলে দেখতে হত না। 'ও, আবদুর রহমান, এদিকে অয় বরা।'

আবদুর রহমান এসে বলল, 'আমার কাছে সুলেমানী নুন আছে, তারই খানিকটা দেব?' এরকম গুণীর চার্মামতো খেতে হয়, এর হাতের হজমী ডাঙস হয়ে আমার পেটের বিপ্লব নিশ্চয়ই কাবু করে নিয়ে আসবে। বললুম, 'তাই দে, বাবা। কিন্তু গিলতে গিয়ে দেখি, শবাজোজনের পর আমাদের ব্রান্সের গুলি গিলতে গিয়ে যে-অবস্থা হয়েছিল আমারও তাই। শুনেছি অত্যধিক সংযম করে মুনি-খব্বার উর্দু-ভোজ্য হন, আমি অত্যধিক ভোজন করে উর্দু-ভোজ্য হয়ে গিয়েছি।

নুন খেয়ে আরাম বোধ করলুম। আবদুর রহমানকে আশীর্বাদ করে বললুম, 'বাবা তুমি দারোগা হও।' ইচ্ছে করেই 'রাজা হও' বললুম, না,—কাবুলে রাজা হওয়ার কি সুখ সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম।

উত্তেজনার শেষ নাই। আবদুর রহমানের পিছনে ঢুকল উর্দি—পরা এক মুর্তি। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতবাসের পিয়ন। দেখেই মনটা বিক্ষোভ ভরে গেল। মৌলানাকে বললুম, 'তদারক করে জে ব্যাপারটা কি?'

একখানা চিরকুট। তার মর্ম আগামীকাল দশটার সময় যে প্লেন ভারতবর্ষ যাবে তাতে মৌলানা ও আমার জন্য দুটি সীট আছে। আমাদের আতিথ্যে মৌলানা সোফার উপর শুয়ে পড়লেন। আমাদের এমনি দুরবস্থা যে, পিনাককে বর্ষাশি বোবার কড়ি আমাদের গাটে নেই।

'ফেবার' না 'রাইট' হিসেবে জায়গা পেলুম তার চুড়াঙ্গ নিম্পত্তি হল না। আবদুর রহমান ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে—চুপ করে চলে গেল। মৌলানার আনন্দ ধরে না। বিবি সম্প্রদে তার দুর্ভাবনার অস্ত ছিল না। বিয়ের অম্প কিছুদিন আগেই তিনি তাকে কাবুল নিয়ে এসেছিলেন বলে নূতন বউ বাড়ির আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাননি। এখন অস্বস্তিবাদ অবস্থায় তিনি' কি করে দিন কাটাচ্ছেন সে কথা ভেবে ভেবে ভঙ্গলোক দাড়ি পাকিয়ে ফেলেছিলেন।

আমিও কম বুশী হইনি। মা বাবা নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্দৈন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। বাবা আবার 'দি স্টেটসমেন' থেকে আরস্ত করে 'প্রিন্টেড এণ্ড পাবলিশড বাই' পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়েন। আরোপ্চেনে করে ব্রিটিশ লিগেশনের জন্য ভারতীয় খবরের কাগজ আসত। তারই একখানা মৌলানা কি করে যোগাড় করেছিলেন এবং তাতে আফগান রাষ্ট্রবিপ্লব ও কাবুলের বর্ণনা পড়ে বুঝলুম খবরের কাগজের রিপোর্টারের কম্পনশক্তি সভ্যচেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। গাছে আর মাছে বানানো গল্প, শিপাওয়ায়ে বোতলের পাশে হাঙ্গেস লেখা। এ বর্ণনাটি বাবা পড়লেই হসেতে আর কি। আমার খবরের আশায় ডাকঘরে থানা গাড়লেন।

more-prane-bangali.blogspot.com

মৌলানা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। মানুষ যখন ভবিষ্যতের সুখবন্দ দেখে তখন কথা কয় কম।

ওদিকে এখনো কামা থামেনি। পাশের বাড়ির দরজা খুললে এখনো মাঝে মাঝে কামার শব্দ আসে। আবদুর রহমান বলেছে, কনলেরে বুড়ী মা কিছুতেই শান্ত হতে পারছেন না। ঐ তাঁর একমাত্র ছেলে ছিলেন।

মায়ে মায়ে তদাত নেই। বীরের মা যে রকম ডুকরে কাঁদছে ঠিক সেই রকমই শুনেছি দেশে, চায়া মরলে।

দুমিয়ে পড়ব পড়ব, এমন সময় দেখি খাটের বাজুতে হাত রেখে নিচে বসে আবদুর রহমান। ভিজ্জেস করলুম, 'কি বাচ্চা?'

আবদুর রহমান বলল, 'আমাকে সঙ্গে করে আপনার দেশে নিয়ে চলুন।'

'পাগল নাকি? তুই কোথায় বিশেষ যাবি? তোর বাপ মা, বউ?' কোনো কথা শোনে না, কোনো মুক্তি মানে না। 'আরোপ্চেনে তাকে নেবে কেন? আর তারা রাজী হলেও বাচ্চার কথা হুকুম রয়েছে কোনো আফগান যেন দেশত্যাগ না করে। তোকে নিলে বাচ্চা ইংরেজের গলা কেটে ফেলবে না? ওরে পাগল, আজ কাবুলের অনেক লোক রাজী আছে প্লেনে একটা সীটের জন্য লক্ষ টাকা দিতে।'

নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বলে, আমি রাজী হলে সে সকলের হাতে পাবে ধরে এক থেকে একটু ভাড়াপ দেবে।

কী মুশকিল। বললুম, 'তুই মৌলানাকে ডাক। তিনি তোকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন।' আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বলল, 'উনি আমার কে?'

তারপর ফের অনুনয়বিনয় করে। তবে কি তার বেদমতে বজ্র বেশী ঝুটি, গলদ, না আমার বাপ মা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে চটে যাবেন? আমার বিয়ের 'শাদিয়ানাতে' বন্দুক ছুড়বে কে?

আবদুর রহমান পানিশির আর বরফ এই দুই বস্তু ছাড়া আর কোনো জিনিস গুছিয়ে বলতে পারে না। তার উপর সে আমার কাছ থেকে কোনো দিন কোনো জিনিস, কোনো অনুগ্রহ চাননি। আজ উঠতে গিয়ে সে যেসব অনুনয়বিনয়, কাকুতি-মিনতি করল সেগুলো গুছিয়ে বললে তো ঠিকঠিক বলা হবে না। ওদিকে তার এক একটা কথা, এক একটা অভিমান আমার মনের উপর এমনি দাগ কেটে যাচ্ছিল যে, আমিও আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আর বলবই বা কি ছাই। সমস্ত জিনিসটা এমনি অসম্ভব, এমনি অবিশ্বাস্য যে, তার বিরুদ্ধে আমি যুক্তি চানোই পারোয়। ভুলকে কি পিস্তলের গুলী দিয়ে কাটা যায়?

আমি দূরত্বে বেদনায় ক্লাস্ত হয়ে চুপ করে গেলে আবদুর রহমান ভাবে সে বুঝি আমাকে শাস্ত্যতা করে এনেছে। তখন হিণ্ডু উৎসাহে আরও আবোলতাবোল বকে। কথার খেঁই হারিয়ে ফেলে এক কথা পঞ্চাশ বার বলে। আমার মা বাপকে এমনি খেদমত করবে যে, তাঁরা গ্রহণ না করে থাকতে পারবেন না। আমি যদি তখন বলতুম যে, আমার মা গরীর কারলীওলাকেও দোর থেকে ফেরান না, তাহলে আর রক্ষে ছিল না।

আমারই বরাত। 'কি কৃপণে তাকে একদিন গুরুদেবের 'কাল্‌লীওয়াল' গল্পটা ফাসীতে তর্জমা করে শুনিয়াছিলুম, সে আজ সেই গল্প থেকে নজির তুলতে আরস্ত করল। মিনি যখন অচেনা কাল্‌লীওয়ালকে ভালবাসতে পারল, তখন আমার ভাইগো ভাইবিরাই তাহলে ভালবাসবে না কেন?

সব হবে, কিন্তু তুমি যাবে কি করে?'

'সে আমি দেখে নেব।'

ছোট শিশু মায়ের কাছে যে-রকম অসম্ভব জিনিস চায়। কোনো কথা শুনতে চায় না, কোনো গুজর আপত্তিতে কান দেয় না।

এত দীর্ঘকাল ধরে আবদুর রহমান আমার সঙ্গে কখনো কথা কাটাকাটি করেনি। আমি শেষাতি নিরুপায় হয়ে বললুম, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কি রকম কষ্ট হচ্ছে-তুমি জানো, তুমি সেটা আর বাড়িয়ে না। তোমাকে আমার শেষ আদেশ, তুমি এখানে থাকবে এবং যে মুহূর্তে পানশির যাবার সুযোগ পাবে, সেই মুহূর্তেই বাড়ি চলে যাবে।'

আবদুর রহমান চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, তবে কি তত্ত্বুর আর কাবুল ফিরে আসবেন না?'

আমি কি উত্তর দিয়েছিলুম, সে কথা দ্বা দয়া করে আর শুধাবেন না।

বিয়াল্লিশ

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল, আবদুর রহমান। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ঘরে ঢুকল। রুটি, ময়দা, পানির চা। অন্যদিন খাবার দিয়ে চলে যেত, আজ সামনে দাঁড়িয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল। কী মুশকিল।

মৌলানা এসে বললেন, চিরকুট লেখা আছে, মাথাপিছু দশ পৌণ্ড লগেজ নিয়ে যেতে দেবেন। কি রাখি, কি নিয়ে যাই?'

আমি বললুম, 'যা রেখে যাবে তা আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। আমি আবদুর রহমানকে বলেছি পানশির চলে যেতে। বাড়ি পাহাড়া দেবার জন্য কেউ থাকবে না, কাজেই সবকিছু লুট হবে।'

'কারো বাড়িতে সবকিছু সমঝিয়ে নিয়ে গেলে হয় না?'

আমি বললুম, এ পরিস্থিতিটা একদিন হতে পারে জেনে আমি ভিতরে ভিতরে খবর নিয়েছিলুম। শুনলুম, যখন চুতদিকে লুটতরাজের ভয়, তখন কাউকে মালের জিম্মাদার নিতে অনুরোধ করা এ দেশের রেওয়াজ নয়। কারণ কেউ যদি জিম্মাদারি নিতে রাজীও হয়, তখন তার বাড়িতে ডবল মালের আশায় লুটের ডবল সম্ভাবনা। মালপত্র যখন সদর রাস্তা দিয়ে যাবে, তখন ডাকাতেরা বেশ করে চিনে নেবে মালগুলো কোন্ বাড়িতে গিয়ে উঠল।'

বলে তো দিলুম মৌলনাকে সবকিছু প্রাঞ্জল ভাষায় ঘরের মাথখানে দাঁড়িয়ে যখন চারিদিকে তাকালুম, তখন মনে যে প্রশ্ন উঠল তার কোনো উত্তর নেই। নিয়ে যাব কি, আর রেখে যাব কি?'

ঐ তো আমার দু'তলুম রাশান অভিধান। এরা এসেছে মস্কো থেকে ট্রেনে করে তাকন্দ, সেখান থেকে মোটরে করে আমুদরিয়া, তারপর খেয়া পেরিয়ে, ঝড়রের পিঠে চেপে সমস্ত গুজর অফগানিস্তান পিছনে ফেলে, হিন্দুকুশের চড়াই-ওতরাই ভেঙে এসে পৌঁছেছে কাবুল। ওজন পৌণ্ড ছয়কে হবে।

আমি সাহিত্য সৃষ্টি করি না, কাজেই পাণ্ডুলিপির বলাই নেই—মৌলানার থেকে সেদিক দিয়ে আমার কপাল ভালো—কিন্তু শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের ব্রাহ্মে বলাকা, গোরা, শেলি, কীটস সম্পর্কে যে গাদা গাদা নোট নিয়েছিলুম এবং মূর্খের মত এখানে নিয়ে এসেছিলুম,

বরফবাগের দীর্ঘ অবসরে সেগুলোকে যদি কোনো কাজে লাগানো যায়, সেই ভরসায়, তার কি হবে? ওজন তো কিছু কম নয়।

আর সব অভিধান, ব্যাকরণ, মিনুদির দেওয়া 'পুরবী', বিনোদের দেওয়া ছবি, বন্ধুবান্ধবের ফটোগ্রাফ, আর এক বন্ধুর জন্য কাবুলে কেনা দুখানা বোখারা কাপেট? ওজন তিন লাশ।

কাপড়চোপড়? দেরেশি-পাগল কাবুলের লৌকিকতা রক্ষার জন্য স্মোকিঙ, টেল, মনিবুট (কাবুলের সরকারী ভাষায় 'ই জুর দেরেশি')। এগুলোর জন্য আমার দিকি পয়সার দরদ নেই কিন্তু যদি ভরমী যাবার সুযোগ ঘটে, তবে আবার নতুন করে বানাবার পয়সা পাব কোথায়?'

ভুলেই গিয়েছিলুম এক জোড়া চীনা 'ভাজ'। পাতিনেবুর মত রং আর চোখ বন্ধ করে হাত বুলালে মনে হয় যেন পাতিনেবুরই গায়ে হাত বুলাচ্ছে, একটু জ্বেরে চাপ দিলে বুঝি নখ ভিতরে ঢুক যাবে।

কত ছোটখাটো টুকটাকি। পৃথিবীর আর কারো কাছে এদের কোনো দাম নেই, কিন্তু আমার কাছে এদের প্রত্যেকটি আলাউদ্দিনের প্রদীপ।

সোক্রাতেসকে একদিন তাঁর শিষ্যের পাল শহরের সবচেয়ে সেরা দোকান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। সে-দোকানে দুনিয়ার যত সব দামী দামী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস, অদ্ভুত অদ্ভুত বিলাসসম্ভার, মিশর বাবিলনের কাল-নিদর্শন, পাপিরসের বাস্তিল, আলেকমির সরঞ্জাম সবকিছুই ছিল। সোক্রাতেসের চোখের পলক পড়ে না। এটা দেখছেন, সেটা নাড়ছেন আর চোখ দুটো ছানাবড়ার সাইজ পেরিয়ে শেষাতি সপারের আকার ধারণ করেছে। শিখারো মহাখুশী—গুরু যে এত কছসামান আর ত্যাগের উপদেশ কপচান সে শুধু কোনো সত্যিকার ভালো জিনিস দেখেননি বলে—এইবার দেখা যাক, গুরু কি বলেন। স্বয়ং স্মাতো গুরুর বিশ্বাস ভাব দেখে অবশিষ্ট অনুভব করছেন।

দেখা শেষ হলে সোক্রাতেস কহলকহে বলেন, 'হায়, হায়। দুনিয়া কত চিত্র বিচিত্র জিনিসে ভর্তি যার একটাও আমার প্রয়োজন নেই।'

আমার ঘরের মাফফানে দাঁড়িয়ে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, সোক্রাতেসে আমাতে মাত্র একটা সামান্য তফাৎ—এ ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসেরই আমার প্রয়োজন। বাস—ঐ একটা মাত্র পার্থক্য। ডাবি ভিতরে ৫৩৭৮৬ নম্বরের টিকিট। আমি কিনেছিলুম ৫৩৭৮৫ নম্বরের টিকিট। তফাতটা এমন কি হল?'

মুসলমানের ছেলে, নিমন্তলা যাব না, যাবো একদিন গোবরা—অবশ্য যদি এই কাবুলী-গাশি কাটিয়ে উঠতে পারি। সেদিন কিছু সঙ্গে নিয়ে যাব না, সেকাণ্ড জরানি; কিন্তু তারই জন্য কি আজ সবকিছু কাবুলে ফেলে দেশে যেতে হবে? মজ্ব করলে সব জিনিসই মগ্ন হয়, এই কি খুদাতালার মতলব?'

হ্যাঁ, হ্যাঁ কুষ্টিয়ার লালন ফকির বলেছেন

"মরার আগে ম'লে শমন-জ্বালা বুতে যায়।

জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়।"

আবার আরো কে একজন, দাদু না কি, তিনিও তো বলেছেন,

"দাদু মেরা বৈরী মে মুওয়া মুইন নু

মারে কোই।"

("হে দাদু আমার বৈরী 'আমি' মরে গিয়েছে, আমাকে কেউ মারতে পারে না")।
কী মুশকিল। সব গুণীরই এক রা। শেয়ালকে কেন বুথা দোষ দেওয়া করীয়ও তো বলেছেন,

"তজো অভিমানা সীতো জ্ঞান্য
সতগুরু সঙ্গত তরতা হৈ।
কহৈ কবীর কোই বিরল হংস
জীবত হী জ্ঞো মরতা হৈ।"

("অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুকে লাভ করেছেন সে রকম হংস-সাধক বিরল")
কিন্তু কবীরের বচনে ব্যাচ্যুতরা রয়ে গিয়েছে। গোবরার গোরস্তানে যাবার পূর্বেই মৃতের ন্যায় সবকিছুর মায়া কাটাতে পারেন এমন পরমহংস যখন 'বিরল' তখন সে কন্ত করার দায় তো আমার উপর নয়।

তোমার শেষ পর্যন্ত কোন বাঁশ বেছে নিয়েছিল আমাদের প্রবাসে তার হীস মেনে না। বিবেচনা করি, সেটা নিভান্ত কাঁচা এবং গিটে ভর্তি—না হলে প্রবাসটার কোনো মানে হয় না। এ-ডোম তাই শেষ পর্যন্ত কি দিয়ে দশ পৌণ্ডের পুঁটুলি বেঁধেছিল, সে কথা ফাঁস করে দিয়ে আপন আহা'ম্মির শেষ প্রমাণ আপনাদের হাতে তুলে দেবে না।

কিন্তু সেটা পুরানো ধৃতিতে বাঁধা বনের পুঁটুলি ছিল—'লগেজ' বা সুটকেসের ভিতরে গোছানো মাল অন্য জিনিস—কারপ দশ পৌণ্ড মালের জন্য পাঁচ পৌণ্ডী সুটকেস ব্যবহার করলে মালের পাঁচ পৌণ্ড গিয়ে রইবে হাতে সুইকেসটা। সুকুমার রায়ের কাক যে রকম হিসাব করতো সাত দুগুণে চৌদ্দর নামে চার, হাতে রইল 'পেলি।'

অশেষ জামা-কাপড় পরে নিলুম একপাশা—একপ্রস্তর। ক'র্তারও উপদেশে পাঠিয়েছিলেন যে, প্রচুর পরিমাণে গরম জামা-কাপড় না পরা থাকলে উপরে গিয়ে শীতে কষ্ট পাব এবং মৌলানার বউয়ের পা ভাঙ দিয়ে কি রকম পেঁচিয়ে বিলিভী সিরকার বোতল বানানো হয়েছিল, আবদুর রহমানের সে-বর্ণনাও মনে ছিল।

মৌলানা তাঁর এক পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। আবদুর রহমান বঙ্গবীর ঘরে প্রাণভরে আগুন আলিয়েছে। আমি একটা চোয়ারে বসে। আবদুর রহমান আমার পায়ের কাছে।

আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, তোমার উপর অনেকবার খামকা রাগ করছি, মাফ করে দিয়ো।'

আবদুর রহমান আমার দু'হাত তুলে নিয়ে আপন চোখের উপর চেপে ধরল। ভেজা।
আমি বললুম, 'ছিঃ আবদুর রহমান, এ কি করছ? আর শোনো, যা রইল সবকিছু তোমার।'

আমি জানি আমার পাঠক মাত্রই অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন, কিন্তু তবু আমি জোর করে বলব, আবদুর রহমান আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, তার চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম লেখা রয়েছে,—

যেনাহং নামুতা স্যাহ কিমহং তেন কুর্খাম?
রাস্তা দিয়ে চলেছি। পিছনে পুঁটুলি-হাতে আবদুর রহমান।

দু-একবার তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম সে চুপ করে থাকটাই পছন্দ করছে।

প্রথমেই জানদিকে পড়ল রুশ রাজদুতাবাস। দেমিদফ পরিবারকে কখনো ভুলবো না। বলশফের আত্মাকে নমস্কার জানালুম।

তারপর কাবুল নদী পেরিয়ে লব-ই-দরিয়া হয়ে আর্কের দিকে চললুম। বেশীর ভাগ দোকানপাট বন্ধ—তবু দূর থেকেই দেখতে পেলুম পাঞ্জাবীর দোকান খোলা। দোকানদার বারাদায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলুম, দেশে যাবেন না? মাথা নাড়িয়ে নীরবে জানালো 'না'। তারপর বিনায়েদর সালাম জানিয়ে মাথা নিচু করে দোকানের ভিতরে ঢেলে গেল। আমি জানতুম, কারবার ফেলে এদের কাবুল ছাড়ার উপায় নেই, সবকিছু তৎক্ষণাৎ লুট হয়ে যাবে। অতঃপর এর চিত্র এমন বিকল হয়ে গিয়েছে যে, শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে দুটি কথা বলবার মত জোর এর আর নেই।

বিশ কদম পরে ষা দিকে দোস্ত মুহম্মদের বাসা। অবস্থা দেখে বুঝতে বেগ পেতে হল না যে, বাসা লুট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর কারবারে শোক হওয়ার কথা নয়। এ-বাবতে তিনি সোজাতোষের ন্যায়—সোজাতোষ যেমন তত্ত্বচিত্তায় ঐদ হয়ে অন্য কোনো ব্যস্তর প্রয়োজন অনুভব করতেন না, দোস্ত মুহম্মদ ঠিক তেমনি রসের সন্ধানে, অস্তুরের খোঁজে গ্রেটোস্কেপ (উদ্ভটের) পিছনে এমন লেগে থাকতেন যে, অন্য কোনো ব্যস্তর অভাব তাঁর চিন্তাচক্ষু লাঘাত পেত না। পতঞ্জলিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। চিন্তাশ্রুতিনির্ধারণের পন্থা বাহলাতে গিয়ে তিনি দ্বন্দ্বের, এবং বীতরাগ মহাপুরুষদের সম্প্রদায় ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু সর্বশেষে বলেন, 'যথাভিমতধ্যানাকা', 'যা খুশী তাই দিয়ে চিন্তাচক্ষু ঠেকাবে।' অর্থাৎ ধ্যানটাই মুখ্য, ধ্যানের বিষয়বস্তু শৌণ। দোস্ত মুহম্মদের সাধনা রসের সাধনা।

আরো খানিকটে এগিয়ে ষা দিকে মেয়েদের ইস্কুল। বাচ্চর আক্রমণের কয়েক দিন পূর্বে এখানে কর্নেলের বউ তাঁর স্বামীর কথা ভেবে ডুবে রেখেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা কে জানে। আমার পাশের বাড়ীর কর্নেলের মায়ের কান্না, ইস্কুলের কর্নেল-বউয়ের কান্না আরো কত কান্না মিশে গিয়ে অহরহ খুদাতালার তখতের দিকে চলেছে। কিন্তু কেন? কি বলেছেন,

For men must work
And women must weep

অর্থাৎ কোনো তর্ক নেই, যুক্তি নেই, ন্যায় অন্যায নেই, মেয়েদের কর্ম হচ্ছে পুরুষের আর্কাট মুখতার জন্য চোখের জল ফেলে খেসারতি দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্য, এ-বন্দনাটা প্রকাশও করে আসছে পুরুষই করিবরণে। শুনেছি পাঁচ হাজার বৎসরের পুরোনো ববিলনের প্রস্তরপাটে কবিতা পাওয়া গিয়েছে—কবি মা-জননীদে চোখের জলের উল্লেখ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ইস্কুলের পরের একপাশা নাচনোগ্যালীনের আনানো হয়েছিল তারা উঠেছিল এই বাড়িতে। তাদের তত্ত্বাভ্যাস করার জন্য আমরা কয়েকজন ভারতীয় তাদের কাছে গিয়েছিলুম। আমাদের সঙ্ক্ষে কথা কহিতে পেয়ে সেই অনাত্মীয় নির্বাসনে তার কী খুশীটাই না হয়েছিল। জানাত, কাবুলে পান পাওয়া যায় না—আর পান না হলে মজলিস জমাবে কি করে, হুঁসর হয়ে

mone-prane-bangali.blogspot.com

যাবে ভজন—তাই তারা সঙ্গে এনেছিল বাসবোঝাই পান। আমাদের সেই পান দিয়েছিল অরুণ হস্ত, দরাজ-দিলে। লেফোয়ার পান, কাশীর তলী, সৈক-ছাকা খয়ের তিনে মিলে আমার মুখের জড়তা এমনি কেটে দিয়েছিল যে, আমি তখন উর্ধু ছেড়েছিলাম একদম লখনৌয়ী কায়দায়—বিস্তার 'মেহেরবানী' 'গরীব-পরগরী', 'বদা-নগওয়াজী'র প্রপঞ্চ-ফোড়ন দিয়ে।

কাবুলের নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নেই। ইরানের ঐতিহ্যও কাবুল স্বীকার করে না। যে দেড় জন কলাবত আছেন তারা গান শিখেছেন যুক্তপ্রদেশে। বাঙ্গালীদের মজলিসের তাই সম সেনেগালার অভাব হতে পারে এই ভয়ে গানের মজলিসে উপস্থিত থাকার জন্য ভারতীয়দের সাড়স্বর নিমন্ত্রণ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছিল। আমাদের সামনে বসে বিস্তর মাথা নেড়েছিলাম আর ঘন ঘন 'শাবাশ' শাবাশ' চিংকারে মজলিস গরম করে ফুলেছিল।

বাড়ি ফিরে আহায়দির পর যখন শেষ পানটা পেকেট থেকে বের করে খেয়ে জানলা দিয়ে পিক ফেললুম তখন আবদুর রহমান ভয়ে ভিরমি যায় আর কি। কাবুলে পানের পিক অজানা কিন্তু যথ্যা অজানা বস্তু নয়।

তারপরই শিক্ষামন্ত্রীর দক্ষতর। একসেলসি ফয়েজ মুহম্মদ খানকে দোস্ত মুহম্মদ দু'চোখে দেখতে পারতেন না। আমার কিন্তু মদ লাগত না। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং বড়ই নিরীহ প্রকৃতির লোক। আর পাঁচজনের তুলনায় তিনি লেখাপড়া কিছু কম জানতেন না, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী হতে হলে যতটা দরকার ততটা হয়ত তাঁর ঠিক ছিল না। বাক্সা রাজা হয়ে আর তারও মন্ত্রীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে গুপ্তধন বের করেছে, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর নাকি, হুই হা, তুই তো কখনো ঘুম খাননি বলে নিশ্চুতি দিয়েছিল। অথচ শিক্ষা বিভাগে টু পাইস কামাবার যে উপায় ছিল তা নয়। কাবুলে নাকি চেউ গোনার কাজ পেলেও—অবশ্য সে—কাজ সরকারী হওয়া চাই—দুপসমা খায়া যায়।

লোকটিকে আমার ভালো লাগতো নিত্যন্ত ব্যক্তিগত কারণে। এই বেলা সেটা বলে ফেলি, হাওয়াই—জাহাজ করে জানা দাঁড়ায় না, উড়ন্ত পারলেই বাটে।

চাকরীতে উন্নতি করে মানুষ হয় বুদ্ধির জোরে নয় ভগবানের কৃপায়। বুদ্ধিমানকে ভগবানও যদি সাহায্য করেন তবে বোকাদের আর পৃথিবীতে বাঁচতে হত না। আমার প্রতি ভগবান সদয় ছিলেন বলেই বোধ করি শিক্ষামন্ত্রীর প্রথম দিন থেকেই আমার দিকে নেকনজরে তাকিয়েছিলেন। তারপর এক বৎসর যেতে না যেতে অহেতুক একধাক্কা মাইনে একশ টাকা বাড়িয়ে সব ভারতীয় শিক্ষকদের দরবারে চড়িয়ে দিলেন।

পাঞ্জাবী শিক্ষকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ডেপুটেশন নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সৈয়দ মুজতবা আলীর ডিগ্রী বিশ্বভারতীয়, এবং বিশ্বভারতী রেকগনাইজড মিনিভার্সিটি নয়'।

খাঁটি কথা। সদস্য ভারতীয় সরকারের নেকনজরে আমার ডিগ্রী এখনো ব্রাত্য। আপনারা কেউ আমাকে চাকরী দিলে বিপদগ্রস্ত হবেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলেছিলেন—আমি বয়ানটী শুনেছি অন্য লোকের কাছ থেকে—সেকথা তাঁর অজানা নয়।

পাঞ্জাবীদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'আপনার সনন-সিটিফিকেট রয়েছে পাঞ্জাব গবর্নরের দস্তখত। আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্তানেও গবর্নরের

অভাব নেই। কিন্তু আগা মুজতবা আলীর কাগজে দস্তখত রয়েছে মশতর শাহীর রবীন্দ্রনাথের। তিনি পৃথিবীর সামনে সমস্ত প্রাচ্যদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন (চন্দ্র রঞ্জন করদে অন্দ—)'।

ভগ্নলোকের ভারি শখ ছিল গুরুদেবকে কাবুলে নিমন্ত্রণ করার। তাঁর শুধু ভয় ছিল যে, দূশ মাইলের মোটর বাকনি খেয়ে কবি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে বাধা পড়ে তবে তাতে করে ক্ষতি হবে সমস্ত পৃথিবীর। কাবুল কবিকে দেখতে চায়, কিন্তু এমন দুর্ঘটনার নিমিষ্টের ভাণী হতে যাবে কেন? আমি সাহস দিয়ে বলতুম, 'কবি ছ'ফট তিন হাফট উঁচু তাঁর দেহ সুগঠিত এবং হাড়ও মজবুত'।

শেষটায় তিনি আল্লা বলে কুলে পড়ছিলেন কিন্তু অমানউল্লা বিলতে যাওয়ায় সে গ্রীষ্মে কবিকে আর নিমন্ত্রণ করা গেল না। শীতে বাক্সা এসে উপস্থিত।

যাকগে এসব কথা।

বীদিকে মুইন-উল-সুলতানের বাড়ি খানিকটে এগিয়ে গিয়ে তাঁর টেনিস কোর্ট। আজ মুইন-উল-সুলতানে ভাগ্যের হাতে টেনিস বল। কন্সাহার কাবুল তাকে নিয়ে লোফলুফি খেলেছে।

এই তো মকতব-ই-ইব্রীয়া। বাক্সা অক্রমণের প্রথম ধাক্কা মকতবটা দখল করে টেনিলচেয়ার বই মাপ পুড়িয়ে ফেলেছিল। এ শিক্ষায়ত্ত আবার কখন খুলবে কে জানে? এখানেই আমি পড়িয়েছি। এই পুকুর জমে গেছে ছেলেরদের সঙ্গে তার উপর স্ফেটিকি করেছে। গাছতলায় বসে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আগুর কিনে খেয়েছি। মীর আসলমের কাছ থেকে কত তরুণতা শুনেছি।

রাহকবলিত কাবুল স্মান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। মকতব-ই-ইব্রীয়ার বন্ধকার ঘেন সমস্ত আফগানিস্তানের প্রতীক। শিক্ষাদীক্ষা, শাস্তিশৃঙ্খলা সভ্যতাসংস্কৃতি বর্জন করে আফগানিস্তান তার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে।

শহর ছাড়িয়ে মাঠে নামলুম। হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি আর বেশী দূর নয়। পিছন ফিরে আরেকবার কাবুলের দিকে তাকালুম। এই নিরাস নিরানন্দ বিপদসঙ্কুল পুরী ত্যাগ করতে কোনো সুস্থ মানুষের মনে কষ্ট হওয়ার কথা নয় কিন্তু বোধ হয় এই সব কারণেই যে লোকের সঙ্গে আমার হৃদয় জমেছিল তাঁদের প্রত্যেককে আশাধারণ আত্মজ্ঞান ভাবে মনে হতে লাগল। এদের প্রত্যেককেই আমার হৃদয় এতটা দখল করে বসে আছে যে, এদের সকলকে এক সঙ্গে ত্যাগ করতে গিয়ে মনে হল আমার সম্মুখে যেন কেউ দ্বিধাশ্রিত করে ফেলেছে। ফরাসীতে বলে 'পার্তির সে তা প্যা দুইর প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড-মুহূর্ত'।

হাওয়াই জাহাজ এল। আমাদের ষ্টিকিগুলো সাজুস্বরে ওজন করা হল। কারো পোটলা দশ পৌণ্ডের বেশী হয়ে যাওয়ায় তাদের মস্তকে বজ্রবাত। অনেক ভেবেচিন্তে যে কয়টি সামান্য জিনিস নিয়ে আমরা দেশত্যাগী হচ্ছে তার থেকে কের জিনিস কমানো যে কত কঠিন সেটা দাঁড়িয়ে না দেখলে অনুমান করা অসম্ভব। একজন তো হাউমাই করে কেঁদে ফেলেন।

জাম যে কানা হয় তার শেষ প্রমাণও বিমান-ঘাঁটিতে পেলুম। এইটুকু ওজনের ভিতর 'শাবার এক গুলী একখানা আয়না এনেছেন। লোকটির চোখারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে

দেখলুম, কই তেমন কিছু খাপসুরং আপলো তো নন। ঘরে আঙন লাগলে মানুষ নাকি ছুটে রেরবার সময় ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়েছে, এ কথা তালে মিশ্যা নয়।

ওরে আবদুর রহমান, তুই এটা এনেছিস কেন? দশ পৌণ্ডের পুঁটলিটা এনেছে ঠিক কিন্তু বাঁ হাতে আমার টেনিস রাকেটখানা কেন? আবদুর রহমান কি একটা বিভ্রিবিড় করল। বুঝলুম, সে ঐ রাকেটখানাকেই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছিল, তার কারণ ও-জিনিসটা আমি তাকে কখনও ছুঁতে দিইনি না। আবদুর রহমান আমাদের দেশের ড্রাইভারদের মত। তার বিশ্বাস শ্রু মাত্রই এমনভাবে টাইট করতে হয় যে, সেটা কেন আর কখনো খোলা না যায়। 'অপটিমাম' শব্দটা আমি আবদুর রহমানকে বোঝাতে না পেরে শেষটায় কড়া হুকুম দিয়েছিলুম, রাকেটটা প্রেসে বাঁধা দূরে থাক, সে যেন ওটার ছায়ায়ও না মাড়ায়।

আবদুর রহমান তাই ভেবেছে, সায়েব নিশ্চয়ই এটা সন্তোষ নিয়ে হিন্দুস্থানে যাবে। দেখি স্যার ফ্রান্সিস। নিতান্ত সামনে, বয়সে বড়, তাই একটা ছোঁচসে ছোট নড় করলুম। সায়েব এণিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গুড মনিং আই উইশ এ গুড জর্নি'। আমি ধন্যবাদ জানালুম।

সায়েব বললেন, ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্য আমি সাধ্য মত চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে আশা করি, ভারতবর্ষে সে কথাটি আপনি বলবেন।
'আমি বললুম, 'আমি নিশ্চয়ই সব কথা বলবো।'
সায়েব ভেঁতা, না ঘড়ল ডিপ্লোমেট, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বিদায় নেবার সময় আফগানিস্তানে যে চলে যাচ্ছে সে বলে 'ব' আমানে খুদা'— 'তোমাকে খোদার আমানতে রাখলুম', যে যাচ্ছে না সে বলে 'ব' খুদা সপূর্দমং'— 'তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলুম।'

আবদুর রহমান আমার হাতে চুমো খেল। আমি বললুম, 'ব' আমানে খুদা, আবদুর রহমান', আবদুর রহমান মস্তোচ্চারণের মত একটানা বলে যেতে লাগল 'ব' খুদা সপূর্দমং, সায়েব, ব' খুদা সপূর্দমং, সায়েব।'

হঠাৎ শুনি স্যার ফ্রান্সিস বলছেন, 'এ-দুর্দিনে যে টেনিস রাকেট সন্তোষ নিয়ে যেতে চায় সে নিশ্চয়ই পাকা স্পোর্টসম্যান।'

লিপেশনের এক কর্মচারী বললেন, 'ওটা দশ পৌণ্ডের বাইরে পাড়েছে বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

সায়েব বললেন, 'ওটা পেনে তুলে দাও।'

ঐ একটা গুণ না থাকলে ইয়েরজকে কাক-চিলে তুলে নিয়ে যেত।

আবদুর রহমান এবার টেটিয়ে বলছে, 'ব' খুদা সপূর্দমং, সায়েব, ব' খুদা সপূর্দমং।' প্রণেলার ভীষণ শব্দ করছে।

আবদুর রহমানের ভারবরে চিংকার পেনের ভিতর থেকে শুনতে পাছি। হাওয়াই জাহাজ জিনিসটাকে আবদুর রহমান বড্ড ডরায়। তাই খোদাতালার কাছে সে বার বার নিবেদন করছে যে, আমাকে সে ঠারই হাতে সঁপে দিয়েছে।

পেন চলেতে আরম্ভ করেছে। শেষ শব্দ শুনতে পেলুম, 'সপূর্দমং'। আফগানিস্তানে আমার প্রথম পরিচয়ের আফগান আবদুর রহমান; শেষ দিনে সেই আবদুর রহমান বিদায় দিল।

উৎসবে, ব্যাসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং এই শেষ বিদায়কে যদি শ্মশান বলি তবে আবদুর রহমান শ্মশানেও আমাকে কাঁধ দিল। স্বয়ং চাণক্য যে কটা পরীক্ষার উল্লেখ করে আপন নির্ঘণ্ট শেষ করেছেন আবদুর রহমান সব কটাই উত্তীর্ণ হল। তাকে বান্ধব বলব না তো কাকে বান্ধব বলব?

বন্ধু আবদুর রহমান, তগবন্ধু তোমার কল্যাণ করুন।

মৌলানা বললেন, 'জানালো দিয়ে বাইরে তাকাও।' বলে আপন সীটটা আমায় ছেড়ে দিলেন।

তাকিয়ে দেখি দিকদিগন্তবিস্তৃত শুভ বরফ। আর অ্যারফিল্ডের মাঝখানে, আবদুর রহমানই হবে, তার পাগড়ির ন্যাজ মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

বহুদিন ধরে সবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে গুজর আবদুর রহমানের পাগড়ি, আর গুজর আবদুর রহমানের হৃদয়।

আমানউল্লাহ হাতিংহাসন উদ্ধার না করতে পেরে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতালির রাজা তাঁকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দেন। মুইন-উস-সুলতানে ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমানউল্লাহ হয়ে যে সেনাপতি ইংরেজের সঙ্গে আফগান স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন তাঁর নাম নাদির শাহ। তিনি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে ছিলেন। পরে পেশাওয়ার এসে সেখানকার ভারতীয় বণিকদের অর্থ সহায়্যে এবং আপন শৌর্যবীর্য দ্বারা কাবুল দখল করে বাদশাহ হন। বাচ্চাকে সন্তান দিয়ে মারা হয়—পরে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়।

এ সব আমি খবরের কাগজে পড়েছি।

দেশে এসে জানতে পেলুম, আমার আত্মীয় কেন্দ্রীয় পরিবাদের সদস্য মরতম মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরীর উচ্চা দর্শনে ভারত-সরকার স্যার ফ্রান্সিসকে আদেশ (বা অনুরোধ) করেন আমাকে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য।

আমি কাবুল ছাড়ার কয়েক দিন পরেই ব্রিটিশ লিগেশন বহু অসহায় ভারতীয়কে কবুলে ফেলে ভরতবার্ষে চলে আসেন।

এই 'বীরত্বের' জন্য স্যার ফ্রান্সিস অল্পদিন পরেই খেতাব ও প্রমোশন পেয়ে ইরাক বদলি হন।

মৌলানা জিয়াউদ্দিন ভারতবার্ষে ফিরে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের কর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন (ফাসীতে লেখা ব্রজভাষার একখানা প্রাচীন ব্যাকরণ প্রকাশ তাঁর অন্যতম,) এবং গুরুদেবের অনেক কবিতা উত্তম ফাসীতে অনুবাদ করেন।

অত্যন্ত পরিচাপের বিষয় তিনি অল্পবয়সে মারা যান। তাঁর অকালমৃত্যু উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে শোকসভায় গুরুদেব আচার্যরূপে যা বলেন তার অনুলিপি 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র রচনাধরী চতুর্বিংশ খণ্ডে অনুলিপিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গুরুদেব রচিত মৌলানা 'জিয়াউদ্দিন' কবিতাটি এখানে বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে ছাপানোটা মুক্তিমুক্ত মনে করলুম;—

মৌলানা জিয়াউদ্দিন

কখনো কখনো কোনো অবসরে

নিকটে দাঁড়াতে এসে;

এই যে, বলেই তাকাতেম মুখে

'বোসো' বলিতাম হেসে।

দু-চারটে হাত সামান্য কথা

ঘরের প্রশ্ন কিছু,

গভীর হৃদয় নীরবে রহিত

হাসিতামাশার পিছু।

কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়

অকথিত কত বাণী,

চিরকাল-তরে দিয়েছ যখন

আজিকে সে-কথা জানি।

mone-prane-bangali.blogspot.com

প্রতি দিবসের হৃদয় খেয়ালে

সামান্য। যাওয়া-আসা,

সেটুকু হারালে কতখানি যায়

খুঁজে নাহি পাই ভাষা।

ভব জীবনের বহু সাধনার

যে পথ্য ভার ভারি

মধ্যদিনের বাতাসে ভাসলে

তোমার নবীন তরী,

যেমনি তা হোক মনে জানি তার

এতটা মূল্য নাই

যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি

আপন নিত্য ঠাই—

সেই কথা স্মরি বার বার আজ

লাগে ধিক্কার প্রাণে—

অজানা জন্মের পরম মূল্য

নাই কি গো কোনো খানে।

এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে

কোথা হতে খুঁজে আনি

ছুরির আঘাত যেমন সহজ

তেমন সহজ বাণী।

কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,

কারো অর্থের খ্যাতি—

কেহ-বা প্রজ্ঞার সুহৃদ সহায়,

কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—

ভূমি আপনার বন্ধুজনের

মাধুর্যে দিতে সাড়া,

ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা

সকল খ্যাতির বাড়া।

ভরা আঘাতের সে মালতীগুলি

আনন্দ মহিমায়

আপনার দান নিঃশেষ করি

দুলায় মিলায়ে যায়—

আকাশে আকাশে বাতাসে তাহার

আমাদের চারি পাশে

তোমার বিরহ ছড়িয়ে চলেছে

সৌরভ দিম্বাসে।

(নবজাতক)

তা মা ম শু দ

প্রিয় বন্ধু

আপনি এই ব্লগ থেকে এই বইটি ডাউনলোড করে আমাকে আরও নতুন নতুন বই আপলোড করতে আরও উৎসাহিত করেছেন তার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে আপনার কৃতজ্ঞ । আপনাকে আরও নতুন নতুন বই দিতে আমিও প্রচন্ডভাবে উৎসুক । কিন্তু তার জন্য চাই আমার অন্তত একটি স্ক্যানার । তাই এই ব্লগের যে অ্যাডভার্টাইজগুলো আছে আপনারা যদি সেগুলো একটু ব্রাউজ করেন তাহলে এই ব্লগটি চালাতে আমি আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধে পাই । ভারতবর্ষ থেকে যারা এই ব্লগ অনুসরণ করেন তারা মাসে একবার, উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের অনুসরণকারীরা মাসে দুবার ব্রাউজ করলেই যথেষ্ট । আর যারা অন্যান্য দেশ থেকে অনুসরণ করেন তাঁরা মাসে ৪ – ৫ বার করলে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

কোনোরকম উপদেশ, অনুরোধ, অভিযোগ থাকলে আমাকে মেইল করুন -

karananupam@gmail.com আপনাদের সহযোগিতা আমার একান্ত কাম্য ।

ইতি,

administrator - anupamrocks

mone prane bangali